অর্ঘ্য

বৈশাখ-অগ্রহায়ণ

১৩২৬

অর্ঘ্য,

৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২৫।

স্বপ্নতত্ত্ব।

স্বপ্ন ব্যাপারটা কি তাহার প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য অনেকেরই আগ্রহ হইয়া থাকে। সকল ব্যক্তিই অনুভব করেন, স্বপ্নে কোনও ভীষণ চিত্র দেখিলে শরীরে লোমাঞ্চ হয়, উচ্চ হইতে নীচদেশে পতিত হইতেছি এইরূপ স্বপ্ন দেখিলে প্রকৃত অবস্থায় নিম্নে পতিত হইলে শরীরে যেরূপ ধাক্কা লাগে, স্বপ্নেও সেইরূপ হইয়া থাকে। কোনও স্বপ্ন প্রত্যক্ষের ন্যায় অচিরে ফল প্রদান করে, কোনটী বা একান্ত নিষ্ফল হয়। চক্ষু মুদ্রিত, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও প্রসুপ্ত, অন্ধকার গৃহে কবাট জানালা রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিয়াছ, দেখিবে দেশ দেশান্তরে গমন করিতেছ, সমুদ্র পার হইতেছ, ব্যোমযানে আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সুমেরুশিখরে আরোহণ করিতেছ, এই সকল ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের হেতু কি?

জীবনে যাহার সহিত দেখা নাই, যে কথার আলোচনা কর নাই, কখনও যাহা ভাব নাই, এমন বিষয় হঠাৎ প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভব করিতেছ; আমি শয়ন করিয়াছি স্বপ্ন দেখিতেছি, এইরূপ প্রকৃত জ্ঞান উদিত হইলেও সেই অচিন্তনীয় অভাবনীয় বিষয় সকল আসিতেছে ও যাইতেছে। কোনও স্বপ্ন আদ্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ বা কোনওটী একান্ত সামঞ্জস্যবিহীন; এই অদ্ভুত প্রহেলিকার উত্তর কি?

দার্শনিকগণ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি জীবাত্মার এই তিনটী অবস্থা বর্ণন করেন, স্বপ্ন তাহার দ্বিতীয় অবস্থা।

পাতঞ্জল যোগসূত্রের বৃত্তিকার ভোজরাজ বলেন, "প্রত্যস্তমিত বাহ্যেন্দ্রিয়স্য, যত্র মনোমাত্রেণৈব ভোক্তৃত্বমাত্মনঃ স স্বপ্নঃ।"

বৈশেষিক দর্শনের নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে "তথাস্বপ্নঃ ॥৭॥" এই সূত্রের উপস্কারে স্বপ্নতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উপস্কার বলেন:—যেমন আত্মা

ও মনের সংযোগবিশেষ ও পূর্ব্বানুভূত সংস্কার হইতে স্মৃতি হয়, স্বপ্ন-জ্ঞানও সেইরূপ হইয়া থাকে। বৈশেষিকের মতেও স্বপ্নের লক্ষণ প্রায় যোগশাস্ত্রের অনুরূপ।

উপরতেন্দ্রিয়—গ্রামস্য, প্রলীনমনস্কস্য, ইন্দ্রিয়দ্বারেণ যদনুভবনং 'মানসং তৎস্বপ্নজ্ঞানম্" ইন্দ্রিয়সমূহ নিবৃত্ত, মন প্রলীন, এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়কে দ্বার করিয়া যে মানস অনুভব হয় তাহাই স্বপ্নজ্ঞান।

সেই স্বপ্নজ্ঞান তিন প্রকার (ক) পূর্ব্বানুভূত সংস্কারের প্রবলতায় (খ) বাত-পিত্তাদি দোষহেতুক (গ) অদৃষ্ট অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্মবশে ঘটিয়া থাকে।

(ক) সংস্কার প্রবলতায়—যেমন কামী বা ক্রুদ্ধ ব্যক্তি, অতি দৃঢ়ভাবে যে বস্তুর চিন্তা করিয়া নিদ্রা যায়, স্বপ্নে তাহাই প্রত্যক্ষের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে অথবা যেমন পুরাণ-পাঠে রাম-রাবণে যুদ্ধ, কর্ণ অর্জ্জুনের যুদ্ধ অতি অব-হিতভাবে শ্রবণ করিয়াছ; রাত্রি নিদ্রাকালে হয়ত অবিকল দেখিবে এই কুরু-ক্ষেত্র প্রান্তরে কর্ণার্জ্জুনে মহাসমর সংঘটিত হইতেছে, লঙ্কায় রাম রাবণে ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত, চতুর্দ্দিকে অগণ্য বানরসৈন্য বৃক্ষ ও প্রস্তরাদি লইয়া রাবণের প্রতি প্রধাবিত; রাক্ষসগণ বিকট চীৎকার করিতে করিতে রামের অভিমুখে আসিতেছে অথবা পূর্ব্ব রাত্রি থিয়েটারে 'আলিবাবা' নাটকের অভিনয় দেখিয়াছ, 'নেপোলীয়ান্ বোনাপার্ট' অভিনীত হইয়াছে, পরে বাসায় গিয়া নিদ্রা যাইয়া দেখিলে সেই দস্যুদের তাণ্ডব নৃত্য, গুহাভ্যন্তরে কাশিমের প্রাণসংহারের ভীষণ চিত্র, শরীর শিহরিয়া উঠিল, নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। অথবা দেখিলে সহস্র সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য বর্শাহস্তে অগ্রসর হইতেছে; পদাতিগণ বন্দুক কাঁধে ফেলিয়া সদম্ভে নক্ষত্রবেগে রণক্ষেত্রে ছুটিতেছে। স্বপ্নেও সেই জীবন্ত চিত্র প্রত্যক্ষ হইতেছে, এই সকলই পূর্ব্বানুভূত সংস্কারের প্রবলতাজনিত স্বপ্ন।

(২) দোষজনিত স্বপ্ন—শরীরে বায়ুর প্রাবল্য ঘটিলে আকাশ গমন, পৃথিবী পর্য্যটন, ব্যাঘ্রাদির ভয় ও পলায়ন স্বপ্নে দেখা যায়। পিত্তাধিক্য হইলে অগ্নি প্রবেশ, অগ্নিশিখা আলিঙ্গন, সুবর্ণ পর্ব্বত, বিদ্যুৎ বিস্ফুরণ ও দিগ্‌দাহ প্রভৃতি স্বপ্নে দৃষ্টিগোচর হয়। শ্লেষ্মার প্রবলতায় সমুদ্রসন্তরণ, নদীমজ্জন, মেঘবর্ষণ, জলপ্লাবন, রজত পর্ব্বত প্রভৃতি স্বপ্নে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

(গ) অদৃষ্টজনিত স্বপ্ন—ইহজন্মের বা জন্মান্তরের অনুভূত বিষয়ে নিদ্রা-বিষ্ট চিত্তের যে জ্ঞান হয় তাহাই অদৃষ্টজনিত স্বপ্ন। তন্মধ্যে শুভকর্ম্মবশে, শুভসূচক, যেমন গজারোহণ, পর্ব্বতারোহণ, ছত্রলাভ, পায়সভক্ষণ, রাজ-

সন্দর্শন প্রভৃতি। আর অশুভ কর্ম্মবশে অশুভসূচক, যেমন তৈলাভ্যঙ্গ, অন্ধ-কূপে পতন, গর্দ্দভারোহণ, পঙ্ক-মজ্জন, স্ববিবাহ-দর্শন প্রভৃতি বিষয় স্বপ্ন হইয়া থাকে।

বৈশেষিক বলেন সংস্কারপ্রাবল্য, পিত্তাদিদোষ ও অদৃষ্ট এই তিনটীই মিলিত ভাবে স্বপ্নের কারণ হয়—গৌণ মুখ্যভাবে তিনটী কারণই প্রত্যেক স্বপ্নে থাকে, তবে যে স্বপ্নে যেটী প্রবল হয় তদনুসারেই এইটী সংস্কার-প্রাবল্য, এইটী দোষবশে ও এইটী অদৃষ্টফলে সংঘটিত এইরূপ বিভাগ হয়। কোনও কোনও দার্শনিক বলেন যে, পূর্ব্বের অনুভব না থাকিলে কখনই সে বিষয়ে স্বপ্ন হইতে পারে না। হয়ত তুমি জন্মজন্মান্তরে বহু সহস্র জন্ম পূর্ব্বে কোনও কালে কোনও বিষয় অনুভব করিয়াছ, প্রত্যক্ষ না দেখিলেও অন্ততঃ কাহারও নিকট সে বিষয়ের গল্প শুনিয়াছ বা গ্রন্থে পড়িয়াছ; কেবল সেই বিষয়েই তোমার স্বপ্ন হইতে পারে অন্য বিষয়ে হইবে না। তাঁহারা উদাহরণস্বরূপ বলেন যে, "নিজ মস্তক নিজে চর্ব্বণ করিতেছি" এইরূপ স্বপ্ন কেহ দেখে নাই, কেন না তেমন অনুভব কাহারও নাই। নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের এই মত।

পাতঞ্জলাদি দর্শনকারের মতে পূর্ব্বানুভব ব্যতীতও কেবল কর্ম্মবশে বা অদৃষ্টফলে স্বপ্নে অনেক অদৃষ্ট ও অননুভূত পদার্থের সাক্ষাৎকার লাভ হইতে পারে। অর্জ্জুন যেমন বিশ্বরূপধারী ভগবানের দেহে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে সমাগত বীরসমূহের ভবিষ্যচিত্র সন্দর্শন করিয়াছিলেন, শুভাদৃষ্টফলে জীবও তেমনি চিত্তগত সত্ত্বালোকের উজ্জ্বলতায় অদৃষ্টরূপে সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত কর্ম্মবাসনা-সমূহের ফলোন্মুখ সূক্ষ্ম অঙ্কুরনিচয় বিশদভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারে। সে কর্ম্মবাসনার ফলোন্মুখ অবস্থাই জীবের ভবিষ্যদবস্থা। বায়স্কোপ যন্ত্রের স্বচ্ছ ও ক্ষুদ্র কাচখণ্ডের উপর আলোকপাত করিয়া যেমন কাচ-মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রগুলিকে অতি স্থূল ও জীবন্তভাবে অবিকল দেখান হইয়া থাকে, কেবল অদৃষ্টজনিত স্বপ্নগুলিতেও সত্ত্বগুণের উৎকর্ষরূপ উজ্জ্বল আলোক-বিক্ষেপাদি-বর্জ্জিত সেই সুনির্ম্মল চিত্ত দর্পণে পতিত হওয়ায়, চিত্তক্ষেত্রে সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত, অচির ভবিষ্যতে ফলদানে উন্মুখ, কর্ম্মাঙ্কুরসমূহ অতি স্থূল ও নির্ম্মলভাবে স্বপ্নে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত স্বপ্নই সম্যকরূপ সফল।

অনেকেই অনুভব করিয়াছেন যে, প্রাতঃকালে কোনও আত্মীয়ের মৃত্যু স্বপ্নে দেখিলেন; আরও দেখিলেন সেই মৃত্যুসংবাদ লইয়া অমুক ব্যক্তি আসিয়াছে, অমনি জাগিয়া গোবিন্দ স্মরণ করিয়া ব্যগ্রভাবে দরজা খুলিলেন; দেখি-

লেন সেই স্বপ্নদৃষ্ট সংবাদদাতা পত্র-হস্তে দ্বার-উদ্‌ঘাটনের অপেক্ষা করিতেছে। সেই মৃত্যুসংবাদ তখনই জানিতে পারিলেন, স্বপ্ন তৎক্ষণাৎ সফল হইল। এতাদৃশ স্বপ্নই অদৃষ্টবিশেষবশে সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে সংঘটিত হয়।

অভীষ্ট দেবতার আদেশ হইতেও অনেক অননুভূত প্রকৃত বিষয়ে স্বপ্ন সন্দর্শন ঘটে। আমার ভগিনীপতি একদিন রাত্রিযোগে স্বপ্নে দেখিলেন যে, কে যেন তাহাকে ডাকিয়া বলিতেছে ওহে! তুমি ঘুমাইয়া আছ, শীঘ্র উঠ, তোমার গৃহে অগ্নি দিয়া চোর পলায়ন করিয়া যায়। তিনি উঠিলেন, ঘরের চালে অগ্নি দেখিলেন এবং ভগবৎ-কৃপায় অল্প প্রযত্নেই নির্ব্বাপনে সমর্থ হইলেন। এই শ্রেণীর স্বপ্নও অনেকে দেখিয়া থাকেন।

কেহ কেহ বা স্বপ্নে রোগমুক্তির উপায়সমূহ জানিতে পারেন; নানাবিধ ঔষধি প্রাপ্ত হন। কেহ বা স্বপ্নযোগে উপাস্য মন্ত্র ও উপদেষ্টা গুরুর নির্দ্দেশও পাইয়া থাকেন।

জাগ্রদাবস্থা হইতে স্বপ্নাবস্থার বিশেষত্ব আছে। জাগ্রদাবস্থায় বাহ্য উত্তেজনা দ্বারা আভ্যন্তরিক উত্তেজনা, সৌরালোকে চন্দ্র ও নক্ষত্রের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া থাকে; তজ্জন্যই তখন স্বপ্ন অনুভূত হয় না। স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ প্রসুপ্ত, উহারা তখন ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া নানা বিষয় হইতে বাহ্য উত্তেজনা আহরণ করিতে পারে না, তখন আভ্যন্তরিক উত্তেজনা বিশেষভাবে প্রকাশ পায়, এবং অতি নির্ম্মল ও পরিস্ফুটভাবে স্বপ্নজ্ঞান জন্মাইয়া থাকে।

জাগ্রদ্‌জ্ঞানে যেমন দিক্‌ কাল প্রভৃতি সীমাবদ্ধ, স্বপ্নজ্ঞানে সেরূপ নহে, এক মুহূর্ত্ত মধ্যে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এমন কি চতুর্দ্দশ ভুবনের নানা স্থানের নানা ঘটনা স্বপ্নে অভিনীত হইতে পারে। স্বপ্নাবস্থায় দিক্‌কাল প্রভৃতির সীমা বহু বিস্তৃত। যে কাণ্ড জাগ্রদবস্থায় সম্পাদিত হইতে বহু সহস্র বৎসরের প্রয়োজন, স্বপ্নে তাহা ক্ষণকাল মধ্যে সংঘটিত হইতে পারে।

'ডিকুয়িন্‌সি' ৬০ বৎসর-ব্যাপী একটী ঘটনা স্বপ্নে অভিনীত হইতে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয় সেই স্বপ্নও মুহূর্ত্তকালের অধিক স্থায়ী হয় নাই। আব্রহিল উপর্য্যুপরি তিন রাত্রি তাহার সমস্ত জীবন স্বপ্নে শুদ্ধ অভিনীত হইতে দেখিয়াছিলেন, কেবল দেখিয়াছিলেন না, তাহার নীতিগত উপদেশ সম্যক্‌রূপে নির্দ্ধারণ করিয়া বিশেষ উপকৃতও হইয়াছিলেন।

ব্যারণ কার্ল ডিপ্রেলের "ফিলজপি অব মিষ্টিসিজম্‌" নামক গ্রন্থে এইরূপ আরও নানা উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বপ্নের ভিতরে "আমি স্বপ্ন দেখিতেছি," "আমি শুইয়া আছি", ইত্যাকার যে প্রকৃত জ্ঞান কখন কখন জন্মে তাহার দার্শনিক নাম "স্বপ্নান্তিক"। স্বপ্নান্তিকও সংস্কার বশাধীন উৎপন্ন হয়, স্বপ্নান্তিক তাৎকালিক অনুভব হইতে যে সংস্কার জন্মে সেই সংস্কার জন্য; স্বপ্নে ও স্বপ্নান্তিকে এই মাত্র ভেদ।

সংস্কারের প্রবলতায় ও বায়ু-পিত্তাদি দোষজনিতে যে স্বপ্ন, তাহা শুভাশুভের সূচক হয় না, অদৃষ্টমূলক স্বপ্ন ঐ ইষ্টানিষ্টের সূচনা করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত শাস্ত্রে লিখিয়াছেন,—

চিন্তা দুঃখেন শোকেন ব্যাধিগ্রস্থেন বা পুনঃ।
কামোৎসুকেন চিত্তেন স্বপ্নেন ফলভাগ ভবেৎ॥

চিন্তা, দুঃখ, শোক, ব্যাধি ও কামে উদ্বিগ্ন চিত্ত ব্যক্তিগণের স্বপ্ন বিফল হইয়া থাকে।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্যসাঙ্খ্যতীর্থ।

জীবনের ভুল।

(১)

সকলেই বলিত, যোগেশ বড় ভাল ছেলে। রূপে, গুণে, বুদ্ধিমত্তায়, বিদ্যাবত্তায় ও সচ্চরিত্রতায় তাহার মত ছেলে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। যোগেশের বাপ মা এ হেন পুত্ররত্ন লাভ করিয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান মনে করিতেন।

বাস্তবিক যোগেশ ছেলেটী বেশ বিনয়ী এবং শান্তপ্রকৃতি ছিল; কিন্তু তাহার চিত্তের লঘুতাও অত্যধিক পরিমাণে ছিল।

যোগেশের পিতা সঙ্গতিশালী লোক। যোগেশ তাহার একমাত্র সন্তান। একাধারে ধন-মান-খ্যাতি-প্রতিপত্তিসম্পন্ন রূপবান শিক্ষিত যোগেশের বিবাহের আড়ম্বরটা কিছু বেশী রকমের হইতেছিল। যোগেশের শ্বশুর হইবার আকাঙ্ক্ষা অনেক পাত্রীর পিত মনোমধ্যে পোষণ করিয়া যোগেশের পিতার দ্বারস্থ হইতে লাগিল। যথাসময়ে মহাসমারোহে একজন ধনাঢ্যের দুহিতার সহিত যোগেশের পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল।

যোগেশের বাল্যবন্ধু ভবানী একদিন হাসিতে হাসিতে যোগেশকে বলিল—"দেখিও যোগেশ, তোমার চারিদিকে সহস্র প্রলোভন, তুমি দুর্ব্বলচিত্ত, খুব সাবধান।"

আত্মশক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাসী যোগেশ ঈষৎ গর্ব্বসূচককণ্ঠে বলিল—

"টলিলে টলিতে পারে পৃথিবী গগন
নিশ্চয় অটল জেনো যোগেশের মন।"

(২)

কালক্রমে যোগেশের পিতা মাতা স্বর্গারোহণ করিলেন। অভিভাবকহীন ঐশ্বর্য্যশালী নবযুবকের অনেক হিতৈষী চাটুকার বন্ধু জুটিল। বাল্যবন্ধু দরিদ্র নিরীহ ভবানীর সহিত বেশী মেশামিশি ভাব তাহার তত ভাল লাগিত না। ভবানী বুঝিতে পারিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

ভাগ্যগগনে যখন সৌভাগ্যসূর্য্য প্রখর তেজে উদীয়মান হয়, তখন মানবের অবস্থা অতিশয় ভয়াবহ। প্রশংসার ব্যাপকতায়, ঐশ্বর্য্যের মাদকতায় যোগেশের বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটিল। মধ্যে মধ্যে ভবানী আসিয়া সাবধান করিয়া দিত, যোগেশের তাহা ভাল লাগিত না। সে একদিন ভবানীকে বেশ দু'চার কথা শুনাইয়া দিল। ব্যথিত, অনুতপ্ত ভবানী নিবৃত্ত হইল।

মধু থাকিলে মধুকরের অভাব হয় না। দিবারাত্রি যোগেশের ভবন বন্ধু-বান্ধবের হাস্যকোলাহলে মুখরিত থাকিত। যোগেশের হিতার্থে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে কেহ কুণ্ঠিত নহে, এমনতর ভাব যোগেশ সতত বন্ধুদের মধ্যে দেখিতে পাইত। সরল-বিশ্বাসী দুর্ব্বলচিত্ত যোগেশ বন্ধুদের অজস্র প্রশংসাবাদের প্রতিধ্বনিস্বরূপ আত্মহারা হইয়া আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছিল।

যোগেশের অমিতব্যয়িতা ক্রমশঃ অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়া চলিল। পুরাতন হিতৈষী কর্ম্মচারিবৃন্দ সাবধান করিয়া দু'টা সদুপদেশ দিলে যোগেশ বংশগত মানমর্য্যাদা রক্ষার কথা তুলিয়া নিজ কার্য্য সমর্থন করিত। সুতরাং তাহারা নিরস্ত হইত।

নাচ গান পান ভোজন প্রায় নিত্যই চলিতে লাগিল। বন্ধুদের মন রক্ষা করা চাই,—কাজেই এই আয়োজন।

(৩)

নীলিমলীলামণ্ডিত নীলাম্বরে সুধাংশু হাসিতেছে। চাঁদের উজ্জ্বল আলোকে সমস্ত ভুবন ভরিয়া উঠিয়াছে। চারিদিক ফুল্লজ্যোৎস্নাস্নাত। কি সুন্দর

শুভ্র, নীরব নিস্তব্ধ শান্তমূর্ত্তি! সুধাকর-সম্পৃক্ত সমীরণ জগতের বিশাল বক্ষে স্নিগ্ধ পরশ বুলাইয়া মৃদু মৃদু বহিতেছিল।

যোগেশ স্বীয় সৌধোপরি ছাদের উপর শুইয়া আছে। দৃষ্টি পাশের বাড়ীর ছাদের উপর নিবদ্ধ; নিতান্ত অন্যমনা।

স্বামী এখন ছাদে রহিয়াছেন, ঠাণ্ডা বাতাস দিতেছে, এত রাত হইয়াছে যাই ডাকিয়া আনি মনে করিয়া যোগেশের স্ত্রী লীলা যোগেশের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

যোগেশ নিস্পন্দ স্থাণুর ন্যায় পড়িয়াছিল; সংজ্ঞা ছিল কি না বলা যায় না সে কিছু বুঝিতে পারিল না। "ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন দেখিতেছি" বলিয়া গাত্রে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক লীলা মৃদু কণ্ঠে ডাকিল—"এস, ঘরে এস! এত রাত পর্য্যন্ত ছাদে শুইয়া আছ, ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুখ হ'বে।"

যোগেশের লুপ্ত চেতনা যেন পুনরাগত হইল। সসঙ্কোচে যোগেশ উঠিয়া বসিয়া বলিল—"ওঃ। তাই ত অনেক রাত হ'য়েছে! তুমি কত ক্ষণ এসেছ।"

লীলা। এই মাত্র আস্‌ছি।

যেন হাঁপ ছাড়িয়া যোগেশ বলিল—"তুমি তা'হলে বেশী ক্ষণ আসনি। তুমি কখন এসেছ, আমি কিছু জানিতে পারিনি; ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

লীলা। তা'ত দেখতেই পাচ্ছি। এই রকম করে তুমি বুঝি খুব সাবধানে থাক্‌বে। তুমি যেরূপ হুঁসিয়ার লোক তা'তে তোমাকে একলা ফেলে আমার বাপের বাড়ী যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

হাসিয়া যোগেশ বলিল—"এখন হুঁস করিয়ে দেবার লোক কাছে আছে বলিয়া এত বেহুঁস। যখন তা' থাক্‌বে না, তখন আপনিই হুঁসিয়ার হ'ব, তা' দেখতে পাবে।

লীলা। তা' হ'লেই ত বাঁচি। কিন্তু সোয়াস্তি পাব না। না হয় আমি যা'ব না, কি বল।

যোগেশ। না, না, তা' কি হয়। তোমাকে বাধ্য হ'য়ে যেতে হ'বে। এখানে কে আছে যে তোমাকে সে সময় দেখবে শুনবে! ঝি চাকর দ্বারা কি বেশী যত্নের আশা করা যায়, না তা'রা তা' করতেই পারে? তুমি তা'দের কাছে গেলে আমি নিশ্চিন্ত হ'ব। আমার জন্য তুমি ভেব না। আমার কোন কষ্ট হ'বে না।

মনের কোন স্থানে যেন হঠাৎ একটা বেদনা বোধ হইল। সেটা গ্রাহ্যের

মধ্যে না আনিয়া লীলা বলিল—"উপায় নাই, তাই অগত্যা যেতে হ'বে, নচেৎ আমার যাবার ইচ্ছে ছিল না। তুমি একাকী এ কয় মাস থাক্‌তে পার্‌বে ত!

যোগেশ। তা' খুব পারব।

সামলাইয়া পুনরায় বলিল—"তা' না পারলেও পারতে হবে; উপায় ত নাই। চল রাত হ'য়েছে, ঘরে চল।"

(৪)

লীলা আসন্নপ্রসবা। যোগেশের বাড়ীতে দেখিবার শুনিবার কেহ নাই বলিয়া তাঁহার পিতা মাতা কয় মাস হইতেই তাহাকে তাঁহাদের বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য জেদ করিতেছেন। যোগেশের কোনও অমত না থাকিলেও লীলা নানা আপত্তি তুলিয়া এত দিন যায় নাই।

কিন্তু আর দিন নাই। অগত্যা অনিচ্ছা সত্বেও আগামী কল্য লীলার পিত্রালয়ে যাইবার দিন স্থির হইয়াছে।

যোগেশ বেশ আরামে নিদ্রা গেল। লীলার চক্ষে আজ নিদ্রাদেবীর অকৃপা। সে কিছুতেই চক্ষের পাতা বুজিতে পারিল না।

আজিকার রাতটী কেবল সে এখানে আছে বই ত নয়। কাল এতক্ষণ সে কত দূরে পড়িয়া থাকিবে, আর যোগেশও একাকী এখানে থাকিবে। আজ সে কি করিয়া ঘুমাইবে! যতক্ষণ থাকে, সে কেন সে সময়টুকুর সার্থকতা সম্পাদন না করিবে? অপলকনেত্রে লীলা নিদ্রিত স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিল।

লীলার সুখের নিশি প্রভাত হইয়া গেল। পরদিন যথাসময়ে যাত্রা-উপযোগী সমস্ত গুছাইয়া লীলা ম্লানমুখে স্বামীর চরণে প্রণতা হইল। হাত ধরিয়া তুলিয়া যোগেশ সাদরে বলিল—"লীলা, খুব সাবধানে থাকিও; পত্র লিখিতে ভুলিও না।"

ছল ছল নয়নে স্বামীর প্রতি চাহিয়া রুদ্ধকণ্ঠে লীলা বলিল—"তুমিও কেন আমার সঙ্গে চল না। দু'দিন থাকিয়া আবার ফিরিয়া আসিবে।"

যোগেশ। পাগল! এখন কি ক'রে যাওয়া চলে! এখন তহশীলের সময়, এ সময় আমি না থাক্‌লে সব মাটী হ'য়ে যা'বে।

লীলা। তবে কবে যাবে বল।

যোগেশ। কাজ শেষ ক'রে নিশ্চয় যাব। সেজন্য তুমি ব্যস্ত কেন?

স্বামীর চরণে প্রণতা হইয়া ম্লানমুখে লীলা গাড়ীতে উঠিল। কে জানে কেন তাহার প্রাণের মধ্যে কেমন হাহাকার করিয়া উঠিতেছিল!

(৫)

লীলা পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবার পর প্রথমটা যোগেশের কেমন যেন সব ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতেছিল। তার পর যখন সে বন্ধুবর্গের আনন্দ হাস্য কোলাহল স্তুতিবাদের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন লীলার অস্তিত্ব কোথায় হৃদয়ের কোন নিভৃত স্থানে লুকাইয়া পড়িল!

এক মাস দুই মাস করিয়া ছয় মাস কাটিয়া গেল। যোগেশের কাজ শেষ হইল না; সুতরাং লীলার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিল না। একখানি পত্র তাহাও সময়মত দেওয়া ঘটিয়া উঠে না। পাঁচ সাতখানি পত্র আসার পর তবে একখানি ক্ষুদ্র পত্র চেষ্টা করিয়া অনেক কষ্টে সময় বাহির করিয়া যোগেশ লিখিতে পারে।

লীলা যখন যোগেশের বাড়ীতে ছিল, তখন হইতেই তাহার অধঃপাতের সূচনা হইয়াছিল; কিন্তু লীলা কিছু জানিত না বা সে কোন খোঁজ রাখিত না। কেহ কোন অমিতব্যয়িতার আভাস জানাইলে লীলা বলিত তিনি যাহা ভাল বোঝেন তা'ই করেন। সত্যই ত এ সব মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্য করিতেই হয়; নচেৎ বংশগত সম্ভ্রম বজায় রাখা যায় না।

এই অমিতব্যয়িতার অন্তরালে যে তাহার স্বামীর উৎসন্নের পথ প্রশস্ত হইতেছিল, সাধ্বী লীলা তাহা জানিতে পারে নাই। যোগেশ যত মন্দ হউক তাহার হৃদয় স্নেহশূন্য ছিল না। লীলার মনোবেদনার ভয়ে সে সতত সাবধানে চলিত। তাহার নিকট অনেক বিষয় গোপন রাখিত। লীলা পিত্রালয়ে গমনের পর কুৎসিৎ আনন্দস্রোত অবাধে চলিতে লাগিল। দিন দিন ঋণ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যোগেশের চৈতন্য নাই!

লীলার একটী পুত্রসন্তান হইয়াছে—সংবাদ আসিয়াছে। যোগেশকে লইতে তাহার শ্বশুরালয় হইতে কতবার লোক আসিয়াছে। লীলার মিনতিপূর্ণ কত পত্র আসিয়াছে। যোগেশের যাইবার অবসর হয় নাই। ক্রমে এক বৎসর অতীত হইয়া গেল। লীলা আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পত্র লিখিল। যোগেশ উত্তর দিল—খোকা একটু বড় হো'ক, তবে এস, নচেৎ তোমার কষ্ট হ'বে।

প্রভুভক্ত হিতৈষী প্রাচীন কর্ম্মচারী হরিনাথ গোপনে লীলার পিতাকে পত্র লিখিল—মা'কে শীঘ্র পাঠাইয়া দিবেন, নচেৎ মঙ্গল নাই।

(৬)

লীলা পুত্রকে কোলে করিয়া হর্ম্ম্যতলে বসিয়া আছে। উদাস দৃষ্টি বাতায়ন পথে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, বড়ই অন্যমনস্ক, বদন বিষণ্ণ।

এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল—"লীলা।"

মুখ ফিরাইয়া লীলা বলিল—"কি, রমেশ দাদা। কখন এলে? শ্রীরাম-পুরের বাড়ীর সব ভাল ত।"

জ্ঞাতি-ভ্রাতা রমেশ ম্লানমুখে বলিল—"হাঁ, একরূপ সব ভাল, তা' তোমাকে সেখানে না গেলে হচ্ছে না। গৃহিণী না থাকিলে গৃহের শ্রী থাকে না। সব লক্ষ্মীছাড়া হ'য়ে যায়।"

উদ্বিগ্নভাবে লীলা বলিল—"তুমি ওরূপ শুষ্কমুখে কথা বল্‌চ কেন দাদা? সত্য করে বল, তাঁর শরীর ভাল আছে ত; আমাকে কি যেতে বলেছেন?"

রমেশ। না, তোমাকে যোগেশ যাইতে বলে নাই। আমি তাহার সাক্ষাৎ পাই নাই। তবে শুনিলাম সে ভাল আছে। কিন্তু যেরূপ অবস্থা শুনিলাম, তাহাতে অধিক দিন ভাল থাকিতে না পারে। অত অত্যাচার কি মানুষের দেহে সহ্য হয়! সেজন্য আমি তোমাকে তথায় যাইতে বলিতেছি। তুমি আর কাহারও অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া যত শীঘ্র পার সেখানে যাও। বোন, তুমি শুনিয়া দুঃখিত হইবে যে যোগেশের অধঃপতন হইয়াছে। সুশিক্ষিত যোগেশের অবনতি দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি।

লীলার মাথা ঘুরিতে লাগিল। চোখে কিছু দেখিতে পাইল না; সব যেন অন্ধকার! দেয়ালে মস্তক রক্ষা করিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া আপনাকে সামলাইয়া ধীরে ধীরে বলিল—"তুমি ভুল বুঝিয়াছ, রমেশ দাদা—ইহা অসম্ভব।"

রমেশ লীলার অবস্থা না বুঝিয়াছিল এমন নহে, কিন্তু তাহার ভ্রম অপনোদনের জন্য পুনরায় বলিল—"লীলা, তুমি ব্যথা পাইবে বলিয়া এতদিন তোমাকে কিছু না বলিয়া আমরা নিজেরাই তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, তুমি ভিন্ন তাহার চরিত্র পরিবর্ত্তন আর কেহ করিতে পারিবে না। সুতরাং তোমাকে সব কথা খুলিয়া বলাই সঙ্গত বিবেচনায় আজ আমি এত কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। লীলা, তুমি ভ্রান্ত। যোগেশের চরিত্র সম্বন্ধে তুমি নিতান্ত ভুল বুঝিয়াছ।"

সাধ্বীর যেন আর সহ্য হইল না। স্বামী যত মন্দই হউক, অপরে তাহার

নিন্দা করিলে কোনও রমণী তাহা সহ্য করিতে পারে না ; প্রাণপণে সে তাহার দোষ ঢাকিতে চায়।

লীলা একটু উত্তেজিতভাবে বলিল—"আমি যদি ভ্রান্ত হই, আমার সেই ভ্রান্তিতেই সুখ। রমেশ দাদা, তুমি মিথ্যা তাঁহার দোষ দিও না। তাঁহার হৃদয় উদার ; মুক্তহস্তে দানের জন্য, লোকে বলে তাঁহার অবনতি ঘটিয়াছে। সেটা তাঁহার সৎ না অসৎ কার্য্য—তোমরা বল।"

ঈষৎ হাসিয়া রমেশ বলিল—"উহাকে দান বলে না, লীলা, অপব্যয় বলে। অপাত্রে দান, অন্যায় কার্য্যের প্রশ্রয় দেওয়ায় পুণ্য নাই, বরং পাপ সঞ্চয় হইয়া থাকে। আমার মনে হয় তোমার এই গভীর অন্ধবিশ্বাসের জন্য তাহার এত অবনতি ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে হইতে যদি তুমি তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে, তাহা হইলে তাহার এতদূর অধঃপতন হইত না। পশুকে দেবতা জ্ঞানে—"

বাধা দিয়া লীলা ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—"রমেশ দাদা, তুমি আমার প্রতি চিরদিন অপরিসীম স্নেহশীল, তাই তোমার এত কথা আমি নীরবে শুনিতেছি। অন্য কেহ হইলে তাহাকে ঘোর মিথ্যাবাদী এবং আমার চিরশত্রু জ্ঞান করিয়া তাহার মুখদর্শন পাপজনক মনে করিতাম। কিন্তু আমি জানি তুমি আমার ভবিষ্যৎ চিন্তায় কাতর হইয়া এ সকল কথা বলিতেছ। আমি এ সমস্ত বিশ্বাস করিতে অক্ষম। রমেশ দাদা, তুমি দুঃখিত হইও না। তুমি আমাকে ভ্রান্ত বলিতেছ, এবং আমিও তোমাকে ঘোর ভ্রান্তিতে নিমগ্ন দেখিয়া মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাইতেছি। তুমি তাঁহার হৃদয় জান না, তাই এ সকল কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছ না। স্বামী পশুই হউন, আর মানুষই হউন, স্ত্রীজাতি তাঁহাকে দেবতা জ্ঞান করিয়া থাকে। তুমি আজ আমাকে যে অন্ধবিশ্বাসের দোষ দিতেছ, আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আমার সেই অন্ধবিশ্বাস চিরদিন হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকুক এবং তোমরা আমাকে সেই আশীর্ব্বাদ কর। কারণ আমি সেই অন্ধবিশ্বাস লইয়া সুখে আছি এবং পরে সুখে থাকিব। চোখওয়ালা অবিশ্বাস লইয়া আজীবন অশান্তির নরকানলে দগ্ধ হইতে ইচ্ছা করি না। আজ ভ্রম-বশে যাঁহার দেবোপম চরিত্রকে তোমরা গভীর পাপপঙ্কে নিমগ্ন করিতেছ, দেখিও এই অন্ধবিশ্বাসের বলে তোমরা সেই দেবতাকে স্ব-সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইবে।"

স্তম্ভিত রমেশ বাক্যনিঃসরণ করিতে না পারিয়া নীরবে রহিল।

আরক্তমুখে লীলা পুনরায় বলিল—"রমেশ দাদা, আমার যাত্রার আয়োজন করিয়া দাও। আমি এ বাটীতে আর তিষ্ঠিতে পারিব না।"

লীলা পুত্রকে কোলে করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল। লীলার মনে হইতে লাগিল যেন পুরবাসীবর্গ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তাহার দেবোপম স্বামীর চরিত্র সম্বন্ধে কুৎসিত কাণাঘুষা করিতেছে। লীলা সত্বর সমস্ত দ্রব্যাদি গুছাইয়া লইয়া প্রস্তুত হইল।

তাহার মাতা বলিল—"একি লীলা, আজ কি যাওয়া হয়, কাল যেও। আজ বেলা পড়ে এসেছে, বাটী পৌঁছিতে সন্ধ্যা হবে, খোকার ঠাণ্ডা লাগবে।"

লীলা দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—"না মা আজই যাব, তুমি অমত কর না। সন্ধ্যার মধ্যে তথায় গিয়া পৌঁছিব। খোকার তা'তে বেশী ঠাণ্ডা লাগবে না।"

মাতা কন্যার মানসিক অবস্থা বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং আর কিছু না বলিয়া বসনপ্রান্তে নয়ন মুছিয়া যাত্রার আয়োজন করিয়া দিলেন। সঙ্গে একজন দাসী এবং একজন দ্বারবান চলিল, আর চলিল লীলার রমেশ দাদা।

উৎকণ্ঠিতা লীলা পিতৃমাতৃচরণে প্রণতা হইয়া পাল্কীতে উঠিল। বিদায়-অশ্রুর সহিত তাঁহারা বিধাতৃচরণে জামাতার সুমতি প্রার্থনা করিলেন।

(৭)

প্রমোদ উদ্যানে নিশা যাপন করিয়া প্রভাতে যোগেশ আরক্তনেত্রে বাটী গমনে প্রস্তুত হইল। এমন সময়ে ভৃত্য রামলাল তাঁহার সম্মুখে আসিয়া প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইল।

যোগেশ বলিল—"সংবাদ কি ?"

নতদৃষ্টিতে মৃদুকণ্ঠে রামলাল বলিল—"গত কল্য রাত্রি আটটার সময়ে মা খোকাকে লইয়া বাটী এসেছেন।"

চমকিত হইয়া যোগেশ বলিল—"কেহ আনিতে গিয়াছিল কি ?"

রামলাল। কেহ আনতে যায়নি। তিনি সেখান থেকে লোক সঙ্গে লয়ে এসেছেন। পূর্ব্বে আমরা কেহ তাঁর আসার খবর পাইনি।

শুষ্কমুখে যোগেশ বলিল—"লোকজন চলিয়া গিয়াছে না আছে ? তোমরা আমার কথা কি বলিলে ?"

রামলাল। লোকজনকে মা রাত্রেই বিদায় দিয়াছেন। আমরা বলেছি, আপনি নিমন্ত্রণে গিয়াছেন।

যোগেশ। উত্তম করিয়াছ; আচ্ছা তুমি এখন যাও। আমি যাচ্ছি। গাড়ীর আবশ্যক নাই, হেঁটে যাব।

ভৃত্য চলিয়া গেল।

যোগেশ একখানি সোফায় শয়ন করিয়া মুদিতনেত্রে আকাশ-পাতাল ভাবিয়া শেষে বুদ্ধিটা অনেক সংযত করিয়া প্রমোদ-উদ্যান হইতে বাহির হইল।

পথটী বরাবর নদীর পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গিয়াছে। পথের অপর পার্শ্বে শস্য-ক্ষেত্র, প্রভাতে শিশিরসিক্ত একখানি সবুজ গালিচার মত দেখাইতেছিল। যোগেশ ঠিক রাস্তায় না গিয়া শস্যক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া যাইতে লাগিল; ইচ্ছা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ না হয়। যোগেশ দেখিল, তাহার বাল্যবন্ধু চিরদরিদ্র চির-উদাসী ভবানী নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছে। তাহার হস্তদ্বয় বক্ষে নিবদ্ধ, নেত্রদ্বয় নির্ম্মল নীলাকাশে স্থাপিত। মধুরকণ্ঠে ভবানী গাহিতেছে—

এস হে হৃদয়রাজ, প্রিয় হে চিরসুন্দর,
তোমারি আসনে হের, শোভিত হৃদিকন্দর।
পুষ্পশোভিত শুভ্র যামিনী, কনককান্তি কৌমুদী,
ঝঙ্কারে পিক, গুঞ্জরে অলি, চঞ্চলতর অম্বুধি।
সাজায়ে রেখেছি, জীবনকুঞ্জে, প্রেম তৃষিত অন্তর।
রচিয়াছি নবকুসুম শয়ান, এস নাথ এস আকুল পরাণ,
উদিত হও হে পূর্ণচন্দ্র, শোভিয়া হৃদি-অম্বর;
নীলকান্ত বপু, চন্দনচর্চ্চিত, হৃদয়ে হেরিব সেরূপ বাঞ্ছিত
প্রেম-বারি নাথ করিয়া সিঞ্চিত, জীবন-তরু মুঞ্জর।

একটা বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া যোগেশ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় গানটী শুনিতে-ছিল। হঠাৎ তাহাকে ধাক্কা দিয়া কে দ্রুতপদে তাহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। যোগেশ চাহিয়া দেখিল একটী লোক ব্যাকুলভাবে ছুটিতে ছুটিতে যাইয়া ভবা-নীর চরণপ্রান্তে পতিত হইল। ভবানী সাদরে তাহাকে উঠাইয়া বলিল—"ভাই নন্দ, যাঁর কর্ম্ম তিনিই করিয়াছেন, আমাকে কেন এত লজ্জা দিতেছ?"

নন্দ বাষ্পজড়িত কণ্ঠে বলিল—"আপনি আমার জীবনদাতা, কেবল আমার কেন, আমার বৃদ্ধা মাতার এবং পরিবারস্থ সকলের জীবনদাতা, মানরক্ষাকর্ত্তা। আপনাকে কি বলিয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইব—"

বাধা দিয়া ভবানী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"নন্দ, আমি তোমারি মত দীন-হীন কাঙ্গাল, দরিদ্র ভিখারী।"

যোগেশের পদতল হইতে ধরিত্রী যেন ধীরে ধীরে অপসৃত হইতেছিল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। যোগেশ সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। এ ব্যক্তি আর কেহ নয় তাহারই অত্যাচারে পীড়িত, নিঃস্ব তাহারই একজন প্রজা। গত কল্য যাহার বিধবা যুবতী ভগ্নীকে যোগেশ হরণ করিয়া, যাহার জাতিকুল ধ্বংশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিল, একটী ধর্ম্মপ্রাণ সংসারকে চিরকলঙ্কে নিমগ্ন করিতে চাহিয়াছিল, একজন অবলার সর্ব্বনাশ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল এবং যাহাদের প্রতিবন্ধকতায় তাহা সম্পন্ন হয় নাই, যাহারা সেই অবলাকে এই ঘোর নিরয় হইতে রক্ষা করিয়াছে—যোগেশ দেখিল এ দু'জন তাহারাই।

অদৃষ্টের কি দারুণ পরিহাস! সে যাহাকে ঘৃণা করে, যাহাকে নিজ অপেক্ষা কত হীন, কত নীচ বিবেচনা করে, আজ যোগেশ তাহা অপেক্ষা কত নীচে—কত দূরে। দরিদ্র ভবানীর আসন আজ কত উচ্চে তাহা সে উপলব্ধি করিল। আর প্রবল পরাক্রান্ত মহামহিমান্বিত ঐশ্বর্য্যশালী শিক্ষিত জমীদার, আজ তাহা অপেক্ষা কত হীন, কত দীন, কত নীচ, তাহা বুঝিল।

যোগেশ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে কে যেন যোগেশের স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিল। যোগেশ মুখ ফিরাইয়া দেখিল—ভবানীর স্নেহমণ্ডিত নয়নদ্বয় তাহার প্রতি চাহিয়া আছে। সে নয়নে কত সহানুভূতি, কত আশ্বাস, কত সমবেদনা ফুটিয়া রহিয়াছে! যোগেশ দুই হস্তে বদন আবৃত করিল।

সস্নেহে ভবানী বলিল—"যোগেশ ওঠ। তোমার এ মোহ অচিরে দূর হইবে। ভাই বিধিলিপি অনিবার্য্য।"

যোগেশের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। মৃতের মত বিবর্ণ মুখে কাতরকণ্ঠে বলিল—"ভাই, আমি এ কালা মুখ লইয়া আর গৃহে ফিরিব না; অনুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। তুমি মহাপ্রাণ, আমার হতভাগ্য পুত্র, হতভাগিনী পত্নীকে দেখিও।"

দৃঢ়ভাবে যোগেশের হাত ধরিয়া ভবানী ভৎর্সনার স্বরে বলিল—"ছিঃ যোগেশ, তুমি চিরদিন একই রকম দুর্ব্বলচিত্ত রহিলে, একটুতে ভাঙ্গিয়া পড়। মানবমাত্রেই ভ্রমান্ধ; সে ভ্রম যে শীঘ্র বুঝিতে পারে, সে মোহজাল যে শীঘ্র ছিঁড়িতে পারে, তার প্রতি ভগবানের দয়া অপরিসীম। তুমি ভগবানের কৃপা লাভ করিয়াছ। তোমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছ। এখন তাঁহার নির্দ্দিষ্ট

কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হও ; ধৈর্য্য অবলম্বন কর। শক্তি সঞ্চয় কর ; স্বার্থ জয় কর, প্রেমিক হও।"

যোগেশ। আমার কর্ত্তব্যপথ কোথায়, দেখাইয়া দাও। ভাই! আমি অন্ধ, চিরদুর্ব্বল, মূঢ়, মহাপাপী, লোভী, স্বার্থপর। ভাই ভবানী! তোমার পায়ের ধূলা আমার মাথায় দাও। আমার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর। তোমার কৃপায় আমি পাপমুক্ত হই, কর্ত্তব্যপথ নিরীক্ষণ করি।

যোগেশ উঠিয়া ভবানীর পদধূলি গ্রহণ করিল। ভবানী তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল "চল, তোমায় পথ দেখাইয়া দি।

(৮)

যোগেশের বাটীর বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া ভবানী বলিল—"যাও, গৃহে যাও, আজ যাহার পবিত্র জ্যোতিঃতে তোমার অন্ধকার ভবন, এবং ততোধিক অন্ধকার হৃদয় আলোকিত হইয়াছে, যাও তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার পবিত্র আলোকে কর্ত্তব্যপথ দেখিতে পাইবে ; কলুষিত চিত্ত নির্ম্মল হইবে।"

ভবানী চলিয়া গেল।

কেন এ দারুণ অধঃপতন, কেন এ স্বভাবের শোচনীয় পরিণাম ? যোগেশও এক সময় ভবানীর মত সদ্‌গুণশালী ছিল। সেও একদিন নিষ্কলঙ্ক চরিত্র-বিভবে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিত। একদিন ত সকলেই তাহাকে স্নেহের চক্ষে প্রশংসমান ছবিতে দেখিত। আর আজ কেন সে এত হেয়, এত ঘৃণিত, অনুতপ্ত ? দারুণ অশান্তি যেন দিবানিশি তাহাকে দগ্ধ করিতেছে। লোকে এখন কেন তাহাকে ভবানীর মত অন্তরঙ্গ ভাবে না ? কেন তাহাকে দেখিলে নতদৃষ্টিতে দূরে চলিয়া যায় ? সে স্নেহ, সে সমপ্রাণতা, সে প্রশংসা, সহৃদয়তা, আর কেন সে পায় না ? একমাত্র চিত্তের লঘুতাই কি তাহার কারণ ?

আজ লীলার নিকট সে কি করিয়া মুখ দেখাইবে ? কি করিয়া এই দারুণ কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া তাহার পবিত্র নয়ন-সমক্ষে দাঁড়াইবে! তাহার প্রাণঢালা গভীর ভালবাসার কি এই প্রতিদান! তাহার অবাধ সরল বিশ্বাসের কি এই পরিণাম!

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কম্পিতপদে যোগেশ অন্দরে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই লীলা পুত্রক্রোড়ে দণ্ডায়মান। স্বামীর শুষ্ক মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লীলার অস্থিপঞ্জর যেন ধ্বসিয়া পড়িল। আত্মসংযমপরায়ণা লীলা ধীরে

ধীরে তাহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া পুত্রকে স্বামীর ক্রোড়ে অর্পণ করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল—"অমন করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ঘরে এস।"

কলের পুতুলের মত লীলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যোগেশ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। শিশু পিতার মুখপানে চাহিয়া হাসিল। সে হাসি কি মধুর! কি শান্তিদায়ক! যোগেশ উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বক্ষোপরি পুত্রকে চাপিয়া ধরিল।

নির্ব্বাক দম্পতী অশ্রুপূর্ণনেত্রে কিয়ৎক্ষণ স্নেহাধার প্রতি চাহিয়া রহিল। বাষ্পজড়িত ভগ্নকণ্ঠে যোগেশ কহিল—"লীলা, আমি নরাধম, আমি প্রবঞ্চক!"

স্বামীর বদন স্বীয় হস্ত দ্বারা আবৃত করিয়া লীলা কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল —"চুপ কর, চুপ কর; তুমি অমন করিতেছ কেন। আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। কি হ'য়েছে তোমার? আমার স্বামী দেবতা; কে বলে তুমি প্রবঞ্চক?"

বাধা দিয়া উন্মত্তের মত যোগেশ বলিল—"লীলা, আমি নরকের আগুণ জ্বালিয়াছি। তুমি জান না তোমার হতভাগ্য স্বামী আজ কত অধঃপতিত।"

অধীরভাবে লীলা বলিল—"আবার, আবার সেই কথা; আগুণ তুমি জ্বালাও নাই। তোমার অদৃষ্টদেবতা জ্বালাইয়াছে; আর তাহাতে ইন্ধনক্ষেপ করিও না; নিভিতে দাও। গত বিষয় ভুলিয়া যাও।"

যোগেশ। কিরূপে ভুলিব লীলা, বলিয়া দাও। প্রাণ জ্বলে যাচ্ছে! উঃ! কেন এমন মতিভ্রম হইল? বল লীলা কি করিলে ভুলিব, কিসে শান্তিলাভ করিব?

লীলা। আমি ভুলাইব; আমি শান্তি দিব। ঈশ্বর সে শক্তি দিয়াছেন। তুমি এখন এস, স্নান আহার কর। মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, দেহে কিছু নাই। তোমাকে দেখিয়া আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। কেন আমি এতদিন বাপের বাড়ী ছিলাম? আমার দোষেই ইহা ঘটিয়াছে। আমি কেন গিয়াছিলাম?

আর বাধা মানিল না; হু হু করিয়া নয়নে স্রোত বহিল। স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া লীলা ফুলিয়া ফুলিয়া অনেক দিনের হৃদয়ের ভার লাঘব করিল।

অশ্রুতে অশ্রু মিশিল। অশ্রুপ্লুতা বক্ষাশ্রিতা পত্নীর প্রতি চাহিয়া চাপিয়া চাপিয়া যোগেশও খুব কাঁদিল।

বেদনার প্রথম আবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে যোগেশ রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"লীলা, এ কাহার ছলনা? আমার কি ছিল না? আমার মত সৌভাগ্যশালী কয় জন ছিল। শান্তিপূর্ণ সংসার, প্রেমময়ী পত্নী, খ্যাতি-প্রতিপত্তি, মান-

সম্ভ্রম, উচ্চশিক্ষা, সর্ব্বাপেক্ষা তোমার অগাধ ভালবাসার অধিকারী হইয়াও আমার কেন এ ভ্রান্তি ঘটিল? কি সুখের আশায় আমি জীবনের সব সুখ-শান্তিতে জলাঞ্জলি দিলাম। বলিতে পার লীলা কেন এমন হয়?"

প্রশান্ত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া লীলা বলিল,—"প্রপঞ্চময় জগতে ভ্রান্তিশূন্য কে আছে? ভ্রম অনিবার্য্য। অবিদ্যারূপিণী মহামায়ার ছলনা, তাই এ জীবনের ভুল।"

শ্রীমতী উষাপ্রমোদিনী বসু।

হাতীর বীরত্ব। *

[ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত।]

সে অনেক কালের কথা। ভারতের দক্ষিণে যে মহারাষ্ট্র দেশ আছে, সেই দেশের অধিবাসীরা ছিল তখন স্বাধীন। চলিত কথায় এই দেশের লোকদের বলে মারহাট্টা।

সেই সময়ে ইহাদের দেশে একটা খুব বড় হাতী ছিল। তেমন প্রকাণ্ড হাতী তখন আর ছিল না; তাহার উপর হাতীটী ছিল বুদ্ধিমান। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মারহাট্টারা এই হাতীটীকেই তাহাদের জাতীয় পতাকার বাহক করিয়াছিল।

হাতীটীকে বাহক নিযুক্ত করিবার কিছুদিন পরেই মারহাট্টাদের সঙ্গে আর এক জাতির যুদ্ধ বাধিল। দলে দলে মারহাট্টা সৈনিকেরা অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটিল। সঙ্গে চলিল—এই হাতী। তাহার পৃষ্ঠের উপর মারহাট্টাদের জাতীয় পতাকা—সে পতাকা বাতাসে পত পত করিয়া উড়িতেছিল।

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই এই হাতীটীর উপর যে মাহুত ছিল তাহার দেহে একটা তীর আসিয়া বিঁধিল। এই তীর শত্রুরাই ছুঁড়িয়াছিল।

তীরের আঘাত এমনই ভীষণ হইয়াছিল যে, মাহুত হাতীর উপর হইতে পড়িয়া গেল ও তখনই তাহার মৃত্যু হইল।

হাতীও ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল। মরিবার একটু আগে মাহুত হাতীকে হুকুম করিয়াছিল—"স্থির হইয়া দাঁড়াও।"

হাতী মাহুতকে খুবই ভালবাসিত এবং সে যাহা বলিত প্রাণপণ করিয়াও হাতী তাহা

---

* মহারাষ্ট্র দেশের একটী কাহিনী হইতে।

পালন করিত। সেই জন্য মাহুতের শেষ কথা সে রাখিল। যেখানে মাহুত তাহাকে দাঁড়াইতে বলিয়াছিল, সেইখানেই সে অচল—অটল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যুদ্ধ ক্রমশই ভীষণ হইতে লাগিল। হাতীর উপর মারহাট্টাদের জাতীয় পতাকা রহিয়াছে। হাতীটাকে মারিয়া সেই পতাকা লইতে পারিলেই যুদ্ধে জয় হয়। এই ভাবিয়া শত্রু-সৈন্য হাতীটাকে লক্ষ্য করিয়া নানা রকম অস্ত্র ছুড়িতে লাগিল। কত তীর হাতীর গায়ের কাছ দিয়া চলিয়া গেল; দুই দশটা বা তাহার গায়ে বিঁধিল; কত বর্শা-বল্লম, কত মুষল-মুদ্গর হাতীটার দিকে আসিতে লাগিল, তাহার সংখ্যা হয় না; কোনও কোনওটা বা হাতীর গায়ে আসিয়া পড়িল। কিন্তু হাতী অচল—অটল; সে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেখান হইতে এক পাও সে নড়িল না। মারহাট্টাদের যুদ্ধের নিশান গর্ব্বভরে বায়ুতে উড়িতে লাগিল।

বার বার চেষ্টা করিয়াও যখন শত্রুরা হাতীর কাছে আসিয়া পতাকা কাড়িতে পারিল না, তখন ক্রমশঃ তাহারা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। তার পর অবসাদ ও ক্লান্তি আসিয়া তাহাদের শরীরে আশ্রয় লইল। সন্ধ্যার সময়ে শত্রুরা পাছু হটিল। ইহা দেখিয়া মারহাট্টাদের সাহস বাড়িল, তাহারা শত্রুদিগকে তাড়া করিল। শত্রুর পলায়নে মারহাট্টারাই যুদ্ধে জয়ী হইল।

জয়লাভের পর যখন মারহাট্টারা গৃহে যাইতে উদ্যত হইল, তখন পতাকা-বাহক হাতীটাকেও তাহারা স্থান ত্যাগ করিবার ইঙ্গিত করিল। কিন্তু সে এক পাও নড়িল না। অনেকে অনেক রকম চেষ্টা করিল, কিন্তু তিন দিন তিন রাত্রি যে যুদ্ধক্ষেত্রের সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

শেষে একজন মারহাট্টা বলিল—"মাহুতের একটী শিশু পুত্র আছে, চল আমরা তাহাকে লইয়া আসি। হাতী নিশ্চয়ই তাহাকে চিনিবে এবং তাহার কথা শুনিবে।"

সকলেই বলিল—"হাঁ এই কথাই ঠিক।"

মাহুত যে গ্রামে বাস করিত, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাহা পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে। তখনই দ্রুত-গামী অশ্বে আরোহণ করিয়া লোক ছুটিল এবং যত দূর সম্ভব শীঘ্র মাহুতের পুত্র রণ-ক্ষেত্রে আনীত হইল।

মাহুতের শিশু পুত্রকে দেখিয়াই হাতী তাহাকে চিনিতে পারিল। সে তখনই মৃদু রব করিয়া ও শুঁড় তুলিয়া তাহাকে অভিবাদন করিল। তাহার পর শুঁড় দিয়া ধীরে ধীরে শিশুকে তাহার মৃত পিতার শূন্য আসনে বসাইল।

সকলের ইঙ্গিতে তখন মাহুতের পুত্র হাতীকে হুকুম করিল—'বাড়ী চল।'

হাতী মৃত মাহুতের পুত্রের আদেশ পালন করিল। বাড়ীতে ফিরিবার পথে সৈনিকেরা যেখানে বিশ্রামের জন্য তাঁবু খাটাইল, সেখানে হাতীকেও বিশ্রাম করিতে হইল। তখন তাহার সেবা-শুশ্রূষার ঘটা দেখে কে? সৈনিকেরা যত্নের সহিত হাতীটার গা পরিষ্কার করিয়া দিল; ক্ষত স্থানে ঔষধ লেপন করিল। তাহার পর তাহার আপাদ-মস্তক ফুলের মালায় ভূষিত করিয়া ফেলিল।

মারহাট্টারা হাতীটার এত সম্মান করিল কেন জান? জাতীয় পতাকা সকলের চেয়ে

সম্মানের জিনিস। প্রাণ দিয়াও এ পতাকা রক্ষা করিতে হয়। হাতীটী নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও মারহাট্টাদের সেই জাতীয় পতাকা রক্ষা করিয়াছিল। আজ মারহাট্টারা যে জয়-লাভ করিয়াছে, এই হাতীটীই তাহার মূল। সে যে কাজ করিয়াছে, বড় বড় বীরও অনেক সময়ে তেমন কাজ করিতে পারে না।

বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন সন্ন্যাসীর বেশে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিতে-ছিলেন, সে সময়ে রাজপুতানার এক রেলওয়ে ষ্টেশনে এত অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া-ছিল। সে ঘটনাটি এই ঃ—

গ্রীষ্মকাল। চারিদিকে বালুকারাশি উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তৃষ্ণায় মানুষের কণ্ঠ-তালু শুষ্ক হইবার উপক্রম হইতেছে। এমন সময়ে রাজপুতানার এক জংশন-ষ্টেশনে স্বামী বিবেকানন্দ ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলেন। গেরুয়া কাপড় এবং নিকটবর্ত্তী একটী ষ্টেশনে যাইবার জন্য তৃতীয় শ্রেণীর একখানি টিকিট ব্যতীত তাঁহার নিকটে আর কিছুই ছিল না। এই টিকিটখানিও অপরে কিনিয়া দিয়াছিলেন। এমন কি, সকল সন্ন্যাসীর হাতে যে কমণ্ডলু থাকে, তাহাও পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে ছিল না। স্বামীজি জমির উপরে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বিশ্রামাগারের একটী থামে ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন। ষ্টেশনে আরও কতকগুলি যাত্রীর সমাবেশ হইয়াছিল ; তাহাদের মধ্যে উত্তর-ভারতের এক বেণিয়া ছিল। এই ব্যক্তি প্রৌঢ়—সে স্বামীজির সম্মুখেই বসিয়াছিল।

এই বেণিয়া ট্রেণে স্বামীজির সহযাত্রী ছিল। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যা হইতে সে স্বামীজির সহিত একই ট্রেণের একই কামরায় আসিতেছিল এবং আজ দুপুর বেলা একই ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইয়াছে। কাল সন্ধ্যা হইতে যে স্বামীজির আহার দূরে থাকুক, জলস্পর্শ পর্য্যন্ত হয় নাই, এই ব্যক্তি তাহা জানিত। তাহার উপর সন্ন্যাসীদের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা-ভক্তি মোটেই ছিল না ; কারণ, সন্ন্যাস-গ্রহণ যে অন্যায় ইহাই তাহার ধারণা ছিল। এই জন্য সেই ব্যক্তি স্বামীজিকে উদ্দেশ করিয়া অনেক কটু কথা শুনাইতে লাগিল। তার পর বলিল,—

সন্ন্যাসীদের অনাহারে কষ্ট পাওয়াই ভাল। এই দেখ আমি কেমন ভাল ভাল খাবার খাইতেছি। এই দেখ, আমার জন্য কেমন ঠাণ্ডা জল আসিয়াছে। এ সমস্তই আমাকে পয়সা দিয়া কিনিতে হইয়াছে। তোমরা পয়সা উপায় করিবে না; কাজেই এখন শুকাইয়া মর।

স্বামীজি কেবল স্থিরভাবে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার মুখ-মণ্ডলে একটুও উত্তেজনার ভাব প্রকাশিত হইল না।

একটু পরেই সেখানে একটী লোক উপস্থিত হইল। তাহার হাতে একটী পুঁটুলী, একটী ঘটি এবং একখানি বসিবার আসন। লোকটী আসিয়াই তাড়াতাড়ি একটী পরিষ্কার জায়গায় সেই আসনটী বিছাইয়া ফেলিল এবং পুঁটুলী খুলিয়া খাদ্যসামগ্রী বাহির করিল। তার পর স্বামীজিকে ডাকিয়া বলিল—আসুন, স্বামীজি একটু জলযোগ করিবেন, আসুন। আমি আপনার জন্য খাবার আনিয়াছি।

স্বামীজি তাহার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন,—আমি ইহার পূর্ব্বে তোমায় কখনও দেখি নাই। তুমি নিশ্চয়ই ভুল করিয়াছ। তুমি আর কাহারও জন্য খাবার আনিয়াছ; আমার জন্য নহে। তাহাকে খুঁজিয়া লও।

তখন লোকটী চীৎকার করিয়া বলিল,—না—না—আমি যাঁহাকে দেখিয়াছি, তিনিই আপনি।

স্বামীজি বলিলেন, তুমি কি বলিতেছ তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি আমাকে কোথায় দেখিয়াছ?

যখন এই সকল কথাবার্ত্তা হইতেছিল, সেই সময়ে সেই বেণিয়া যাত্রী অবাক হইয়া স্বামীজি ও আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়াছিল।

আগন্তুক বলিল—আমি ময়রার কাজ করি। রোজ দুপুর বেলা আমি যেমন ঘুমাই, আজও আহারাদির পর তেমনই ঘুমাইতেছিলাম। এমন সময়ে স্বপ্নে দেখিলাম—শ্রীরামচন্দ্র আপনাকে দেখাইয়া দিয়া আমাকে বলিতেছেন,—'আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। তুই ওঠ্। আমার এই ভক্ত কাল থেকে অ'াহারে রয়েছে। এখনই কিছু খাবার তৈয়ারী ক'রে নিয়ে তুই তা'কে খাইয়ে আয়।'

আমি ঘুম হইতে উঠিলাম। কিন্তু ইহা স্বপ্ন বলিয়া আবার শুইয়া পড়িলাম ও শীঘ্রই নিদ্রিত হইলাম। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের অপার করুণা! তিনি আবার আমায় স্বপ্নে দেখা দিলেন। এবার যেন তিনি আমায় ঠেলিয়া তুলিয়া

রিলেন। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। তাই তাঁহার আদেশে কিছু খাবার তৈয়ারী করিয়া আপনাকে খাওয়াইতে আসিয়াছি! আমি দূর হইতেই আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি। যাঁহাকে দুইবার দেখিলাম তাহাকে চিনিতে পারিব না কেন?

ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় স্বামীজির হৃদয় ভরিয়া গেল। নয়নে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল। তিনি তখনই জলযোগ করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার যে বেণিয়া সহযাত্রী এতক্ষণ বিদ্রূপের ফোয়ারা ছুটাইতেছিল, সে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ভগবানে যিনি নির্ভর করেন, তাঁহার সকল ভার ভগবান স্বয়ং গ্রহণ করেন; তাঁহার সকল অভাব ভগবানই পূর্ণ করিয়া দেন।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

আমাদের সাহিত্যের অঙ্গ হইতে উৎকট ফিরিঙ্গী-গন্ধ মাঝে মাঝে বাহির হইয়া থাকে; কাজেই নাকে অনেক সময়ে কাপড় দিতে হয়। এরূপ গন্ধ বাহির হইলে ভাষা ও সাহিত্যের জাতিরক্ষা দুষ্কর হইয়া পড়িবে। এ কথাটা সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, জাতীয়তার প্রধান অবলম্বনই হইল ভাষা। কোনও জাতির ভাষা বিলুপ্ত হইলে সে জাতিও সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইবে।

* * *

সেই জন্য ভাষার জাতি রক্ষা করিবার চেষ্টা প্রত্যক্ষ সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিরই করা উচিত। ভাষায় ফিরিঙ্গীয়ানা ঢুকে কেন? 'সুবর্ণ সুযোগ' 'শুভ সুযোগে'র স্থান অধিকার করে কেন? বাঙ্গালা ভাষার একটা বাঁধি ঠাট আছে, সে ঠাট ভাঙ্গিতে চেষ্টা কর কেন? বিদেশের ভাব-ভাষা গ্রহণ কর, কিন্তু তাহাকে বাঙ্গালা ঠাটের উপযোগী করিয়া লও। যাঁহারা মনে করেন,

বাঙ্গালা একটা ভাষা, এ ভাষার সাহিত্যও সর্ব্বজনসম্মানিত, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই আমরা একথা বলিতেছি। নহিলে বাঙ্গালা ভাষাকে যাঁহারা বেওয়ারিশ ময়দা ভাবেন, তাঁহাদিগকে আমাদের বলিবার কিছুই নাই।

* * *

সাধুভাষা ও চলিত ভাষার বিবাদ মিটাইবার কথা এবারকার সাহিত্য-সম্মিলনেও উঠিয়াছিল। এ সম্বন্ধে সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতি আমরা সকল সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিরই মনোযোগ আকৃষ্ট করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন,—

"সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিগত অধিবেশনে বলিয়াছিলেন যে,—'বঙ্গের যে অশিক্ষিত জনরাশি, তাহাদের মধ্যে যাহাতে শিক্ষার আলোকচ্ছটা নিপতিত হয়, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত সুধীমণ্ডলীর পার্শ্বে যাহাতে বঙ্গের নিরক্ষর জনসঙ্ঘ আসিয়া অকুতোভয়ে ও অসঙ্কোচে দাঁড়াইতে পারে, তাহা যতদিন না করিতে পারিব ততদিন আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।" এরূপ করিতে হইলে প্রথমেই আমাদের সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষায় বিবাদ মিটাইতে হইবে। আমরা "কোকিলকলালাপরচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ-নির্ঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে"—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এরূপ বাঙ্গালা চাই না "আমি ল্যাণ্ডো গাড়ীতে ড্রাইভ করিতে করিতে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া বেনারসের জন্য বুক করিলাম, ফাষ্ট ক্লাসে লোয়ার বার্থ ভেকাণ্ট ছিল না, অপার বার্থে বেডিংটা স্প্রেড্ করিয়া একটু সর্ট ন্যাপ দিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় "হুইসিল দিয়া ট্রেণ ষ্টার্ট করিল"—এইরূপ ইঙ্গ-বঙ্গীয় ভাষাও আমরা চাই না এবং "মোরা হলাম পত্তিবাসী, সারাগুণ্ডি যাওয়া আসা কত্তি লেগেচি, নুন না থাকৃল নুন চেয়ে আনচি, তেল্পলাডা তেলপলাডাই আন্লাম, ছেলেডা কান্তি নাগ্লো গুড় চেয়ে দেলাম;—বসিগার বাড়ী সাত পুরুষ খেয়ে মোরা আর ওনাদের খবর থাকিনে"—সাহিত্যের জন্য এইরূপ গ্রাম্য ভাষাও চাই না। আমরা চাই এমন ভাষা, যাহা সাধু হইবে অথচ সরল হইবে, চলিত হইবে অথচ ইতর হইবে না। এই মধ্য পথ অবলম্বন করিলে কিরূপ হয়? এ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বর্দ্ধমানে আমাদিগকে যাহা উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ রাখা ভাল। "দেশের লোকে যে সকল শব্দ বুঝে, অথচ সত্য সত্য ইতুরে কথা নয়, যে সকল কথা ভদ্রলোকের কাছে বলিতে আমরা লজ্জিত হই না, সেই সকল কথায় মনের ভাব ব্যক্ত করিলে

লোকে সহজে বুঝিতে পারিবে, ভাষাও ভাল হইবে।" আর একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে এই ধরণের কথাই বলিয়াছিলেন। "সাহিত্যের ভাষা যেন কথোপকথনের ভাষা হইতে এমন দূরে সরিয়া না পড়ে যে, সাহিত্যের সঙ্গে কথোপকথনের সম্পর্ক লোপ পায়। সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে কথোপকথনের ভাষার যত নৈকট্য থাকে, যত ঘনিষ্ঠতা থাকে, ততই ভাল; দুইএর অন্তর যত অধিক হয় ততই মন্দ। বিচ্ছেদ হইলে কেহ কাহারও কোন উপকার করিতে পারে না; একই ভাষা ক্রমে দুইটী পৃথক্ ভাষা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। তাহাতে কেবল যে ভাষার অনিষ্ট তাহা নহে, সমাজেরও বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবার আশঙ্কা হয়।" ইন্দ্রনাথবাবুর শেষ কথাটী মনে রাখিবার কথা। শিক্ষা ও সাহিত্যকে যদি লোকায়ত করিতে হয়, তবে লিখিত ভাষা ও চলিত ভাষার মধ্যে একটী পদ্মার প্রবাহ সৃষ্টি করিলে চলিবে না। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বাকল্ সাহেব অনেক দিন হইল, আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথার উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে বলিয়াছিলেন,—"মহামতি বাকল্ ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণ দেশের শিক্ষাবিস্তার তুলনা করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে, জার্ম্মাণ দেশে সর্ব্ববিদ্যায় অসামান্য প্রতিভাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথচ রাজনৈতিক উন্নতি বিষয়ে ইংলণ্ড অপেক্ষা পশ্চাৎপদ। ইহার কারণ এই যে, জার্ম্মাণদেশীয় পণ্ডিতগণ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া এমন এক 'পণ্ডিতী' ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহা কেবল সঙ্কীর্ণ 'গণ্ডীর' মধ্যে সীমাবদ্ধ; সে সমস্ত উচ্চভাব সমাজের নিম্নতমস্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে না। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায় ও জনসাধারণের মধ্যে একরূপ একটি অনতিক্রম্য প্রাচীর স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডে বহুকাল হইতে বিজ্ঞান-বিষয়ক সাধারণের বোধগম্য অনেক সরল পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে তাহার ভাব ও স্থূল মর্ম্ম প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। এই প্রকার শ্রেণীগত পার্থক্য আমাদের অত্যধিক প্রবল।"

সঙ্গে সঙ্গে টোলের প্রচলিত সংস্কৃতশিক্ষার সঙ্গে বাঙ্গালা শিক্ষার মিশ্রণ ও মিলন করিতে হইবে। সংস্কৃত-শিক্ষিত পণ্ডিতমণ্ডলী যে নবীন জ্ঞানে বঞ্চিত থাকিবেন, এবং গরীয়সী বঙ্গবাণীকে তাঁহাদের বিমাতা ভাবিয়া বিমুখ ভাব অবলম্বন করিবেন, ইহা নিতান্ত ক্ষোভের কথা। আমরা জানি, তাঁহাদের

মধ্যে কেহ সেদিনও বঙ্গভাষা যে ভাষাপদের বাচ্য নহে, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য নব্য ন্যায়ের পাঁয়তারা করিয়াছেন। কিন্তু এমন পণ্ডিতও বিরল নহেন, যিনি সংস্কৃত-ভারতীর সহিত মাতৃভাষারও পূজা করেন। আমরা চাই যে, টোলে সংস্কৃত বিদ্যার্থীকে বাঙ্গালার সাহায্যে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি কিছু কিছু পড়ান হয়; এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের গদ্য-পদ্যের অমৃতধারায় অভিষিক্ত হন। সংস্কৃতই তাঁহাদের তপস্যার নিধি থাকুক, কিন্তু তাঁহারা যেন দেশমাতৃকার সেবা হইতে একেবারে বঞ্চিত না হন।”

পল্লী-প্রবন্ধ।

আমি আজ পাড়াগাঁয়ের অতি পুরাতন তৃণ। জীবনের জোয়ার ভাঁটায় ভাসিয়া ভাসিয়া, সহর বাজারের ঘূর্ণাবর্ত্তে ঘুরিয়া বেড়াই। বহুকাল পরে এবার ৺শারদীয়া পূজার সুপ্রসন্ন শুভ্র শিশিরসিক্ত হইয়া তৃণ তাহার তরুণ জীবনের স্মৃতি-ক্ষেত্র আজ পাড়াগাঁয়ে গিয়া আবার পড়িয়াছিল। কিন্তু তথায় কি দেখিলাম? আমি পুরাণ লোক; পুরাণ কথাতেই বলি, পাড়াগাঁয়ে কি দেখিলাম,—

“দেখে এলেম শ্যাম,
তোমার বৃন্দাবন ধাম
কেবল নাম আছে।”

কিন্তু নাম আছেই বা কেমন করিয়া বলি! নামও নাই, গন্ধও নাই, রূপ রস—সে শব্দ, স্পর্শ কিছুই নাই। পাড়াগাঁ দেখিলাম—শ্মশানময় সহর।

সর্ব্বগ্রাসিনী সভ্যতার সূচিভেদ্য আলোক পল্লীগ্রামের হৃদ্‌পিণ্ড ভেদ করিয়া তাহার প্রাণবায়ুতে প্রবেশ করিয়াছে। সরকার বাহাদুরের বিভাগীয় শাসন-বিবরণীতে সভ্যতালোক যে পরিমাণে সূচিত, তাহা অপেক্ষা অনেক—অনেক অধিক পরিমাণে সে আলোক পল্লীবাসের পরদায় পরদায়—রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট

হইয়া পাকা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। তোমরা কেন বল, সরকারী রিপোর্ট গোলাপী রংয়ে রঞ্জিত? রিপোর্ট রঞ্জিত নয়; রিপোর্ট ঠিক। তাহার উপর আরও তিন পোঁচ রং চড়াইলেও অনায়াসে চলিতে পারে। উদরে অন্ন না থাকুক, প্রাণে সভ্যতার সখ ষোল কলায় বিকশিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে। বাস্তু-ভিটার উপর দুর্ভিক্ষদেব দশশালা পোক্ত বন্দোবস্তের মত অনড়, অচল; তাঁর পার্শ্বে শ্রীমতী একাদশী দেবী দিব্য দন্তরুচির বিকাশ করিতেছেন; কিন্তু দেউলে 'হোয়াইটওয়াসের' একান্ত অভাব নাই।

লাট সাহেব স্যর এণ্টনী বাহাদুর সম্বৎসরের শাসন-সংহিতায় উত্তর বিহারের প্রজাসাধারণের অবস্থা অমাবস্যার অন্ধকার বর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবেই তাহাদের অবস্থা তদনুরূপ, বরং তাহা অপেক্ষাও অধিক,—অনাহারে জীবন্ত সচলন্ত মূর্ত্তির নিকট অমাবস্যার অন্ধকার মূর্ত্তি আর অধিক কি? কিন্তু উত্তর বিহারের ত্রিহুতিয়া রেয়তের প্রাণে নাকি অদ্যাপি সভ্যতার সখ সজাগ হয় নাই, তাহাতেই উত্তর বিহারের অমাবস্যাটা সরকারী ফটোগ্রাফে প্রতিবিম্বিত হইবার প্রচুর অবসর পাইয়াছে। নহিলে উত্তর বিহারে একাদি-ক্রমে অতি দীর্ঘকাল আমি উপস্থিত ছিলাম। সবিনয়ে সাহস করিয়া বলি-তেছি, উত্তর বিহারের দেড় আনা ও এক আনা আজুবার কুলি-মজুর অপেক্ষা প্রেসিডেন্সী পল্লীর অধিকাংশ ভদ্র গৃহস্থের আর্থিক অবস্থা একবিন্দুও উচ্চ নহে; তুল্য ও তুলিত উভয়েরই উপায়হীনতা ঠিক একই রূপ। তবে প্রেসি-ডেন্সি বিভাগের পল্লী পল্লীতে না কি ভব্যতা আর ভব্যতার ভাবনা, সভ্যতা আর সভ্যতার সখ সর্ব্বাপেক্ষা সতেজ, সুতরাং নেহাত রান্নাঘরে না ঢুকিলে জানা যায় না যে, ছুছুন্দরী কীর্ত্তন কোঁচার পত্তনে আবৃত আছে। গৃহ-ভাণ্ডে অর্দ্ধ সের পরিমিত তণ্ডুলের সংস্থান নাই, কিন্তু বাক্স খুলিলে অন্ততঃ আট জোড়া গোড়ালী ও অঙ্গুলি ছেঁড়া মোজা পাইতে পারিবে।

উত্তর বিহারের চিরস্থায়ী তীক্ষ্ণ দারিদ্র্যমোচন এ মুহূর্ত্তের এক কঠিন রাজনীতিক সমস্যা। এ সমস্যা পূরণার্থে কেডাষ্ট্রাল সার্ভের কল্পনা। কিন্তু স্কুল-পাঠশালা ভারাক্রান্ত মধ্য বঙ্গের অন্ন-নাস্তি সমস্যা সমাধানার্থ বঙ্গেশ্বর কিরূপ বিবেচনা করেন? এতদর্থে অন্তস্থল-ভেদী আধুনিক সভ্যতার একটা সার্ব্বভৌমিক সরকারী সার্ভে করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

সৌখিনতার শত নামাবলী—সভ্যতার ছাপ অঙ্গে পৃষ্ঠে ললাটে;—সেকালের সেই ছোট ছোট সবুজ শস্যশ্যামল সরল গ্রামগুলি এখন প্রায় এক একটী

সহর হইয়া দাঁড়াইয়াছে! ডুমুরটী, লাউডগাটী, ডাঁটাটীও এখন তথায় দুর্ম্মূল্য! হায়! সে কালের সেই "থোড় বড়ী খাড়া" আর "খাড়া বড়ী থোড়"টুকুও উড়িয়া যাইতেছে। ঐ লৌহ এঞ্জিনে আমার দুগ্ধস্রোতরূপিণী মাতৃ-নদীবক্ষে কি ঐ বিশাল বন্ধন! উপর দিয়া আগ্নেয় অশ্ব চলিয়াছে; নিম্নে কপোত-কৃষ্ণ চির নীরব নির্ম্মল নীর ভেদিয়া সনাতন স্বচ্ছ সলিল মলিন করিয়া আগ্নেয় এঞ্জিন চলিয়াছে। "এষ্টাকিন" পায় উমেদার ঐ আগ্নেয় নৌকায় উঠিল। দুঃখিনীর অঞ্চলের নিধি। তিন দিবস উপবাসিনী দুঃখিনী জননীকে কাঁদাইয়া তুমি অন্নের চেষ্টায় কোথাও যাও! তোমার ঘরে যে প্রচুর অন্ন ছিল! সভ্যতা! —তোমার শিক্ষা আজ তোমায় কোথায় লইয়া চলিল!

আমার স্বচ্ছন্দ-সলিলার সুমিষ্ট রোহিতের মস্তক আজ সুদূরে ধনী বিলাসীর বিলাসব্যঞ্জনে,—তাঁহার ডিনার টেবল 'তর্' করিতেছে। আমার বালকের দুগ্ধটুকু, বিধবার দ্বাদশীর ডাবটী, জানি না কোথায় কোন দূর স্থানে যাইয়া কাহার রসনা তৃপ্ত করিতেছে! হে সভ্যতা! তুমি আমার সনাতন কালের সুখ-সোয়াস্তি, আমার মুখের মুষ্টি কাড়িয়া লইয়াছে, কিন্তু আমি তোমার কৃপায় কোট আঁটিয়াছি।

কি বলিব, কোন্ দিকে কি দেখিলাম! সেকালের সেই সমুন্নতসুন্দর-কান্তি সদা সমাহ্বনশীল সহাস্যবদন চণ্ডীমণ্ডপ, আটচালা আর একখানিও দেখিলাম না। কোথায়ও তাহা একেবারে সমভূম, কোথায়ও বা তাহার পাকা দেউলের উপর ইটের বা টিনের ছাদ উঠিয়াছে। কোথায়ও বা বাবুর বিলাস-বৈঠকখানা তৎস্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। কোন কোনও স্থলে আটচালা আধ-বাঙ্গলায় পরিণত হইয়া দেবী প্রতিমার পরিবর্ত্তে প্রাইমারী পাঠশালা বক্ষে ধারণ করিয়াছে! তথায় ইদু সেখের পুত্র, ইদুর মনিব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্রের সহিত একাসনে বসিয়া 'একজামিনে'র পড়া পড়িতেছে।

কৃষক মাত্রের মুখে খাজনার আইন ও তাহার অনন্ত উৎকট সমস্যা। সে কালের সেই সরল চাষী উকিল মোক্তার হইয়া উঠিয়াছে; ছাপার রসিদ নহিলে দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তরের পোত দিতে চাহে না, আগে বিনা রসিদেই কিস্ত দিত। গ্রামে গ্রামে পুলিস-পঞ্চায়ত আর আত্মশাসনের হুড়হুড়ী হুড়হুড়ী; মেয়ে-মরদের মুখে লোকাল বোর্ড। বোর্ডের মেম্বর মহাশয় "ভোট" ভিক্ষার পর মুহূর্ত্ত হইতেই "মথুরায় নবভূপতি।" সুতরাং আত্মগ্রাম ও আত্মগৃহ ব্যতীত তাঁহার আর কিছুই "মনে নাই লো দূতী"। আত্মশাসনের এই উচ্চ আর্ত্তনাদ সর্ব্বত্র

সমভাবে বিদ্যমান। পল্লীবাসীদের নিজ নিজ পল্লীর পথ-ঘাটের ভরসা ভোটের সঙ্গে সঙ্গেই ফরসা হইয়া গিয়াছে। তবে ভোটের অধিকার আছে বটে। সভ্যতার আর চাই কি? পূজার বন্ধে প্রবাসী ইয়ং বেঙ্গলে পল্লী উজ্জ্বল। পায়ে স্লিপার, গায়ে সার্ট, ওষ্ঠে শিশ্ এবং শিগারেট! ধরিত্রী এ সভ্যতা-ভার আর কতকাল ধারণ করিবে!

স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

বিবেকানন্দের উপদেশ।

আমরাই ঈশ্বর।

আমরা আর্‌সিতে আমাদের মুখ দেখ্‌তে পাই—সমুদয় জ্ঞানও সেই রকম যা বাইরে প্রতিবিম্বিত হয়, তারই জ্ঞান। কেউ কখন তার নিজের আত্মা বা ঈশ্বরকে জান্‌তে পার্‌বে না, কিন্তু আমরা স্বয়ং সেই আত্মা, আমরাই ঈশ্বর।

আর্ত্তসেবা—জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য।

কতকগুলি ব্যক্তি যে দুঃখ ভুগিতেছে, সে তোমার আমার মুক্তির জন্য যাহাতে আমরা রোগী, পাগল, কুষ্ঠী, পাপী প্রভৃতি রূপধারী প্রভুর পূজা করিতে পারি। তোমার আমার জীবনের ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য যে, আমরা প্রভুকে এই সকল বিভিন্ন রূপে সেবা করিতে পারি।

দরিদ্রনারায়ণ পূজা।

আমি কতকগুলি দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখিতেছি,—আমার নিজ মুক্তির জন্য আমি তাহাদের নিকট যাইয়া তাহাদের পূজা করিব; ঈশ্বর সেখানে রহিয়াছেন।

সেবার অধিকার।

প্রত্যেক নরনারীকে, সকলকেই ঈশ্বরদৃষ্টিতে দেখিতে থাকে। তুমি কাহাকেও সাহায্য করিতে পার না, তুমি কেবল সেবা করিতে পার। প্রভুর সন্তানদিগকে, যদি সৌভাগ্য হয়, তবে স্বয়ং প্রভুকে সেবা কর। যদি প্রভুর অনুগ্রহে তাঁহার কোন সন্তানের সেবা করিতে পার, তবে তুমি ধন্য হইবে।

আত্মা এক, উপাধি ভিন্ন।

এক আত্মাই বিভিন্ন উপাধির মধ্য দিয়াই প্রকাশ পাইতেছেন। সব প্রাণীই ব্রহ্মস্বরূপ, প্রত্যেক আত্মাই যেন মেঘ ঢাকা সূর্য্যের মত—এক জনের সঙ্গে যেন আর এক জনের তফাৎ এই, কোথাও সূর্য্যের উপর মেঘের কেবল আবরণ, কোথাও এই আবরণ একটু তরল।

প্রেমের জয়।

ভালবাসা কখনও বিফল হয় না। আজ হউক, কালি হউক, শত যুগ পরে হোক, প্রেমের জয় হইবেই। তোমরা কি মনুষ্যজাতিকে ভালবাস? ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্ব্বল সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নহে? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন? প্রেমের সর্ব্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাসসম্পন্ন হও।

সহানুভূতি চাই।

আমি তোমাদের নিকট এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতের জন্য এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। যাও, এই মুহূর্ত্তে সেই পার্থ-সারথির মন্দিরে যিনি গোকুলে দীন দরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, যিনি তাঁহার বুদ্ধ অবতারে রাজপুরুষগণের আক্রমণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাও, তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও এবং তাঁহার নিকট এক মহাবলি প্রদান কর; বলি—জীবন-বলি তাহাদের জন্য, যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন. সেই দীন দরিদ্র উৎপীড়িতদের জন্য।

ক্রোধ কি?

'ন্যায্য ক্রোধ' ব'লে কোন জিনিস নাই; কারণ, সকল বস্তুতে সমত্ববুদ্ধির অভাব থেকেই ক্রোধ এসে থাকে।

দেহজ্ঞানের বাহিরে।

সকল ধর্ম্মেই জ্ঞানাতীত বা তুরীয় অবস্থা এক। দেহজ্ঞান অতিক্রম করলে হিন্দু, খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান, বৌদ্ধ, এমন কি, যারা কোন প্রকার ধর্ম্মমত স্বীকার করে না, সকলেরই ঠিক একই প্রকার অনুভূতি হয়ে থাকে।

ARGHYA, REG. NO. C 691.

৯ম বর্ষ] [২য় সংখ্যা

অর্ঘ্য

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫] [June, 1918.

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন শ্রীসুরেশচন্দ্র পালিত, বি-এল্

কার্য্যালয়—৫৩ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অর্ঘ্য

১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫।

স্বপ্নতত্ত্ব।

অদৃষ্টপ্রাবল্যে যে স্বপ্ন হয়, সময়বিশেষে তাহা শীঘ্র ও গৌণে ফল প্রসব করিয়া থাকে।

মৎস্যপুরাণে ১৪২ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

স্বপ্না স্তু প্রথমে যামে সম্বৎসর বিপাকিনঃ। ১৭।
ষড়্‌ভি র্মাসৈ র্দ্বিতীয়েতু ত্রিভি র্মাসৈ স্তৃতীয়কে।
চতুর্থে মাস মাত্রেণ পশ্যতো নাত্র সংশয়ঃ। ১৮।
অরুণোদয় বেলায়াং দশাহেন ফলং লভেৎ॥
প্রাতর্দৃষ্টা ভবেৎ সদ্যো যদাসৌ প্রতিবুধ্যতে।

রাত্রির প্রথম প্রহরে স্বপ্ন দেখিলে এক বৎসরে ফল প্রদান করে। দ্বিতীয় প্রহরে ছয় মাসে, তৃতীয় প্রহরে তিন মাসে এবং চতুর্থ প্রহরে এক মাসে স্বপ্নদর্শনকারী ফল প্রাপ্ত হন। যদি স্বপ্নদর্শনের পরই জাগরিত হয়, তবে প্রাতঃকালের স্বপ্নে তদ্দিনেই ফল হইয়া থাকে।

ফল কথা, দিবসীয় বিষয় চিন্তনজনিত চিত্তচাঞ্চল্যহেতু, অদৃষ্টবশাধীন শুভাশুভসংসূচক স্বপ্নও পূর্ব্ব রাত্রিতে তীব্র সম্বেগে আবির্ভূত হইতে পারে না, তজ্জন্যই তাহার ফলও শীঘ্র হইতে পারে না, তৎপর ক্রমশঃ চিত্তের চঞ্চলতা দূর হইতে থাকে এবং তৎকালদৃষ্ট স্বপ্নও অপেক্ষাকৃত শীঘ্র ফল প্রসব করে। প্রভাতকালে চিত্ত একদা অনাবিল থাকে, তাহাতেই তৎকালে স্বপ্নের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায়, এবং সেই স্বপ্ন অতি শীঘ্র ফল জন্মাইয়া থাকে।

স্বপ্ন সম্বন্ধে শাস্ত্রে আরও লিখিত আছে,—

একস্যাং যদিবা রাত্রৌ শুভংবা যদিবাশুভম্।
পশ্চাদ্দৃষ্ট স্তু যস্তত্র তস্য পাকং বিনির্দ্দিশেৎ॥
তস্মাচ্ছোভনকে স্বপ্নে পশ্চাৎ স্বপ্নোন শস্যতে॥ ২০॥

এক রাত্রিতে শুভাশুভ যতগুলি স্বপ্ন দেখা যায়, তাহার শেষটীরই ফল হয়, এই নিমিত্ত শুভ স্বপ্ন দেখিলে আর নিদ্রা যাইবে না। অশুভ স্বপ্ন দেখিলে আবার নিদ্রিত হইতে চেষ্টা করিবে।

আহা! ভগবানের রাজত্বে কি সুবিচার, কি সুন্দর বন্দোবস্ত! তুমি জন্ম-জন্মান্তরে যাহা অর্জ্জন করিয়াছ, সুকৃতি হউক দুষ্কৃতি হউক, এক সময়ে না এক সময়ে তাহার ফল ভোগ তোমাকে করিতেই হইবে; যদি তোমার শুভাশুভ কর্ম্ম বিরোধীয় কর্ম্মান্তর দ্বারা বিনষ্ট না হয়।

মৃদু, মধ্য বা তীব্র যে ভাবে যে কর্ম্ম সঞ্চিত হয়, সঞ্চয়ের নিয়ম অনুসারে কোনওটী শীঘ্র ফল দেয়, কোনওটী বা বহু পরে ফল দিয়া থাকে। কোন কর্ম্মের কখন যে কি ফল হইবে আর্ষজ্ঞান ব্যতীত ইহা বলিবার বা বুঝিবার উপায় নাই। তাহাতেই ভগবান্ পূর্ব্ব হইতেই নোটীশ দিয়া তোমাকে জানাইয়া দিলেন, অচিরে তোমার ঈদৃশ কর্ম্ম ভোগ করিতে হইবে। গ্রহাদির আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য, অঙ্গাদির স্পন্দন, নানারূপ অরিষ্ট এবং স্বপ্ন এই কয় প্রকারেই ভগবান্ নোটীশ দ্বারা জ্ঞাপন করেন, এখন তুমি সাবধান হও, দুঃখভোগের সূচনা হইলে তাহার প্রতীকারার্থ বিরোধীয় কর্ম্ম উপার্জ্জন কর, সেই পূর্ব্বসঞ্চিত ফলোন্মুখ দুষ্কর্ম্মকে নষ্ট কর। তবেই তোমার অমঙ্গল হইবে না।

লোকহিতকারী পরম কারুণিক মহর্ষিগণ, তাঁহাদের আজন্ম তপোলব্ধ আর্ষজ্ঞান দ্বারা আমাদের কি মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন! তাঁহারা শাস্ত্র মধ্যে জীবের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ-জ্ঞাপক ঈদৃশ উপায়সমূহ অতি স্থূলভাবে নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তুমি সামান্য চেষ্টা করিলেই ভাবিজীবনের অবস্থা বুঝিতে পারিবে। সম্ভব হইলে তাহার প্রতীকার করিবে। "অমুক গ্রহ তোমার জন্মরাশি অপেক্ষা অমুক স্থানে থাকিলে তোমার এই হইবে" "এইরূপ অরিষ্ট দেখিলে তোমার এই হইবে" "এইরূপ স্বপ্ন দেখিলে তোমার এইরূপ ফল ভুগিতে হইবে" এই সকল ব্যবস্থা বা ভগবানের নোটীশের এইরূপ ব্যাখ্যা ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণ করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান অবসরে স্বপ্নের শুভাশুভ সম্বন্ধে মহর্ষিগণের কতিপয় উপদেশ সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি—

অশুভসূচক স্বপ্ন

স্বপ্নে মস্তক-মুণ্ডন, উলঙ্গাবস্থা, তৈলাভ্যঙ্গ, মলিন বস্ত্র পরিধান, শরীরে পঙ্কলেপন, মস্তকে কাংস্যপাত্রভঙ্গ, নাভি ব্যতীত অন্য শরীরে তৃণ বৃক্ষের উৎ-

পত্তি, উচ্চদেশ হইতে পতন, শিবিকারোহণ, পক্কলৌহের সংগ্রহ, অশ্ব মারণ; বৃক্ষে লোহিত কুসুমের উৎপত্তি, বরাহ, ভল্লুক, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রে আরোহণ, পক্ক মাংস, তৈল ও কৃশর (খিচুড়ী) ভক্ষণ, নৃত্য, হাস্য, গীত, বিবাহদর্শন, তন্ত্রী-বাদ্যবিহীন বাদ্যবাদন, স্রোতে অবগাহন, গোময় জলে স্নান, কর্দ্দমাক্ত জলে স্নান, ভূগত সামান্য জলে স্নান, মাতৃগর্ভে প্রবেশ, চিতা আরোহণ, ইন্দ্রধ্বজের পতন, চন্দ্র ও সূর্য্যের পতন, দিব্য অন্তরীক্ষ ও ভৌম উৎপাত দর্শন, দেব, দ্বিজ রাজা ও গুরু এই সকলের ক্রোধ, * * * জ্ঞাতি মারণ, বমন ও বিরেচন দর্শন, দক্ষিণ দিকে গমন, রোগাক্রান্ততা, পুষ্পহানি, ফলহানি, গৃহপাত, গৃহসম্মার্জ্জন, পিশাচ, রাক্ষস, বানর, ভল্লুক ও মনুষ্যের সহিত ক্রীড়া, শত্রু হইতে বিপৎপাত, কষায় বস্ত্রধারণ, কষায় বস্ত্রধারিণী রমণীর সহিত ক্রীড়া, স্নেহদ্রব্য পান, স্নেহদ্রব্যে অবগাহন, রক্তমাল্য ও রক্ত অনু-লেপন, এতাদৃশ স্বপ্ন অশুভ সূচনা করিয়া থাকে।

বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডের ৬৯ সর্গ পাঠে জানা যায়, মহারাজ দশরথের মৃত্যুর পর মাতুলালয় হইতে ভরতকে আনিবার জন্য দূতগণ প্রেরিত হইয়া কেকয়পুরীর বহির্ভাগে রাত্রি যাপন করিতেছে,—এদিকে ভরত প্রভাত-কালে দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়া বিষণ্ণমনে অবস্থান করিতেছেন, বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া আত্মীয় বন্ধুগণের নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিতেছেন :—

শৃণুত্বং যন্নিমিত্তং মে দৈন্যমেতদুপাগতম্।
স্বপ্নে পিতর মদ্রাক্ষং মলিনং মুক্তমূর্দ্ধজম্।
পতন্তমদ্রি শিখরাৎ কলুষে গোময়েহ্রদে। ৮ ॥
প্লবমানস্য মে দৃষ্টঃ সতস্মিন্ গোময়েহ্রদে।
পিবন্নঞ্জলিনা তৈলং হসন্নিব মুহুর্মুহুঃ। ৯ ॥
ততস্তিলৌদনং ভুক্ত্বা পুনঃ পুনরধঃ শিরাঃ।
তৈলেনাভ্যক্ত সর্ব্বাঙ্গ স্তৈল মেবাবগাহত। ১০ ॥
স্বপ্নেহপি সাগরং শুষ্কং চন্দ্রঞ্চ পতিতং ভুবি।
উপরুদ্ধাঞ্চ জগতীং তমসেব সমাবৃতাম্। ১১ ॥
ঔপবাহ্যস্য নাগস্য বিষাণাং শকলী কৃতম্।
সহসা চাপি সং শান্তা জ্বলিতা জাত বেদসঃ। ১২ ॥
অবদীর্ণাঞ্চ পৃথিবীং শুষ্কাংশ্চ বিবিধান্ দ্রুমান্।
অহং পশ্যামি বিধ্বস্তান্ সধূমাংশ্চৈব পর্ব্বতান্। ১৩ ॥

পীঠে কার্ষ্ণায়সে চৈনং নিষণ্ণং কৃষ্ণ বাসসম্।
প্রহরন্তিস্ম রাজানং প্রমদাঃ কৃষ্ণ পিঙ্গলাঃ। ১৪ ॥
ত্বর মানশ্চ ধর্ম্মাত্মা রক্ত মাল্যানু লেপনঃ।
রথেন খর যুক্তেন প্রযাতো দক্ষিণামুখঃ। ১৫ ॥
প্রহসন্তীব রাজানং প্রমদা রক্তবাসিনী।
প্রকর্ষন্তী ময়াদৃষ্টা রাক্ষসী বিকৃতাননা। ১৬ ॥
এব মেতন্ময়া দৃষ্ট মিমাং রাত্রিং ভয়াবহাং।
অহং রামোঽথবা রাজা লক্ষ্মণোবা মরিষ্যতি। ১৭ ॥
নরো যানেন যঃ স্বপ্নে খর যুক্তেন যাতিহি।
অচিরাত্তস্য ধূম্রাগ্রং চিতায়াং সংপ্রদৃশ্যতে। ১৮ ॥

যে কারণ আমার এই বিষণ্নতা উপস্থিত তাহা শ্রবণ কর। আমি স্বপ্নে দেখিলাম, পিতা মলিন ও মুক্তকেশ হইয়া পর্ব্বতশিখর হইতে গোময় হ্রদে পতিত হইতেছেন এবং সেই গোময় হ্রদে সাঁতার দিতেছেন। তার পর পুনঃ পুনঃ হাসিতে হাসিতে অঞ্জলি দ্বারা তৈল পান করিতেছেন, তৎপর তিল-মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিয়া সর্ব্বাঙ্গ তৈলে অভ্যক্ত করিয়া অধোমস্তকে পুনঃ পুনঃ তৈল মধ্যে ডুব দিতেছেন।

তাহার পর স্বপ্নে দেখিলাম, সমুদ্র শুকাইয়া গিয়াছে, চন্দ্র ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছেন, সমস্ত জগৎ যেন অন্ধকারে আবৃত। পৃথিবী রাক্ষস কর্ত্তৃক উৎপীড়িত।

রাজবাহী হাতীর দন্ত খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ জলন্ত অনল প্রশান্ত, পৃথিবী বিদীর্ণ, বিবিধ বৃক্ষশ্রেণী শুষ্ক, আমি দেখিলাম, পর্ব্বতগুলি ধূমব্যাপ্ত ও ছিন্ন ভিন্ন।

তাহার পর দেখিলাম, পিতা কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া লৌহময় আসনে বসিয়া আছেন, কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণা রমণীগণ তাঁহাকে প্রহার করিতেছে। ইহার পর পিতা রক্তমাল্য ও রক্ত অনুলেপন ধারণ পূর্ব্বক গর্দ্দভযুক্ত রথে অতি ত্বরা সহকারে দক্ষিণ দিকে গমন করিতেছেন। তাহার পর দেখিলাম, রক্তবস্ত্র-পরিহিতা কোনও রমণী পিতাকে উপহাস করিতেছে, বিকৃতাননা এক রাক্ষসী তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

এই রাত্রি এইরূপ ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াছি, অতএব নিশ্চয়ই আমি, রাম, রাজা বা লক্ষ্মণ, ইহাদের মধ্যে একজনের অবশ্যই মৃত্যু ঘটিবে।

যে মনুষ্য স্বপ্নে গর্দ্দভযুক্ত রথে গমন করে, অচিরেই তাহার চিতার ধূম দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে অশুভসূচক যে সকল স্বপ্নের কথা বর্ণিত হইয়াছে, ভরতও সেইরূপ বহুতর দুঃস্বপ্ন অবলোকন করিয়াছিলেন,—তাহার ফলেই সুহৃদগণের সহিত এই সকল আলাপের সমকালেই অযোধ্যার দূতগণ নিদারুণ সংবাদ লইয়া আসিল। প্রভাতকালের স্বপ্ন যে তৎক্ষণাৎ ফলিত হয় একথাও কেমন অক্ষরে অক্ষরে সত্য তাহা রামায়ণ-সংবাদেও পাওয়া যায় এবং স্বপ্নতত্ত্ব যে ভারতে বহুকাল পূর্ব্বেও আলোচিত ও আপামর সাধারণের গোচরীভূত ছিল তাহাও প্রকাশ পাইতেছে।

দুঃস্বপ্নের প্রতিক্রিয়া বিষয়ে শাস্ত্র বলেন,—

এষাং সং কথনং ধন্যং ভূয়ঃ প্রস্বাপনং তথা।
কনক স্নানং তিলৈর্হোমো ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজনম্।
স্তুতিশ্চ বাসুদেবস্য তথা তস্যৈব পূজনম্॥

এই সকল অশুভ স্বপ্ন লোকের নিকট প্রকাশ করা ও অশুভ স্বপ্নদর্শনের পর নিদ্রা যাওয়া মঙ্গলজনক। সর্ব্বৌষধি স্নান, তিলহোম, ব্রাহ্মণদের পূজা ও বাসুদেবের স্তুতিপাঠ ও বাসুদেবের পূজা অশুভ স্বপ্নসূচক অমঙ্গলের উপশম-হেতু।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ।

আহুতি।

(১)

শেষ বয়সে সর্ব্বেশ্বর হালদার যখন সংসারের মায়া কাটাইয়া ভগবৎ-চিন্তায় চিত্ত-সমর্পণ-মানসে বৃন্দাবনযাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার সহধর্ম্মিণী তিন দিনের জ্বরে হঠাৎ গঙ্গালাভ করিয়া তাহার সমস্ত ব্যবস্থা

লণ্ড ভণ্ড করিয়া দিয়া তাঁহাকে সংসারের রজ্জুতে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া দিল।

ছয় বৎসরের একটী পুত্র, দুই বৎসরের একটী কন্যা রাখিয়া সর্ব্বেশ্বর-পত্নী পরলোকে গমন করিলেন। যদিও স্বামী স্ত্রীর বয়স নিতান্ত কম ছিল না, কিন্তু তাঁহাদের শেষ বয়সের মরা হাজা সন্তান দুইটী তখন নিতান্তই শিশু ছিল। সর্ব্বেশ্বর শিশু দুইটীকে বক্ষে লইয়া একাধারে পিতা-মাতার স্নেহে প্রাণপণ যত্নে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ বয়সে মর্ম্মান্তিক শোক, তাহার উপর সন্তান-প্রতিপালনজনিত পরিশ্রমে সর্ব্বেশ্বর অধিক দিন আপনাকে দৃঢ় রাখিতে পারিলেন না; তাঁহার দেহ ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল।

সর্ব্বেশ্বরের আর্থিক কোনও অস্বচ্ছলতা ছিল না। শ্রীরামপুর গ্রামের তিনি সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। তবে কয়েক বৎসর অজন্মা হওয়ায় এবং জমী লইয়া অপর অংশীদারের সহিত মামলা-মোকদ্দমা করিয়া সর্ব্বেশ্বরের জাঁক-জমকের কিছু হ্রাস হইলেও তাঁহাকে একেবারে কাবু করিতে পারে নাই। সর্ব্বেশ্বরের এই স্বচ্ছলতা অনেকের চক্ষুশূল হইয়াছিল। "হিংসার গাছটাও বাড়ে না" এই প্রবাদ বচন একেবারে সর্ব্বেশ্বরের উপর দিয়া যেন অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়া উঠিতেছিল। এক ঘর পুত্রকন্যার জননী হইয়া যমের কৃপায় সর্ব্বেশ্বর-পত্নী মাতৃ-সম্বোধনের কাঙ্গাল হইয়া গ্রাম্যদেবতা "বুড়ো রাজ" শিবের দ্বারে ধর্ণা দিয়া শিবপ্রসাদ ও শিবানীকে কোলে পাইয়াছিলেন। কিছুদিন তাঁহাদের বড় আনন্দেই কাটিয়া গেল। তার পর কেন জানি না হঠাৎ সর্ব্বেশ্বরের তীর্থবাসের কল্পনা জাগিয়া উঠিল। কিন্তু সর্ব্বেশ্বর-পত্নী সে ব্যবস্থা ওলট-পালট করিয়া দিয়া পরলোকের যাত্রী হইলেন।

এ আঘাত সর্ব্বেশ্বরকে অধিক দিন সহ্য করিতে হইল না। প্রাণপ্রিয় স্নেহাধার শিবপ্রসাদ ও শিবানীকে সহোদরা সর্ব্বাণী সুন্দরীর হস্তে তুলিয়া দিয়া তিনি পত্নীর অনুগমন করিলেন।

(২)

বৎসরের মধ্যে পিতৃমাতৃহীন করিয়াও যেন বিধাতার মনের সাধ মিটিল না। সচ্ছলে গ্রাসাচ্ছাদন চালাইবার যে উপায় ছিল, সুযোগ বুঝিয়া শত্রুগণ অচিরে তাহা কাড়িয়া লইল। পৈত্রিক ভিটাটুকু ছাড়া সর্ব্বেশ্বরের সন্তানদিগের আর কোনও সম্পত্তি রহিল না। বালবিধবা সর্ব্বাণী বংশের দুলাল শিবপ্রসাদ ও শিবানীকে বক্ষে ধরিয়া ভিটা আঁকড়াইয়া পড়িয়া রহিল।

সর্ব্বাণীর নিজের যাহা কিছু সম্বল ছিল তাহাতেই দুঃখে কষ্টে কোনও রকমে শিশু দুইটীকে সে মানুষ করিতে লাগিল, কিন্তু শিবানীর যত বয়স বাড়িতে লাগিল, তাহার বিবাহ-চিন্তা সর্ব্বাণীকে ততই আকুল করিয়া তুলিতে লাগিল।

গ্রামে নবকৃষ্ণ ঘোষ নামে সর্ব্বেশ্বরের এক পরম হিতৈষী বন্ধু ছিল। তাহার তত্ত্বাবধানে শিবপ্রসাদ শিক্ষালাভ করিতে লাগিল। সর্ব্বাণী শিবপ্রসাদের শিক্ষা বিষয়ে একরূপ নিশ্চিন্ত হইলেও শিবানীকে সৎপাত্রে সম্প্রদান না করিতে পারিলে সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে না। শিবানী তাহার দাদার বড় স্নেহের পাত্রী ছিল, কি করিয়া তাহাকে সৎপাত্রে অর্পণ করিবে এই ভাবনাই তাহার দাদার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু পয়সা কৈ ? বিনামূল্যে কে তাহার বড় আদরের বুকের ধনকে আদর করিয়া বরণ্ করিয়া ঘরে তুলিবে ! শিবানীর রূপ ত আছে, তবু কেহ অমনি লইতে চায় না। আগে বলে, 'কি দিতে পারবে ; সোনার থালা যদি কিন্‌তে চাও, তবে মোহর বার কর।' সর্ব্বাণীর সে সঙ্গতি নাই।

শিবানীর বিবাহের বয়স হইলে প্রাতিবেশীগণ সর্ব্বাণীকে উদ্দেশ করিয়া নানা কথা বলিতে লাগিল। সর্ব্বাণী সব কথাই শুনে, কিন্তু উত্তর দেয় না। সে উপায় চিন্তা করে, কিন্তু কোনও উপায় দেখিতে পায় না। সর্ব্বাণীর চিন্তার কূল-কিনারা নাই !

(৩)

একদিন বৈকালে অন্দরবাটীর রোয়াকে বসিয়া সর্ব্বাণী হরিনামের মালা জপ করিতেছিল। এমন সময়ে পাড়ার রাঙ্গাদিদি আসিয়া তথায় বসিল। সর্ব্বাণী মালাছড়া কপালে ছোঁয়াইয়া তাহা গলায় পরিয়া বলিল—"এস, দিদি, এস, ক'দিন তোমায় দেখিনি। মনে করেছিলাম তুমি বুঝি সাতগাঁয় গেছ। তা সেখানকার খবর পেয়েছ ?"

রাঙ্গাদিদি। হাঁ, খবর পেয়েছি, সকলে ভাল আছে। আমি ক'দিন থেকেই আস্‌ব মনে কচ্ছি, সময় পাই না, বোন, তা' তোমরা সব ভাল আছ ? কৈ শিবানীকে দেখতে পাচ্ছি না।

সর্ব্বাণী। এই ছিল বোধ হয় খেলতে গেছে।

রাঙ্গাদিদি। শিবানীর বিয়ের কি হচ্ছে ? যোগাড়-সোগাড় কিছু কর্‌তে পেরেছ ?

শুষ্ক মুখে সর্ব্বাণী উত্তর করিল—"না দিদি, কিছুই কর্‌তে পারিনি।"

রাঙ্গাদিদি। বলিল কি সর্ব্বাণী, আর কি নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকা যায়? আমাদের হিঁদুর ঘরে মেয়ের যে বিয়ের বয়স পেরিয়ে চল্লো। লোকে কত কাণাকাণি করে। হাজার হ'ক আমি আপনার জন, শুনে গা গিস্ গিস্ করে। কি করে যে চুপ ক'রে আছিস, বোন, আমি তাই ভাবি।

সর্ব্বাণীর গলা ধরিয়া আসিতেছিল। মৃদু স্বরে আর্দ্রকণ্ঠে কহিল—"কি করব, দিদি, আমি ত কোন উপায় কর্‌তে পাচ্ছি না। তোমরা পাঁচ জনে, ওর একটা গতি করে দাও।"

রাঙ্গাদিদি। কেন সেই কাইগাঁয়ের সম্বন্ধটার কি হ'ল।

সর্ব্বাণী। তা'রা দু' হাজার টাকার কমে রাজী হয় না। কোথায় পাব দিদি অত টাকা। সম্বলের মধ্যে এই ভিটাটুকু আছে। মনে করলাম যে আমার শিবানী যদি সুখে থাকে, তা'হলে না হয় এটুকুর মায়া ত্যাগ করব। শিবু আমার যদি ভগবানের কৃপায় মানুষ হয়, তখন আবার উদ্ধার করব। এই ভেবে রায় মহাশয়ের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি বল্লেন ও বাড়ীতে কি আছে যে দু' হাজার টাকা দেব। বড় জোর সাত আট শো দিতে পারি। তবে আর কি করে সে আশা করি বোন, দিদি। যথাসর্ব্বস্ব বেচলেও দু' হাজার টাকা হবে না।

রাঙ্গাদিদি। তা' এক কাজ কর না, সর্ব্বাণী, তাহ'লে সব দিকে ভাল হয়।

"কি কাজ, দিদি" বলিয়া সর্ব্বাণী জিজ্ঞাসাকুলনেত্রে রাঙ্গাদিদির মুখের দিকে চাহিল।

রাঙ্গাদিদি ঢোক গিলিয়া একবার কাসিয়া বলিল—"এই আমাদের নবর কথা বল্‌ছিলাম। নব আবার বিয়ে ক'রবে বলে মেয়ে খুঁজছে কি না। তাই শিবানীর সঙ্গে যদি হয় তো—"

শিহরিয়া সর্ব্বাণী বলিয়া উঠিল—"ও কথা বল না, দিদি। ওর বাপ মা নেই, অনাথ বলেই কি"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া সর্ব্বাণীর কণ্ঠ রোধ হইল। হু হু করিয়া চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া গেল।

অপ্রতিভ হইয়া রাঙ্গাদিদি বলিল—"ও মা, কাঁদিস কেন বোন, আমি ভাল ভেবেই বলছিলাম। তা' তোমাদের যদি মন না থাকে, ভাল ঘর বর জোটাতে পার সে ত ভালই। এমনি কথার কথা বল্‌ছিলাম বৈত নয়।"

শিবপ্রসাদ স্কুল হইতে আসিয়া ঘরে বই শ্লেট রাখিতে গিয়া কথাগুলি

শুনিতে পাইয়াছিল। বয়সে বালক হইলেও দারিদ্র্যতার পীড়নে সে অনেকটা বয়স্কের জ্ঞান-বুদ্ধি লাভ করিয়াছিল। পিতার বয়সী ভগিনীপতির কল্পনা শুনিয়া সে বিরক্তভাবে ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিল—"রাঙ্গাপিসি, তার থেকে ত দড়ি কলসী আর সামনের পুকুর শিবানীর পক্ষে উত্তম ব্যবস্থা।"

এই কথা বলিয়াই শিবপ্রসাদ প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

আহত ফণিনীর মত রাঙ্গাদিদি ক্রোধভরে দাঁড়াইয়া উঠিল। ঈষৎ উচ্চস্বরে বলিল—"ক্ষমতা থাকে ত ভাল ঘরে বোনের দিয়ে দে না। হাতী ক'রে ঘরে পুষে রেখেছিস্ কেন; ভাল ব্যবস্থা কর্ না। এদিকে যে গাঁয়ের লোকে একঘরে করবার জোগাড় করেছে, তার খবর রাখিস্। নাক তুলে কথা কইছিস্ যার নামে, সে লোক হ'তেই ত আজ মানুষ হ'তে চল্লি; কলিতে কারুর ভাল কর্‌তে নেই। নব ঘোষ তোর বোনকে বিয়ে করে ত, তোর চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্যি! তিন কুল খেগো, অপয়া কুড়ি বছরের বুড়ীকে বিয়ে করবে কে রে। একরত্তি ছেলের কথা শুনে পিত্তি জ্বলে যায়।"

রাঙ্গাদিদি ক্রোধে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

সর্ব্বাণী পাথরের মত শক্ত হইয়া গুম খাইয়া রহিল। মুখ দিয়া একটী কথাও উচ্চারণ করিবার শক্তি যেন ছিল না।

সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পরে শিবপ্রসাদ বাটী ফিরিয়া দেখিল সর্ব্বাণী ঠিক সেই স্থানেই এক ভাবে নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তির মত বসিয়া আছে; কোলের কাছে শিবানী মাটীতে পড়িয়া ঘুমাইতেছে।

শিবপ্রসাদ নিকটে গিয়া ডাকিল—"পিসিমা।"

স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া সর্ব্বাণী বলিল—"কে, শিবু এসেছিস্।"

শিবপ্রসাদ। হাঁ, তুমি অন্ধকারে বসে আছ কেন পিসিমা, ঘরে আলোতে এস না।

সর্ব্বাণী। না বাবা, এই অন্ধকারই ভাল। তুই আমার কাছে বস্; একটা কথা বলি।

শিবপ্রসাদ না বসিয়া সর্ব্বাণীর কোলে মাথা দিয়া একেবারে শুইয়া পড়িল।

সর্ব্বাণী সস্নেহে তাহার কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"হাঁ বাবা, তুই আজকাল এত রোগা হ'য়ে যাচ্ছিস কেন?"

হাসিয়া শিবপ্রসাদ উত্তর করিল—"রোগা কোনখানটায় দেখলে মা। তুমি কেবল রোগা হ'তেই দেখ।"

সর্ব্বাণী। আমার চোখে কি ধূলো দিতে পারিস্ বাবা ; তুই অত ভাবিস্ কেন, শিবু ?

শিবপ্রসাদ হাসিয়া বলিল—"কি ভাব্‌ব মা ; তুমি কেবল রাত-দিন ভাব বলেই মনে কর আমিও ভাবি। আমার ও সব ভাবনা-চিন্তা আসে না, আর তুমি যত দিন আছ, তত দিন আমার ভাবনার ছুটী।"

কথাটা যে সর্ব্বাণীর বিশ্বাস হইল না, তাহা শিবপ্রসাদ যদি তাহার মুখ দেখিতে পাইত তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিত। আস্তে আস্তে একটী ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃদু কণ্ঠে সর্ব্বাণী বলিল—"আচ্ছা শিবু তোর রাঙ্গাপিসি ত ভাল কথাই বলেছে বাবা, আমি তখন বুঝতে পারিনি।"

শিবপ্রসাদ। কি নব ঘোষের সঙ্গে শিবানীর বিয়ে !

সর্ব্বাণী। মন্দ কি ?

শিবপ্রসাদ। ভেবে ভেবে তোমার মাথা নিশ্চয় খারাপ হয়ে গেছে, পিসি-মা; সে যে ষাট বছরের বুড়ো ; কোন দিন শিঙে ফুকবে তার ঠিক নেই, আর তোমরা তার বিয়ের জোগাড় দেখছ ? শিবানীর কি এমন দুর্ভাগ্য !

সর্ব্বাণী। ওর মত দুর্ভাগিনী আর কে আছে বাবা, ও যে জন্মজোড়া দুর্ভাগ্য নিয়েই জন্মেছে !

সর্ব্বাণী অঞ্চলে নয়ন মুছিয়া ধরা গলা ভাল করিয়া ঝাড়িয়া পুনরায় বলিল, —"বুঝে দেখ বাবা, আর ত উপায় নেই।"

শিবপ্রসাদ। বুঝে দেখেছি উপায় নেই কেন ? তুমি ত বিয়ে হয়েও আইবুড়র মত চিরদিন বাপের ঘরে আছ। ও না হয় আইবুড়ই চিরদিন থাক্‌বে। তা'বলে আজীবন জ্বলে মরতে আগুনের হাতে সঁপে দিতে পারব না।

সর্ব্বাণী। শিবানীর বিয়ের বয়স পার হয়ে গেল, লোকে কি তা বুঝবে বোকা, একঘরে করবে যে !

শিবপ্রসাদ। করুক ক্ষতি কি ! আমার ত তিন কুলে কেউ নেই যে তার ভাবনা ভাবতে হবে।

সর্ব্বাণী। বংশে বাতি দিতে যে কেবল তুই আছিস বাবা ; তোকে ত ঘর সংসারী হতে হবে ; বাপের নাম রাখতে হবে ; তোর মুখ চেয়ে সেই আশাতেই যে বেঁচে আছি।

শিবপ্রসাদ উঠিয়া বসিয়া জোরে জোরে বলিল—"চুলোয় যাক ; ঘর-সংসরা

করতে হবে বলে কি ওর গলায় পা দেওয়াই ধর্ম্ম হ'ল। আর বংশে বাতি দেওয়া যদি ভগবানের অভিপ্রেত না হয়, তা হ'লে তুমি আমি কি তাঁর বিধান উল্টে দিতে পারবে ?"

সর্ব্বাণী। ও কথা বলিস্‌নে শিবু ; এ বংশের কেহ এমন পাপ করেনি যে সই পাপে বংশে বাতি জ্বল্‌বে না। আর শিবানীর কপালে যদি বুড়ো বরই লেখা থাকে, তুই কি তা রদ করতে পারবি ?

শিবপ্রসাদ। তা পারব না ; কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, নব ঘোষের একটা জল জ্যান্ত বৌ রয়েছে, সে ত মরেনি। বুড়ো বরে সতীনের উপর যে—

বাধা দিয়া সর্ব্বাণী অধীরভাবে বলিয়া উঠিল—"সব জানি, শিবু সব জানি। সব ভেবে দেখেছি ; তবুও শিবানীকে ঐ পাত্রে দিতে হইবে নইলে উপায় নেই।"

এই কথা বলিয়া পুনরায় সর্ব্বাণী শিবপ্রসাদকে অস্পষ্টস্বরে কি কতকগুলি কথা বলিল। তাহা শুনিয়া শিবপ্রসাদ উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিল—"তুমি যদি বুঝতে পেরেই থাক যে, নব ঘোষের চক্রান্তে আমাদের এই দুর্দ্দশা এবং শিবানীর বিয়ের প্রতিবন্ধকতা ওর দ্বারাই হচ্ছে, তবে আবার কোন হিসাবে সেই শত্রুর হাতে শিবানীকে তুলে দিতে চাচ্চ ; তা কখনই দেব না। যে দেশে প্রবল প্রতিবেশী দুর্ব্বল অনাথ প্রতিবেশীর প্রতি এত অত্যাচার করতে, তার এমন সর্ব্বনাশ করতে পারে সে পাপ দেশ ছেড়ে যাওয়াই ভাল।"

সর্ব্বাণী। থাম বাবা থাম। পাগলের মত কি বলিস তার ঠিক নেই ; বুঝে কথা বল। তোর কি আছে কার জোরে তুই জোর কচ্ছিস। সব যাক বাবা, বংশমর্য্যাদা হারাসনে। বাপের নামটা ডুবুসনে।

সেই রাত্রে, সেই স্থানে সেই নিবিড় অন্ধকারে বসিয়া তাহারা দু'জনে চুপি চুপি কি পরামর্শ করিতে লাগিল। কথা ফুরায় না ; কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে রাত্রি শেষ হইয়াছে জানাইয়া প্রভাতী তারা পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল। প্রভাত হইতে না হইতে সর্ব্বাণী রাঙ্গাদিদির পদতলে পড়িয়া নিজের অভিপ্রায় জানাইল।

ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া অভিষ্ট সিদ্ধির পন্থা সুগম দেখিয়া হর্ষিতা রাঙ্গাদিদি বলিল—"আমি ত ভাল কথাই বলেছিলাম বোন। তখন তোরা মায়ে বেটায় লাফিয়ে উঠিলি। তা' এখন বুঝতে পেরেছিস, ভালই। আমি তোদের হিতকারী, মনে রাখিস সর্ব্বাণী। শিবানী কি তোর একলার সামগ্রী, তা নয়!

তোর যেমন, সে আমারও তেমনি ; তোর যাতে ভাল হয় সেই চেষ্টাই আমি কচ্ছি ; শিবু যেন সেটা বুঝে দেখে!"

বিষণ্ণমুখে সর্ব্বাণী উত্তর করিল—"সে ছেলেমানুষ দিদি। তার কি কোন বোধ-শোধ আছে ; সে কথা কিছু মনে কর না। এখন যাতে এ দায় হ'তে উদ্ধার হই, তুমি তাই কর দিদি।"

রাঙ্গাদিদি। সে কথা কি আর তোকে বলতে হবে ? আমি এখনি নবর কাছে যাই, সে কি বলে শুনে আসি। কাল শুনে এলেছি, ও পাড়ার গণেশ মিত্রের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের বন্দোবস্ত হচ্ছে। তারা টাকাও দিবে ; তা' দেবে নাই বা কেন ? নবর বয়সই বা কি এমন বেশী হয়েছে তা' ত নয়। এখনও চাকরী কচ্ছে, আশী টাকা মাইনে পাচ্ছে ; তা ছাড়া জায়গা-জমী, বাগান-পুকুর, বিষয়-সম্পত্তি কত রয়েছে! ওর হাতে যে পড়বে সে সুখেই থাকবে। যদি বল সতীন, তা থাকলেই বা কি ? নব যদি নতুন বোয়ের বশ হয়, তা হলে সে ঘুঁটে কুড়ুনি কি করতে পারে ? শাস্ত্রে বলে, বেটার জন্য বিয়ে, তা যখন হোল না, তখন সে বৌয়ের দরকার কি ? ছেলে হ'লে পরে শিবানীর ত সব, সে ত ছড়া-হাঁড়ী, বার-কলসী!

সর্ব্বাণী। আমি কিছুই দিতে পারব না, সেটা নবকে বোল। তা'হলে আমি এখন যাই ; তুমি আমাকে খরচ দেবে কখন ?

রাঙ্গাদিদি। তোমাকে কিছুই ভাবতে হবে না। আমি সব ঠিক ক'রে খবর দেব।

সর্ব্বাণী চলিয়া গেল।

মহতের অনুভূতি।

মহতে মানিব বলে আমি ক্ষুদ্র নই,
সবারে মানিয়া সে ত নিজে বড় হই।
সকলের সমাদর জানে যেই জন,
ছোট সেই কারো কাছে নয় কদাচন।
সবার মাঝারে যাঁর মহান্ বিকাশ,
আমারি মাঝারে তাঁর সুরভি নিঃশ্বাস।
বিনয়ে হইয়া নত মহতে যে চায়,
সেই জন ততটুকু জানে আপনায়।
আপনার প্রতি যার শ্রদ্ধাটুকু আছে,
নত হ'তে জানে সেই জগতের কাছে।
দম্ভ বটে নহে ভাল চিরদিন জানি,
অহঙ্কার মহারিপু তাও সত্য মানি।
তা বলে যে আপনারে মানে না কখন,
শুধু হেয় তুচ্ছ নীচ ভাবে অনুক্ষণ,
আপনার প্রাণমূলে হয় না ক নত,
সে কেমনে জগতের হবে বশীভূত ?
সকলের মাঝে যিনি মহান্ বিরাট্,
আমারো মাঝারে তিনি—আমাতে স্বরাট্।
তাই আগে নত হব আপনার কাছে,
আমার মাঝারে যাঁর বিশ্ব-প্রাণ আছে।
তার পর হব নত সবার নিকট,
আপনার কাছে রব নিয়ত প্রকট।
আপনার মাঝে রচি' বিশ্বের বন্দনা
করিব অন্তরে নিত্য মহা-উপাসনা।

শ্রীঅবনীকুমার দে।

গ্রন্থকারের আয়।

অস্মদ্দেশে সাহিত্য, সাহিত্যকারদিগের মধ্যে ইদানীং আর ততটা সখের জিনিস নয়,—ইতিপূর্ব্বে যতটা ছিল। সাহিত্য এখন অল্পাধিক পরিমাণে ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। অগণিতসংখ্যক গ্রন্থকার আমাদের মধ্যে আজকাল উত্থিত হইতেছেন। সাহিত্য অনেকেরই উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই সাহিত্যবৃত্তি এ বাজারে এক প্রকার উঞ্ছবৃত্তি বলিলেও বলিতে পারি। যে বৃত্তির যত গৌরব ও পবিত্রতা, তাহাতেই যেন অভাগ্যবশতঃ তত অগৌরব ও তত কলঙ্ক অলক্ষ্যে আসিয়া জুটে। বঙ্গদেশে সাহিত্যবৃত্তি অনুপযুক্ততা ও ইতরতায় কলঙ্কিত হইতেছে। প্রবঞ্চক, প্রতারক, বদমাইস, বাটপাড়, গাধা, গণ্ডমূর্খ ও সমাজমাত্রেরই মলিনতা যাহারা, তাহারাও আসিয়া এ বৃত্তির অভ্যন্তরে দাঁড়াইয়া, তথাকার বিশুদ্ধ বায়ু এমনতর কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে যে, সে বলিবার নয়। সংখ্যায় অল্প হইলেও এবং তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন না হইলেও যোগ্য ও আত্মসম্ভ্রমশীল লেখক অবশ্য উপস্থিত ক্ষেত্রে আছেন। কিন্তু "অন্ন হয় না", উদরান্নেরই যখন আদৌ অভাব, তখন আর তাঁদের আয়ের কথা কি কহিব? আয়ও নাই, আদরও নাই, অন্নও নাই,—লেখার অভ্যাস আছে কেবল অভ্যাসের কণ্ডূয়নে।

আয় যদি এ ক্ষেত্রে কাহারও থাকে, তাহা "স্কুল-বুক"-লেখকদিগের; অথবা "স্কুলবুক" নামে যাঁহাদের প্রণীত পুস্তক বিক্রীত হয়। স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর মহোদয়দিগের কুটুম্ব ও কৃপাকটাক্ষপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই এ আয়ের অধিকারী। ইঁহাদের অধিকাংশ লোক প্রবৃত্তি বা প্রতিভার জন্য কোন কালেই গ্রন্থকার হইতেন না; গ্রন্থকার হইয়াছেন গতিকে পড়িয়া, কেবল স্কুল-পাঠ্য পুস্তকাবলী বিক্রয়ের বৃত্তিটা 'গো-গ্রাসে' গ্রাস করিবার জন্য। এই সকল বিদ্যালয়ের বৃত্তভোগী বইওয়ালা ব্যতীত উপযুক্ত আয় আর কয়জন লেখকেরই আছে? অক্ষয়কুমার দত্তের পুস্তক-বিক্রয়ের আয় উল্লেখযোগ্য; কারণ তাহা নিতান্ত অনুপযুক্ত রকম ছিল না। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আয় মাসিক তিন হইতে পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত হইবার সংবাদ শুনা গিয়াছে। দত্তজ ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আয়ও স্কুল-পাঠ্য পুস্তক-বিক্রয় হইতে। তাঁহাদের প্রণীত স্কুল-পাঠ্য পুস্তকসমূহ কর্ত্তাদের মতে পাঠোপযোগী হইলেও কেবল স্কুল-পাঠ্য পুস্তক দ্বারা কোন সাহিত্যই বিশিষ্টতা লাভ করে না, পরন্তু তাঁহাদের

ঐ সকল পুস্তক স্কুল-পাঠ্য না হইলে আদৌ আয়কর হইত কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। আমাদের কবি ও "নবেলিষ্ট"দিগের মধ্যে বঙ্কিমবাবুর যৎকিঞ্চিৎ আয় আছে; মাইকেল দত্তের কাব্যাবলীর স্বত্বাধিকার অতি সামান্য মূল্যে ডাক নিলামে বিক্রয় হইয়াছিল।

এখন একালে যেমন এক অনির্দ্দিষ্ট-রাশি 'জনসাধারণ' গ্রন্থকারের উৎসাহদাতা এবং আর্থিক আয়ের আশ্রয়স্থল, তখন সে কালে তেমন ছিল না। তখন রাজা, ভূম্যধিকারী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ স্ব স্ব অধিকার মধ্যে সাহিত্যের সহায়তা করিতেন, তাহা করিয়া কৃতার্থ হইতেন এবং তাহা করাকে অতি বড় কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কবি, পণ্ডিত, সুলেখক ও সুগায়ক, সাহিত্যসেবক ও শাস্ত্রাধ্যাপক, বিজ্ঞানব্যবসায়ী ও গুণীমাত্রেই রাজসভার সদস্যরূপে প্রতিপালিত হইয়া অথবা রাজপ্রদত্ত ভূম্যাদি প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিন্ত মনে স্ব স্ব শক্তির অনুশীলন করিতেন। উদরান্ন ও সংসার-প্রতিপালনের জন্য তাঁহাদিগকে পরপদলেহন, প্রভু-আজ্ঞা-বহন ও অন্য কোনও উঞ্ছবৃত্তি করিতে হইত না; অদ্যকার মত বিবিধ বিজ্ঞাপনে উপহারের ভার স্কন্ধে লইয়া 'জন সাধারণে'র দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া প্রহার ভক্ষণ করিতেও হইত না।

বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের প্রধান রত্ন 'কবি কালিদাস' কর্ণাটরাজ-সমীপে কবিতা চতুষ্টয় দ্বারা দিক-চতুষ্টয় অর্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। দরিদ্র ও স্বগ্রামে নির্ব্বাসিত কবিকঙ্কণের প্রথম উপার্জ্জন,—

"দশ আড়া ধান।"

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগর রাজসভায় মাসিক ৪০৲ টাকা বেতন পাইতেন। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ তাঁহার কবিত্বের প্রথম পুরস্কারস্বরূপ মাসিক ৩০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরন্তু যশমন্ত সিংহ গুণবন্ত

মেদিনীপুরাধিপতি, কর্ণগড়ে সরস্বতী,
ভগবতী যাঁহার সাক্ষাৎ।
তস্য পোষ্য রামেশ্বর, তদাশ্রয়ে করে ঘর।

কিন্তু এখন আর এ নিয়ম নাই; এবং বিলাতি নিয়মও পূর্ণভাবে বর্ত্তিত হয় নাই। বিলাতে গ্রন্থপ্রকাশক ধনী মহাজনগণ গ্রন্থকারদিগকে প্রতিপালন করেন ও গ্রন্থকার প্রস্তুত করেন। তথায় সাহিত্যামোদী জনসাধারণের সংখ্যাও অসংখ্য। তথায় এখানকার মত গ্রন্থকারদিগকে "থালা ঘটি বাঁধা দিয়া" বই ছাপাইয়া পটলডাঙ্গার পুস্তকালয়সমূহের আলমারিতে পচাইতে হয়

না। বিলাতি গ্রন্থকারদিগের আয়ের কথা শুনিয়া 'চমকাইয়া" যাইতে হয়। লর্ড মেকলে তাঁহার ইতিহাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের জন্য লঙম্যান কোম্পানীর নিকট হইতে ২০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় তিন লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন। স্যর ওয়ালটার স্কট তৎপ্রণীত নেপলিয়ান বোনাপার্টির জীবনীর মূল্য ১৮০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থকার তাঁহার "উডষ্টক" নামক একখানি মাত্র উপন্যাসে ৮২৩৮ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় লক্ষাধিক টাকা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই উপন্যাসখানি লিখিতে তাঁহার তিন মাস মাত্র সময় লাগিয়াছিল। পরন্তু এই ওয়ালটার স্কট তাঁহার আরও ১১ খানি নবেল ও একটী উপাখ্যান গ্রন্থের মূল্যস্বরূপ ১১০০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৬ লক্ষ টাকারও অধিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে নবেম্বর হইতে ১৮২৬ খৃঃ জুন পর্য্যন্ত এই ১৯ মাসের মধ্যে ইঁহার ২৬০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় চারি লক্ষ টাকা আমদানি হইয়াছিল। ফরাসী গ্রন্থকার ভিক্টর হুগো তাঁহার "Les miserables" নামক একখানি উপন্যাসে ১৬০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা বাক্সবন্দী করিয়াছিলেন। জর্জ্জ ইলিয়ট নাম্নী নারী ঔপন্যাসিক তাঁহার "Romola" নামক উপন্যাসটীর পাণ্ডুলিপি প্রদান করিয়া প্রকাশকের নিকট হইতে ১০০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ দেড় লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং প্রকাশকেরও এই পুস্তক বিক্রয় করিয়া বিলক্ষণ লাভ হইয়াছিল। ডিকেন্স তাঁহার "The Chimes" নামক একখানি অতি ক্ষুদ্রাকারের পুস্তকের মূল্য পাইয়াছিলেন ৫০০০ পাউণ্ড; তার মানে ষাট হাজার টাকার অধিক। ডিকেন্সের নবেলগুলির আয় বার্ষিক লক্ষ টাকারও অধিক হইত। বুলুয়ার লিটন তাঁহার উপন্যাস-গ্রন্থনিচয় হইতে ৮০০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ বার লক্ষ টাকারও অধিক সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ট্রোলোপ সংস্থান করিয়াছিলেন সাত লক্ষেরও অধিক। আধুনিক নবেলিষ্টদিগের মধ্যে উইলকি কলিন্স তাঁহার "No Name" নামক উপন্যাস হইতে (৩০০০ পাউণ্ড) ৪৫ হাজার টাকারও অধিক প্রাপ্ত হয়েন। ঐ গ্রন্থকার তাঁহার "Armadale" নামক উপন্যাসে পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক উপার্জ্জন করেন। আজকাল নবেল-লেখকগণ এক একখানি নবেল লিখিয়া দুই রকমে অর্থ উপার্জ্জন করেন। প্রথমতঃ নবেলখানি সাময়িক পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে দিয়া একবার অর্থ সংগ্রহ করেন; তার পর পুস্তকাকারে প্রকাশের স্বতন্ত্র মূল্য প্রাপ্ত হন।

শুনা যায়, উপন্যাস ও ইতিহাস-গ্রন্থে প্রকাশকদিগের ব্যয় পড়ে অধিক।

লর্ড বিকন্সফীল্ড তৎপ্রণীত Endymion উপন্যাসের দরুণ (১০০০০ পাউণ্ড) দেড় লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন। গিবনও তাঁহার ইতিহাসের জন্য অত টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কবির 'নাম-ডাক' হইয়া উঠিলে কবিতাও বড় কম মূল্যে বিকায় না। বায়রণ অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রকাশক মারের নিকট হইতে ২,৪০,০০০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুর বায়রণের জীবনী লিখিয়া ৪০,০০০ টাকা পাইয়াছিলেন। মুরের "লালা রুখ" নামক কাব্যও অত টাকা আদায় করিয়াছিল। ভূতপূর্ব্ব রাজকবি লর্ড টেনিসনের কবিতার মূল্য বড় 'চড়া'। সাময়িক পত্রনিচয়ে তাঁহার যে সকল কবিতা প্রকাশিত হয়, তাহার প্রতি ছত্রের মূল্য পড়ে প্রায় পনের টাকা করিয়া। গত বৎসর ষ্টানলীর ভ্রমণবৃত্তান্তের মূল্য কোনও কোনও প্রকাশক ৪০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ছয় লক্ষ টাকারও অধিক দিতে চাহিয়াছিলেন। পাঠক! শুনিলেন, ইউরোপীয় গ্রন্থকারদিগের আয়ের কথা বুঝিলেন, তথায় সাহিত্যের আদর কত?

কথিত আছে, পুরাকালে হিরোডোটাস তৎপ্রণীত ইতিহাস-গ্রন্থের কিয়দংশ মাত্র পাঠ করাতে আথেনিয়ানগণ সাধারণ রাজকোষ হইতে তাঁহাকে (দশ ট্যালেণ্ট) ২৫ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছিল। পরন্তু সম্রাট অগস্টস 'ইনিয়দ' নামক কাব্যের কিয়দংশের প্রত্যেক কবিতার জন্য ভর্জ্জিলকে ৮০০৲ টাকা করিয়া পুরস্কার দিয়াছিলেন।

বানর রাজপুত্র। *

[ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত]

১

সে অনেক কালের কথা। তখন ব্রহ্মদেশের আভা রাজ্যে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সাত রাণী। রাজার হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া; বিস্তর সৈন্যসামন্ত, সেপাই-শান্ত্রি, লোক-লস্কর। টাকা-কড়ি, ধন-রত্ন অফুরন্ত; ভাণ্ডার যেন উথলিয়া পড়িতেছে। কিন্তু ঐশ্বর্য্য থাকিলে কি হয়, সন্তান ছিল না বলিয়া রাজার মনে বড় দুঃখ ছিল।

এমনই মনের দুঃখে দিন যাইতে লাগিল। একদিন রাজা শুনিলেন,—তাঁহার রাজধানী হইতে কিছু দূরে এক সন্ন্যাসী আসিয়া রহিয়াছে। অদ্ভুত তাঁহার ক্ষমতা। তিনি যাহাকে যাহা বলেন, তাহাই হয়। যে যাহা কামনা করিয়া যায়, তিনি তাহার সেই কামনাই পূর্ণ করেন।

সন্ন্যাসীর গুণের কথা শুনিয়া রাজা তখনই মন্ত্রীকে হুকুম দিলেন,—"আমি সন্ন্যাসীর কাছে যাইব।" অমনি চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। রাজার আগুপিছু অনেক ঘোড়সওয়ার ছুটিল; আর রাজা স্বয়ং হাতীর উপর চড়িয়া চলিলেন। সন্ন্যাসীর কুটীরে পৌঁছিতে দেরী হইল না।

সন্ন্যাসীর সম্মুখে আসিয়াই তিনি সাষ্টাঙ্গে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন এবং মনের দুঃখ জানাইলেন।

সন্ন্যাসী রাজার হাতে ছয়টী কদলী দিয়া বলিলেন,—যাও তোমার এক এক রাণীকে এক একটী করিয়া কদলী দাও। এই কদলীগুলির অদ্ভুত ক্ষমতা। রাণীরা এইগুলি খাইলে তাঁহাদের প্রত্যেকের একটী করিয়া পুত্র হইবে।

রাজা কলা ছয়টী পাইয়া আনন্দে অধীর হইলেন এবং সেই জন্য সন্ন্যাসীকে তাঁহার যে সাত রাণী আছে এ 'কথাটা বলিতে ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু পথে আসিতে আসিতে এই কথাটী তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। রাণী সাত জন; কিন্তু কলা হইল ছয়টী। কোন রাণীকে বাদ দিয়া খাওয়াইবেন, ইহাই রাজা ভাবিতে লাগিলেন।

কিন্তু নিয়তি এই ভাবনা হইতে রাজাকে উদ্ধার করিল। তিনি প্রাসাদে উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন যে, তাঁহার সুন্দরী ছোট রাণী তথায় নাই; তিনি গিয়াছেন তাঁহার মামার বাড়ীতে।

রাজা তখন তাঁহার ছয় রাণীকেই ডাকিলেন এবং সকলেরই হাতে এক একটী কলা দিয়া বলিলেন—তোমরা সকলেই এই কলা খাও; খাইলে তোমাদের পুত্র হইবে।

রাণীরা সকলেই একই সময়ে সেই কলা ছয়টী খাইল এবং খোসাগুলা সমস্তই উঠানে ফেলিয়া দিল।

---

* ব্রহ্মদেশের উপকথা।

ছোট রাণী খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়াই সকল ব্যাপার শুনিলেন। তাঁহার বড় দুঃখ হইল। তিনি অন্য সকল রাণীকেই জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভাই তোমরা সব কলা কয়টাই কি খাইয়া ফেলিয়াছ? তাহারা বলিল—হাঁ। তবে একজন রাণী তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল,—ভাই কলার খোসাগুলা ত তোমাকে দিতে পারি না; সেইগুলাই উঠানে পড়িয়া রহিয়াছে।

ছোট রাণী এই কথা শুনিয়া ভাবিলেন,—সন্ন্যাসীর দেওয়া জিনিষ—ইহার কি কিছু ফল হইবে না? এই বলিয়া ভক্তিভরে ছোট রাণী ছয়টী কলার খোসাগুলি খাইয়া ফেলিল।

২

সন্ন্যাসীর এই অদ্ভুত কদলী ভক্ষণের ফল ফলিল। ছয় রাণীরই ছেলে হইল; ছোট রাণীরও ছেলে হইল—তবে সে ছেলে—মানুষ নয়, বানর।

রাজসভায় এ খবর পৌঁছিলে মন্ত্রীরা সকলেই বলিলেন—মহারাজ এই বানর ছেলেটা মারিয়া ফেলুন, নিশ্চয়ই ইহা হইতে আপনার অমঙ্গল হইবে।

রাজা বলিলেন;—না—না, তাহা হইবে না।

ছয়টী ছেলের জন্য রাজার খুবই আনন্দ হইল বটে, কিন্তু বানর ছেলেটীর জন্য দুঃখ হইল তাহার চেয়ে অনেক বেশী। ছোট রাণীকে তিনি প্রাণের চেয়েও ভালবাসেন, সেই রাণীর পেটে কিনা বানর জন্মিল, এই ভাবিয়া তিনি সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকিতেন।

ক্রমে ছয় ভাইয়ের সঙ্গে বানর-রাজপুত্রও খেলা ধূলা করিয়া বড় হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম বানর-রাজপুত্র রাজবাড়ীর সকলেরই চোখে কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকিত, কিন্তু শেষে তাহার চেহারা সকলেরই চোখে সহিয়া গেল। কিন্তু তাহার আকার কুৎসিত হইলে কি হয়, তাহার বুদ্ধি খুবই তীক্ষ্ণ ছিল এবং মানুষের মত কথা করিতে পারিত। সেইজন্য অন্যান্য রাজপুত্রের মত তাহার লেখাপড়া শিখিতেও কোনও বাধা হয় নাই; বরং সে তাহাদের চেয়ে অনেক ভাল লেখাপড়াই শিখিয়াছিল।

৩

অবশেষে রাজপুত্রেরা যৌবনে পদার্পণ করিল। ছয় রাজপুত্রই রাজার নিকটে আসিয়া বলিল,—বাবা আমাদিগকে একখানা জাহাজ দিন্, আমরা দেশ দেখিতে বাহির হইব।

রাজা তখনই হুকুম দিলেন। তাহারা সকলে যাত্রার জোগাড়-যন্ত্র করিতে লাগিল। এমন সময়ে বানর-রাজপুত্র তাহাদের কাছে আসিয়া বলিল,—ভাই আমিও যাইব। কিন্তু তাহাকে ভাই বলিয়া স্বীকার করিতে তাহাদের বড় লজ্জা হইত; এই জন্য তাহারা বলিল—তোমাকে আমরা সঙ্গে লইব না।

কিন্তু বানর-রাজপুত্রেরও দেশ দেখিবার খুব গোঁ হইল। এইজন্য যেদিন সকালে জাহাজ ছাড়িবার কথা, তাহার পূর্ব্ব দিনের রাত্রিতে সে জাহাজে গিয়া লুকাইয়া রহিল।

জাহাজ যখন কূল-কিনারা ছাড়িয়া সমুদ্রের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে, সেই সময়ে বানর-রাজপুত্র গুপ্ত স্থান হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং বুক ফুলাইয়া পায়চারি করিতে

লাগিল। অন্যান্য রাজকুমারেরা তাহাকে কিছু বলিবার আগেই সে বলিল—ভাই তোমরা আমায় ডাকিলে না, আমি নিজেই আসিয়াছি।

তাহার ভ্রাতারা এজন্য তাহাকে খুব তিরস্কার করিল; কিন্তু সে তাহাদের কথায় কাণ দিল না। জাহাজ তখন কুল ছাড়িয়া অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছে; তাহাকে নামাইয়া দেওয়াও অসম্ভব ব্যাপার।

জাহাজ ক্রমে মহাসমুদ্রে আসিয়া পড়িল। কয়েক দিন চলিবার পর একজন নাবিক আসিয়া রাজপুত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিল—কোন্ দিকে যাইব?

তাহারা উত্তর দিল—পূর্ব্বদিকে চল।

নাবিক তখন বলিল—কোন্ দিকটা পূর্ব্বদিক্ তাহা আমাকে বলিয়া দিন্।

রাজপুত্রেরা তাহাকে কর্কশভাবে বলিল—তুমি নাবিক, তুমি দিক্‌নির্ণয় করিতে জান না? আমরা রাজপুত্র আমরা এ সকল জানি না।

নাবিক উত্তর করিল—যতক্ষণ জাহাজ কিনারার নিকট দিয়া যাইতেছিল, ততক্ষণ আমরা দিক্‌নির্ণয় করিয়া যাইতেছিলাম। এখন কূল-কিনারা দেখিতে পাইতেছি না, এ অবস্থায় দিক্ নির্ণয় করা আমাদের কর্ম্ম নয়। এই মহাসমুদ্রে আমরা দিক্‌ভ্রষ্ট হইয়াছি। শীঘ্র স্থল না পাইলে আমরা তৃষ্ণায় মরিয়া যাইব। কারণ জাহাজে খাইবার জল নাই। সমুদ্রের জল খাওয়া চলে না।

নাবিকের কথা শুনিয়া রাজপুত্রদের মুখ শুকাইয়া গেল। কিন্তু বিপদে অধীর হইলে কোনও ফল হইবে না, ইহা তাহারা বুঝিল এবং সকলেই উদ্ধারের উপায় ঠিক করিবার জন্য পরামর্শ করিতে লাগিল। তাহারা সকলেই বলিল,—নাবিকেরা মাস্তুলের চূড়ার উপর উঠিতে পারে না, উহারা অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। কিন্তু আধখানা মাস্তুল থেকে কিনারা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। আমাদের বানর ভাইয়ের শরীর খুব হাল্‌কা; সে নিশ্চয়ই মাস্তুলের চূড়ায় উঠিতে পারে এবং সেখান হইতে কিনারা দেখিতে পাওয়া সম্ভব।

তখন তাহারা বানর-রাজপুত্রকে কতকটা তাচ্ছিল্য করিয়া বলিল—তুই ত জাহাজে উঠিয়া আমাদের অন্ন ধ্বংস করিতেছিস্, এইবার আমাদের একটা উপকার কর্। মাস্তুলের ডগায় উঠিয়া ডেঙ্গা কোন্ দিকে তাহা দেখ।

বানর-রাজপুত্র বলিল—তোমরা বরাবরই আমাকে দূর-ছাই কর। সকল সময়ই বলিয়া থাক যে, আমি একটা তুচ্ছ, ঘৃণিত প্রাণী; কখনও কাহারও কোনও কাজে লাগিব না। দেশ থেকে আসিবার সময় তোমরা আমাকে জাহাজে উঠিতে দাও নাই। সুতরাং আমি তোমাদের উপকার করিব না। তোমরা নিজেরা মাস্তুলে উঠিয়া দিকনির্ণয় কর।

এই কথা শুনিয়া রাজপুত্রদের খুব ভয় হইল। তাহারা বানর ভাইয়ের নিকট হাতজোড় করিয়া ক্ষমা চাহিল এবং মাস্তুলের উপর উঠিবার জন্য কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল। তখন বানর-রাজপুত্র মাস্তুলের চূড়ায় উঠিল ও শীঘ্রই কিনারা দেখিতে পাইল।

তার পর বানর-রাজপুত্রের নির্দ্দেশ মত জাহাজ চালাইয়া ক্রমে তাহারা কূলের নিকটবর্ত্তী

হইল। নাবিকেরা আনন্দিত হইয়া সেখানে নঙ্গর ফেলিল। রাজপুত্রেরা বানর-রাজপুত্রকে জাহাজ দেখিতে বলিয়া ছোট নৌকায় করিয়া কিনারায় উপস্থিত হইল।

অন্যান্য রাজপুত্রেরা চলিয়া যাইবার পর বানর-রাজপুত্রেরও স্থলে নামিবার জন্য কৌতূহল হইল। সে জাহাজখানিকে কিনারার খুব কাছে লইয়া গিয়া জমিতে লাফাইয়া পড়িল।

৪

যেখানে তাহারা নামিল, সে আর এক রাজার রাজ্য। সেদিন সে রাজ্যে খুব ধূমধাম। রাজবাড়ীতে একটা স্বয়ম্বর সভা হইয়াছে। সভায় বিস্তর রাজপুত্র আসিয়াছে। এই রাজপুত্রেরাও সেখানে উপস্থিত হইল। বানর-রাজপুত্রও সভার আশে পাশে ঘুরিতে লাগিল।

সেই সময়ে রাজার প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করিলেন—রাজ-সিংহাসনের সম্মুখে এই যে পাথরখানা পড়িয়া আছে, এইখানা যে তুলিতে পারিবে তাহার সহিত রাজকন্যার বিবাহ দেওয়া হইবে।

খুব বলবান চারিজন পালোয়ান এই পাথরখানা সেখানে রাখিয়াছিল। কাজেই সেখানা যে কতটা ভারী তাহা বুঝা যাইতেছে। কত লোক সে পাথরখানা তুলিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু কেহই পারিল না। দুই একজন উহাকে একটু নড়াইয়াছিল বটে, কিন্তু তুলিতে কেহই পারিল না। যখন সকলে পাথর তুলিবার আশা ছাড়িয়া দিল, এবং মন্ত্রী আবার সেই ঘোষণাপত্র পাঠ করিলেন, তখন বানর-রাজপুত্র এক লাফে উপস্থিত সকলকে ডিঙ্গাইয়া সিংহাসনের নিকটে আসিল। সে দুই হাতে সেই পাথরখানা লইয়া বার দুই লোফালোফি করিল; তার পর সেটাকে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

প্রশংসারবে চারিদিক পরিপূর্ণ হইল। রাজাও আনন্দিত হইলেন। কিন্তু নূতন জামাইয়ের চেহারা দেখিয়া তাঁহার মনে খুবই দুঃখ হইল। তবে তাহা কাহাকেও জানিতে দিলেন না। তিনি বানর-রাজপুত্রকে সিংহাসনের কাছে ডাকাইয়া আনিয়া বসাইলেন এবং নিজ কন্যাকে আনিতে বলিলেন।

এদিকে রাজকন্যা যখন শুনিল যে, বানরের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে, তখন অত্যন্ত দুঃখে সে কাঁদিতে লাগিল। সেইজন্য রাজা নিজেই কন্যার কাছে আসিলেন এবং বলিলেন, —মা তুমি কাঁদিতেছ কেন? দেখ, সকলের সমক্ষে সভার মাঝে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিলে আমার নিন্দা রাখিবার ঠাঁই থাকিবে না। তোমার ভাগ্যে বানর-স্বামী হইল বটে, কিন্তু সে বড় বলবান।

এই বলিয়া রাজা কন্যাকে রাজসভায় আনিলেন এবং বানর-রাজপুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন।

রাজার পার্শ্বে উচ্চ বেদীর উপরে বসিয়া বানর-রাজপুত্র তাহার ভাইদিগকে দেখিতে পাইল এবং তাহাদিগকে নিকটে ডাকাইয়া আনিল। রাজার সহিত তাহাদের পরিচয় করাইয়া দিবার সময়ে তাহারা যে আভার রাজার পুত্র এ কথা জানাইয়া দিল।

তখন রাজার খুব আনন্দ হইল; তিনি কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—তোমার স্বামী কেবল বলবান নয়, একজন রাজপুত্রও বটে। কিন্তু কন্যার দুঃখ ইহাতেও দূর হইল না।

কয়েক দিন পরে ছয় রাজপুত্র বিদায় লইল এবং বানর-রাজপুত্রও রাজকন্যাকে লইয়া ছয় ভ্রাতার সঙ্গে জাহাজে উঠিল।

৫

অনেক দিন ধরিয়া তাহাদের জাহাজ সমুদ্রে চলিতে লাগিল। তার পর একটী দ্বীপ দেখিতে পাইয়া সেইখানে জাহাজ লাগাইল।

এই দ্বীপে এক রাজকন্যার বাস। তাহার বিবাহ হয় নাই। সে যে কেবল সুন্দরী তাহা নয়; অনেক রকমের মন্ত্র-তন্ত্র ও ঔষধপত্র সে জানিত।

একদিন খুব ভোরের বেলা বানর-রাজপুত্রের মনে হইল, দ্বীপের ভিতরটা দেখিতে হইবে। যেমন মনে হওয়া, অমনি সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। তখন অন্যান্য রাজ-পুত্র ও নাবিকদের ঘুম ভাঙ্গে নাই। বানর-রাজপুত্র দ্বীপে নামিয়া একটু দূরে একটী কূপ দেখিতে পাইল।

কূপের কিছু তফাতে এক প্রকাণ্ড বাড়ী! সেই বাড়ীতে রাজকন্যা থাকে। রাজকন্যাও খুব ভোরে উঠিয়া জানালার ধারে বসিয়াছিল। এমন সময়ে সে দেখিল, একটা বানর তাহার গায়ের চামড়া যেমন করিয়া জামা খুলে তেমনই করিয়া খুলিয়া ফেলিল। অমনই তাহাকে মানুষের মত দেখাইতে লাগিল। কি সুন্দর তাহার রূপ, কি চমৎকার তাহার দেহের বাঁধুনি! রাজকন্যা তাহাকে দেখিয়া মোহিত হইল। কিন্তু বাড়ী হইতে কূপের নিকট পৌঁছিবার আগেই সে দেখিল মানুষটী আবার বানর হইয়াছে।

রাজকন্যা ইহা দেখিয়া বিচলিত হইল না। সে শীঘ্রই বুঝিল, কেহ মন্ত্রের দ্বারা ইহার এইরূপ অবস্থা করিয়াছে। এইজন্য তাহাকে রাজকন্যা ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল, সে ভালবাসা একটুও কমিল না। সে বানর-রাজপুত্রের সহিত দেখা করিল। দুইজনে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। দুইজনেই দুইজনকে ভালবাসিয়া ফেলিল। তার পর তাহাদের বিবাহ হইল; সাক্ষী রহিলেন দেবতা। বিবাহের পর সেই নূতন রাজকন্যাকে লইয়া বানর-রাজপুত্র জাহাজে উঠিল এবং স্বদেশ যাত্রা করিল।

জাহাজে দুই রাজকন্যারই সাক্ষাৎ হইল। কেহ কাহাকেও চিনে না। কিন্তু প্রথমা রাজকন্যার চেয়ে দ্বিতীয়া রাজকন্যা বেশী বুদ্ধিমতী ছিল। সে প্রথম রাজকন্যাকে দেখিয়াই বুঝিল, ইহার মনে সুখ নাই। রাজপুত্র আবার বিবাহ করিয়াছে বলিয়াই তাহার মনে দুঃখ হইয়াছে, দ্বিতীয়া রাজকন্যা এরূপ অনুমান করিয়া লইল ও কি প্রকারে সে প্রথমা রাজ-কন্যার ভালবাসা পাইতে পারে তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল।

প্রথমা রাজকন্যা তাহাকে বলিল—ভাই! রাজপুত্র যে আবার তোমাকে বিবাহ করিয়া-ছেন এজন্য আমার একটুও দুঃখ হয় নাই। আমি এতদিন একেলা ছিলাম, তুমি আমার দোসর হইলে, ইহাতে বরং আমি খুব খুসী হইয়াছি। আমার যে বানরের সঙ্গে বিবাহ হই-য়াছে, ইহারই জন্য আমার যত দুঃখ।

দ্বিতীয় রাজকন্যা হাসিতে হাসিতে বলিল,—এই জন্যই যদি তোমার দুঃখ হইয়া থাকে,

তাহা হইলে তোমার সে দুঃখ আর থাকিবে না। তুমি ত ভাই রাজপুত্রকে বানর-রূপেই দেখিয়াছ, কিন্তু রাজপুত্র বানর নয়, মানুষ। তাহার এমন সুন্দর চেহারা যে, দেখিলেই মোহিত হইতে হয়। তাহার ভাইদের চেয়ে সে অনেক বেশী সুন্দর। রোজ স্নান করিবার সময়ে বানরের চামড়া তাহার দেহ হইতে খসিয়া পড়িয়া যায়; তখন রাজপুত্রের সেই সুন্দর মূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়ে। সেই সুন্দর ধবধবে চেহারা দেখিয়াই ত আমি তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছি। নিশ্চয়ই কোনও দুষ্ট লোক মন্ত্রের সাহায্যে রাজপুত্রকে বানর সাজাইয়া রাখিয়াছে। এই মন্ত্রকে ব্যর্থ করিতে পারিলেই রাজপুত্র মানুষ হইবে এবং আমরাও সুখী হইব।

ইহার পর তাহারা দুইজনে পরামর্শ করিয়া একটা উপায় স্থির করিল। একদিন তাহারা গোপনে রাজপুত্রের স্নানের ঘরে লুকাইয়া রহিল। ঠিক সময়ে রাজপুত্র স্নান করিতে আসিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, স্নানের পূর্ব্বেই বানরের চামড়া তাহার দেহ হইতে খসিয়া পড়িয়া গেল। রাজপুত্র পিছন ফিরিয়া স্নান করিতে লাগিলেন। তখন দুই রাজকন্যাই গুপ্ত স্থান হইতে বাহির হইয়া পড়িল। দ্বিতীয়া রাজকন্যা মন্ত্র-তন্ত্রও জানিত। সে তাড়াতাড়ি সেই চামড়াখানা লইয়া আগুনে ফেলিয়া দিল। চামড়াখানা যত পুড়িতে লাগিল, রাজপুত্র তত যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করিল। তাহান সমস্ত শরীরে ফোস্‌কা উঠিল। কিন্তু দ্বিতীয় রাজকন্যা একটা ঔষধ পূর্ব্ব হইতেই তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছিল; সেই ঔষধ দুই রাজকন্যাতে মিলিয়া রাজপুত্রের দেহে মাখাইয়া দিল। ঔষধের এমনই গুণ—শীঘ্রই সকল যন্ত্রণা দূর হইল এবং ফোস্‌কাগুলাও আর থাকিল না। রাজপুত্র সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল।

রাজকন্যারা তাহাদের স্বামীকে সুরূপ সুন্দর মনুষ্য হইতে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। তাহার ভাইদেরও আনন্দের সীমা থাকিল না।

ইহার কয়েক দিন পরেই তাহাদের জাহাজ তাহাদের দেশে—আভারাজ্যে আসিয়া লাগিল। তখন রাজবাড়ীতে খবর গেল এবং খুব জাঁকজমকে তাহাদের অভ্যর্থনা হইল।

বৃদ্ধ রাজার মৃত্যুর পর এই বানর-রাজপুত্রই রাজা হইল এবং দুই রাণী লইয়া সুখে রাজত্ব করিতে লাগিল।

ইতিহাস।

ইতিহাসের জ্ঞান জাতীয় উন্নতির প্রথম সোপান। যে পরিমাণে অতীত জগৎ সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য আবিষ্কার করিব, যে পরিমাণে অতীতের উপদেশগুলি বর্ত্তমানে লাগাইতে পারিব, সেই পরিমাণে আমাদের জনগণ-মন উচিত পথে ধাবিত হইবে, আমাদের সমবেত শক্তি ফল প্রসব করিবে। আর, যে পরিমাণে আমরা অসত্য বা অর্দ্ধসত্য লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব, সেই পরিমাণেই আমাদের জাতীয় উন্নতিতে বাধা পড়িবে, জনসমষ্টির শ্রম বিফল হইবে।

ইতিহাস কাব্য নহে। চিত্তবিনোদক ললিত আখ্যান অথবা শুষ্ক গবেষণাই ইহার চরম ফল নহে। অধ্যাপক সীলী সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন, রাষ্ট্রনেতার, সমাজনেতার পক্ষে ইতিহাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক, পথ-প্রদর্শক মহাবন্ধু। ইতিহাসের সাহায্যে অতীত কালের স্বরূপ জানিয়া সেই জ্ঞান বর্ত্তমানে প্রয়োগ করিতে হইবে। দূরবর্ত্তী যুগে বা দেশে মানবভ্রাতারা কি করিয়া উঠিলেন, কি কারণে পড়িলেন, রাজ্য সমাজ ধর্ম্ম কিরূপে গঠিত হইল, কি জন্য ভাঙ্গিল, সেই তত্ত্ব বুঝিয়া আমাদের নিজের জীবন্ত সমাজের গতি ফিরাইতে হইবে। অতীত হইতে উদ্ধার করা সত্য ও দৃষ্টান্তের দীপশিখা আমাদেরই ভবিষ্যতের পথে রশ্মিপাত করিবে। ইহাই ইতিহাসচর্চ্চার চরম লাভ।

মহাকবিদের সম্বন্ধে সত্যই বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা অমরধামে গমন করিবার পরও পৃথিবীতে নিজ নিজ আত্মা রাখিয়া গিয়াছেন, যাহা হইতে আমরা শিখি—

ব্যক্তিগত গৌরব কি? লজ্জার বিষয় কি?

লোকে কিসে বল লাভ করে, কিসে পঙ্গু হয়? (কীটস্।)

সেইরূপ, আমরা বলিতে পারি যে, প্রকৃত ঐতিহাসিক জনসঙ্ঘকে, ব্যক্তিসমষ্টিকে শিখান, কিসে জাতীয় উত্থান পতন, রোগ স্বাস্থ্য, নবজীবন লাভ ও মৃত্যু ঘটে। এই মহাশিক্ষতন্ত্র, এই জাতীয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রসাধনা বিনা, সত্যনিষ্ঠা বিনা ক্রমোন্নতির অদম্য স্পৃহা বিনা লাভ করা সম্ভব নহে।

শ্রীযদুনাথ সরকার।

‘অর্ঘ্যে’র নিয়মাবলী।

‘অর্ঘ্যে’র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহর ও মফস্বল সর্ব্বত্র এক টাকা। ভিঃ পিঃতে লইলে ইহার উপর এক আনা অতিরিক্ত কমিশন লাগে।

‘অর্ঘ্যে’র জন্য প্রবন্ধ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দিবার নিয়ম নাই। লেখকেরা নকল রাখিয়া প্রবন্ধ পাঠাইবেন।

টাকা-কড়ি, প্রবন্ধ, বিনিময়ের কাগজ এবং চিঠিপত্র নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নামে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন,

অর্ঘ্য-কার্য্যালয়,

৫৩ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

PRINTED AND Published BY S. C. PALIT,

At KARUNA PRESS,

Baranashi Ghosh Street, Calcutta.

ARGHYA, REG. NO. C 691.

১ম বর্ষ] [৩য় সংখ্যা।

আষাঢ় ১৩২৫] [July, 1918.

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন শ্রীসুরেশচন্দ্র পালিত, বি-এল্

কার্য্যালয়—৫৩ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

'অর্ঘ্যে'র নিয়মাবলী।

'অর্ঘ্যে'র অগ্রিম বার্ষিক মুল্য সহর ও মফস্বল সর্ব্বত্র বার আনা। ভিঃ পিঃতে লইলে ইহার উপর এক আনা অতিরিক্ত কমিশন লাগে।

'অর্ঘ্যে'র জন্য প্রবন্ধ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দিবার নিয়ম নাই। লেখকেরা নকল রাখিয়া প্রবন্ধ পাঠাইবেন।

টাকা-কড়ি, প্রবন্ধ, বিনিময়ের কাগজ এবং চিঠিপত্র নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নামে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন,
অর্ঘ্য-কার্য্যালয়,
৫৩ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমেরিকায় আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক ক্ষমতায়
প্রস্তুত।

মেহ, প্রমেহ প্রদর, বাধক, অজীর্ণ, অম্ল, পুরুষত্বহানি, ধাতুদৌর্ব্বল্য, বহুমূত্র, অর্শ, বাত, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি ব্যাধি মন্ত্রের ন্যায় আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা, মাশুলাদি ।৵০ আনা।

বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত অলৌকিক
শক্তিসম্পন্ন সালসা।

সাধারণতঃ ইহা রক্তপরিষ্কারক, বিশুদ্ধ রক্ত-উৎপাদক, পারদ এবং উপদংশ বিনাশক, বলকারক, আয়ুবর্দ্ধক সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ ও রক্তদুষ্টিজনিত বাত প্রভৃতি নানাপ্রকার জটিল রোগ এবং পুরাতন মেহ, প্রমেহ, প্রদর প্রভৃতি দূর করিতে ইহা অদ্বিতীয়। সুস্থ শরীরে ইহা ব্যবহার করিলে শরীরের স্ফূর্ত্তি এবং মুখের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ১।৷০ টাকা, মাশুলাদি ।৵০ আনা।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি ডি হাজরা,

কড়েপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

বিনা পানে গহনা

আমরাই প্রথম আবিষ্কার করি—আমাদের দেখাদেখি অনেকে এই পথে আসিলেন কিন্তু কাজে ও কথায় কেহই ঠিক রাখিলেন না। উপস্থিত আমরা বহু গবেষণায় ও অধ্যবসায়ের ফলে নূতন প্রকারে যাবতীয় গহনা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এখন হইতে আর পান মরা আদৌ বাদ যাইবে না। আমাদের প্রস্তুত অলঙ্কার ফেরৎ দিয়া নূতন অলঙ্কার নির্ম্মাণ করাইলে কেবল পুরাতন গহনা পাঠাইলেই চলিবে আমরা কেবল মজুরী চার্জ্জ করিব। অর্থাৎ কেবল মজুরীর টাকা ক্ষতি সহ্য করিলেই নানাবিধ নূতন নূতন ডিজাইনের অলঙ্কার তৈয়ার করিতে পারিবেন। স্বর্ণের দরুণ এক পয়সাও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না।

সাবিত্রী শাঁখা।

পূজার আনন্দ—রমণীর শোভাসম্পদ
এবং সুলভ অলঙ্কার।
মূল্য মায় মজুরী ১৪৲ টাকা মাত্র।

অঙ্গুরী।

মূল্য ১২০৲ হইতে।

কুমারী মাকড়ী।

মূল্য ৬।৹ টাকা মাত্র।
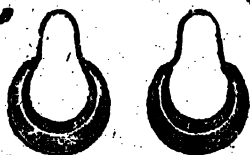
ফেঞ্চ মাকড়ী।
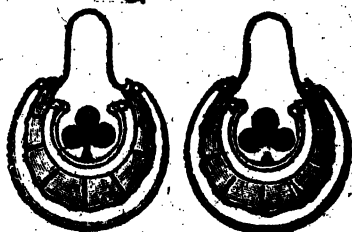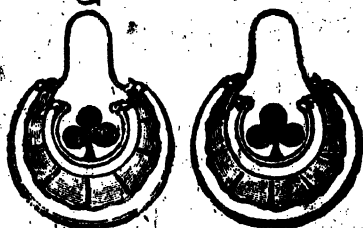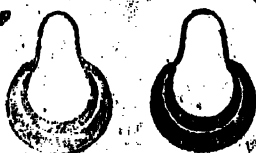
পূজার নূতন আবিষ্কার।
প্রমাণ মাকড়ী মূল্য ১৫৲ টাকা।
মাঝারি সাইজ মূল্য ১১৲ টাকা।

মণিলাল এণ্ড কোং,
জুয়েলার্স, ব্যাঙ্কার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চ্চেন্টস্।
৪০ নং গরাণহাটা, কলিকাতা। টেলিগ্রাম্স—নেকলেস।

অর্ঘ্য

৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩২৫।

নিরক্ষর কবির গ্রাম্য কবিতা।

এদেশের ভাট, কবিওয়ালারা অনেকেই পুঁথির বিদ্যায় পণ্ডিত নহেন; অথচ ইঁহাদের অনেকেই কবির টপ্পা, ভাটের গান, হোলির গান, গ্রাম্য সামাজিক আন্দোলন প্রভৃতিতে কবিতা-রচনায় পটু। ইঁহাদের ভাষা অনেক স্থলেই মার্জ্জিত নহে; বরং অশ্লীল ও গ্রাম্যতা-দোষদুষ্ট। তথাপি ইঁহাদের কবিতায় অনাড়ম্বর জীবন ও সরল হৃদয়ের যে চিত্র ফুটিয়া উঠে, তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আমরা এস্থলে এরূপ কয়েক জন নিরক্ষর গ্রাম্য কবির কবিতা সংগ্রহ করিয়া দিতেছি। অনেক সময়ই এই সকল গ্রাম্য কবির কোন সন্ধান মিলে না—ইঁহাদের কবিতা প্রায়ই কৃষক প্রভৃতি জনসাধারণ উন্মুক্তকণ্ঠে পথে ঘাটে মাঠে গাইয়া বেড়ায়। আমাদের পণ্ডিত মহাশয়েরা এই সকল রচনাকে ভ্রমেও গীতিকবিতা বলিবেন না জানি। ছন্দদোষ বা পাণ্ডিত্যবুদ্ধিতে ভাষাবিচার করিলে উহাদের প্রকৃত রসাস্বাদ করা যায় না। পক্ষান্তরে, এই সকল গ্রাম্য নিরক্ষর কবির কবিতাকে গ্রাম্য গীতি-কবিতা সংজ্ঞায় সহজেই অভিহিত করিতে পারা যায়।

৪।৫ বৎসর অতীত হইল, ঢাকা জেলায় সেটলমেণ্টের কাজ আরব্ধ হয়। সেটলমেণ্টের জরীপের লাইন যে যে পথ দিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা পরিষ্কার রাখিতে হইবে—সেটলমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ আদেশ ছিল। অনেক স্থলে এ সকল গ্রাম্য পথ বেতসলতায় সমাচ্ছন্ন ছিল—আর এই বেতস-কুঞ্জে থাকিত শিয়াল, ডাহুক প্রভৃতি গ্রাম্য পশুপক্ষী। সেটলমেণ্টের দৌরাত্ম্যে বেতস-কুঞ্জ তিরোহিত হইল—ইহাতে শিয়াল, ডাহুক প্রভৃতির বড়ই অসুবিধা হইল। তাহাদের এত দিনের বড় সাধের বাসভূমি আর রহিল না, তাহারা পথে দাঁড়াইল। গ্রাম্য কবির চক্ষে এ দৃশ্য নূতন, সহানুভূতির চক্ষে তিনি ইহাতে যেন কেমন মর্ম্মদাহী সৌন্দর্য্য অনুভব করিলেন—আর তখনই নিরক্ষর গ্রাম্য কবির হৃদয় মথিত করিয়া সঙ্গীত উঠিল—

"শিয়ালনী কয় থাকৃবি কোথা বল,
সেটলমেণ্টের জরীপ এসে কাট্‌লো ঝোড়-জঙ্গল।
খাটাস, দীঘলাজ, কেন্দে বলে রাজার কাছে চল॥
দরখাস্ত দিয়া মোরা জানাইগে সকল।
ঘুঘু পাখী কেন্দে বলে, আমার বাসা বেথাইক (১) বনে আমার অমঙ্গল।
হাইয়ো খোকা, ডাহুক পাখীর চখে পড়ে জল,
ভাই আণ্ডা বাচ্চা মইল রে (২) সকল।
বানরে কয় ভাল হইছে, লটকা গাছে, হেলান বাঁশে আমার চলাচল।
আমার বাড়ীর লামা (৩) দিয়া টাইনা (৪) নেয় শিকল
দেখরে আমিনরা সকল।
শূয়রে কয় বাচ্চা নিয়া যাই কোথায় বল বিপক্ষ সকল।
সেজার বলে আমার মাংস অতি সু-সুন্দর (৫)
আমার মাংস খেলে পরে জিভায় পড়ে জল।
শিয়ালনী কয় থাকৃবি কোথায় বল। (ধুয়া)

গ্রাম্য কবির এই সকল কবিতা সঙ্গীতে গেয়। যে স্থলে ছন্দ-পতনের সম্ভাবনা আছে, সে স্থলে সুরটা একটু বাড়ান কমান হয়। সুতরাং ছন্দদোষ হইলেও কাণে বড় বাজে না।

যখন অনাড়ম্বর, সরল-হৃদয় কৃষক মুক্তকণ্ঠে এই গান ধরে, গ্রাম্য পশু-পক্ষীর দুর্দ্দশার চিত্র আঁকে, তখন কবিতার বিষয়-বৈচিত্র্যে একটুকু হাস্যরসের উদ্রেক করিলেও গ্রাম্য কবির সারল্য ও সঙ্গীতের সুর হৃদয় স্পর্শ করে।

এখন আমরা গ্রাম্য কবিকে লইয়া আধুনিক সভ্যতা-দৃপ্ত পল্লী-ভবনের অন্তঃপুরে যাইব। নাগরিক সভ্যতার গৃহকর্ম্মে উদাসীনা, অথচ আধুনিক প্রণালীতে সুশিক্ষিতা এবং একান্নভুক্ত পরিবারের পল্লীগৃহস্থবধূর ব্যবহারে গ্রাম্য কবির হৃদয় কিরূপ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে তাহার কবিতাতেই সে চিত্র পরিস্ফুট।

"এখনকার বউরাণী গো, কোন কথা বলা যায় না।
এক বউ কয় আর বউর কাছে, বুইড়াবুড়ী ঘরে আছে
উহাদের জ্বালাতনে সখ চলে না।
সকলে মরে ওলাউঠায় বুইড়াবুড়ী কেনে মরে না॥

---

(১) বেতস বা বেত; (২) মরিল রে; (৩) নীচ; (৪) টানিয়া; (৫) অতীব সুন্দর।

শ্বশুর-শ্বাশুড়ীগণে, তৃণসম নাহি গণে
চকুলি (১) কয় পতির কানে
উহাদের জ্বালাতনে সখ চলে না।
ভাগ-ভিন্ন করে দেওহে নাথ, ঘুচাও আমার এ যন্ত্রণা।
রজনী প্রভাত কালে, গোবর দেওয়ার সময় হ'লে,
ডাক পাড়ে বউ গোবর কেনে দেও না।
আমি ছেলে ল'য়ে শুয়ে আছি গোবর কেনে এনে দেও না॥
এখনকার বউরাণী গো কোন কথা বলা যায় না।
গিয়েছে কালীর রেখা, ভেঙ্গেছে হাতের শাঁখা
ভালে সিন্দুরের রেখা বারেক দেয় না।
তারা লজ্জার মাথায় দিয়ে পাড়া, ঘুচায়েছে ঘুমটার টানা।
এখনকার বউরাণী গো কোন কথা বলা যায় না।
মধ্যাহ্নে সময় হ'লে, শ্বাশুড়ী ডাক পাড়ে (২),
বউ ভাত খেলে না।
আমার যখন ইচ্ছা, তখন খাব,
তোমার ভাত কেনে (তুমি) খেয়ে যাও না।
এখনকার বউরাণী গো কোন কথা বলা যায় না।
ভাত খেয়ে কর্ত্তা শুয়ে থাকে,
শ্বাশুড়ী ডাক পাড়ে বউ, পান খেলে না—
আমি ভাত খেয়ে শুয়ে আছি, পানটা কেনে এনে দেও না।
আমি শাদার গুড়ি (৩) দেই নাই মুখে, শাদা পূরে (৩) এনে দেও না।
এখনকার বউরাণী গো কোন কথা বলা যায় না।
পুতের পয়সা খরচ কালে হিসাব লয় ষোল গুণে
বলে, আমার স্বামীর পয়সা খরচ হ'ল তুমি ত তা বুঝ না।
তোমার মত ব্যাকুব (৫) মানুষ আর হবে না।
এখনকার বউরাণী গো কোন কথা বলা যায় না।
তারা মনের মত যেতে চেলে (৬) শ্বাশুড়ী মানা করলে,
তারা বলে তোমার কথা আর শুনব না,
রামচন্দ্র হেসে বলে, কলিকালে
ঝি বউ মানা আর করো না।
এখনকার বউরাণী গো আর কোন কথা বলা যায় না।"

(১) ছড়া; (২) ডাকে; (৩) শাদা বা তামাক পাতা; (৪) পুরিয়া; (৫) বোকা; (৬) চাহিলে।

কেমন সুন্দর চিত্র! সঙ্গীতে ইহা আরও উপভোগ্য। পল্লী-গৃহস্থের গৃহে গৃহিণীর কর্ত্তব্য অনেক। প্রাচীনা ও নবীনার হিসাবে এ কর্ত্তব্য-বোধেও পার্থক্য রহিয়াছে। পাঠক, শ্বাশুড়ী ও বউরাণীর এই বিচিত্র চিত্রে তাহারই সন্ধান পাইবেন।

এবার গ্রাম্য কবির রন্ধনশালায় ডাক পড়িয়াছে। ইলিশা মাছের দিনে গ্রাম্য কবির মুখে ইলিশা মাছের 'কাব্যরসাস্বাদ' না করিলে পাপ লিখে কি না জানি না, অন্ততঃ ভাল দেখায় না। এবার গ্রাম্য কবির ইলিশা মাছের পালা।

"ইলিশা উঠিয়া বলে, খলিশারে ভাই,
তুমি যাও বিলে খালে, আমি উজান যাই
মাছ ইলিশারে।
কুটনী পাগল মাছ ইলিশারে,
রাধনী পাগল মাছ ইলিশারে,
ইলিশা রান্ধে লো বউ সম্ভার বাগাড় দিয়া,
সেই না ইলিশা মাছের গন্ধ গেল, জাহাঙ্গীর নগর (১) দিয়া,
ইলিশা মাছ ভাজে বউ, আড়ে আড়ে চায়,
এই ইলিশার লেজা জানি কার পাতে যায়।
ইলিশা রাঁধিয়া বউ একখান খেতে চায়,
শাশুড়ী ননদী বউ খোটারে (২) ডরায়।
অম্বল রাঁধিয়া বউ এদিক ওদিক চায়,
এ অম্বলের ডিমটুকু জানি কার পাতে যায়:
মাছ ইলিশারে। (ধূয়া)

কৃষকের উন্মুক্ত প্রান্তরে শস্যশ্যামল হরিৎ-ক্ষেত্রে এবার আমরা গ্রাম্য কবির দর্শন পাইতেছি। গ্রাম্য কবি এক ভাবুক কৃষককে লইয়া বিব্রত। রামপ্রসাদের মত তাহার কৃষকও বুঝি ভাবে—"এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা।" গ্রাম্য কবির কৃষক খেত (ক্ষেত্র) নিড়াইতে নিড়াইতে গাইতেছে—

গুরু গোসাইর (৩) খেত নিড়াইতে
কাচি আইনা (৪) দিল হাতে।
পারলাম না তাঁর খেত নিড়াইতে

(১) ঢাকা; (২) নিন্দা; (৩) গোস্বামীর; (৪) আনিয়া।

ঘাস ফেলাইতে ফেলাইলাম ধান
অনুমানে ভাবি অনুমান।
আমি না জানি সে ভজনের সন্ধান,
অনুমানে ভাবি বর্ত্তমান।
গুরু ভজবি ব'লে সংসারেতে এলি
মিছা মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে সে কথা ভুলিলি।
যখন এসে ধরবে ঘাড়ে,
থাকতে নারবি জাড়ে জোড়ে,
কড়ায় গণ্ডায় হিসাব লবে,
সাক্ষী দিবে তোর ঐ ছয় জনে।
মহাজন তোর পড়ে না মনে,
হুস নাই তোর, বেহুসারি কেনে,
মহাজন তোর পড়ে না মনে।
মালভরা ধন সিন্দুকেতে,
হারালি মন পলকেতে,
চাবি ধন পরেরি হাতে।
তুই যে উল্‌টা কলে, সদাই ফিরে,
পৃথিবীতে উজান ধরে, চিন্‌লি না তাঁরে।
গুরু যে ধন দিয়াছে তোরে চিন্‌লি না তাঁরে॥

কৃষকের এ গীত ফুরাইতে না ফুরাইতেই বেচারা কৃষাণের কথায় আমরা আকৃষ্ট হইলাম। বেচারা কৃষাণেরও একটু কবি-হৃদয় ছিল—ভাবুকতার ডোরে আবদ্ধ বেচারা কৃষাণ খেত নিড়াইতে বসিয়াও ভাবিতেছে—কি নিড়াই; প্রকৃতির ভাণ্ডারে ত নিরর্থক কিছুই নাই; তবে নিড়াইয়া ফেলিব কি? গ্রাম্য কবির মুখে কৃষাণের মনের কথা শুনুন।

শোলা (১) ত ধানের পোলা (২)।
আওলিয়া (৩) ত ধানের নাতি।
ভাদালিয়া (৪) ধরছে জাতি।
সোনা দুর্ব্বা (৫) তলে তলে (৬) বায়া (৭)
মশায়, কারে আর ফেলান যায়।

বাড়ী ফিরিবার পথে, গ্রাম্য কবিকে প্রান্তরের এক কোণে বসিয়া আবার

(১) শালিধান; (২) পুত্র; (৩) ও (৪) ঘাস; (৫) অন্ধকারে থাকায় দুর্ব্বার হরিৎ বর্ণ, তাই সোণা দুর্ব্বা; (৬) নীচে; (৭) লতায়।

কচুরির (১) পান বাধিতে শুনিলাম। প্রান্তরের পার্শ্বে একটা ছোট খাল এবং প্রান্তরের মধ্যে স্থানে স্থানে ছোট ছোট বিল। ইহারা সকলেই কচুরিতে শ্যামায়মান। গ্রাম্য কবির দৃষ্টি এবার নবাগত কচুরির শ্যামসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইল। গ্রাম্য কবি কচুরির দোষগুণ-বর্ণনায় হৃদয়ের উৎস খুলিয়া দিল।

"একি হ'ল যন্ত্রণা, দুঃখে আর প্রাণ বাঁচে না।
দারুণ কচুরী এল দেশে।
নীলা (২) ফুলের বড়া খেতে
বড় মজা লাগে তাতে
অন্য কিছু তাতে লাগে না।
কাঁচা পাতা খেলে পরে গলা কিন্তু তাতে ধরে,
মূল খেলে প্রাণে বাঁচে না।
মেম সাহেব ভালবেসে কচুরী আন্‌লো দেশে,
এখন দেশের দশা চেয়ে দেখ না।
কচুরীর যন্ত্রণাতে, লোকে নাহি পারে চলতে,
হাট বাজার তারা করতে পারে না।
কচুরী দেশে এনে, গরীব লোক মৈল (৩) প্রাণে
নৌকা বহিতে তারা পারে না।
একি হ'ল যন্ত্রণা, দুঃখে আর প্রাণ বাঁচে না। (ধুয়া)।

বাড়ী ফিরিয়াও গ্রাম্য কবির 'নিস্তার' নাই—কবি টিনের ঘরে ও ছনের ঘরে লড়াই বাধাইয়া ফেলিয়াছে। কবি গাহিতেছে—

টিনের ঘরে, ছনের ঘরে, দু'জনাতে ঝগড়া করে।
কারো কথা কেউতো শুনে না।
টিনে বলে আমি বড়, ছনে বলে বিচার কর ইত্যাদি।

ঝগড়া থামিতে না থামিতেই কবি-গৃহে সন্ধ্যা-সুন্দরী আসিলেন। আর সঙ্গে আসিল—মশক। মশকের উৎপাতে বিব্রত গ্রাম্য কবি তখন সুর ধরিয়াছে—

"মশার কামড়ে, ডাকি মা তোমারে,
কেন কালী শুন না।
যেখানে কামড়ায় সেখানে ফুলে
দন্ত বসাইয়া রক্ত শোষে,
আর ত দুঃখ সহে না

(১) Water Hyacinth ; (২) নীল ; (৩) মরিল।

মশার কামড়ে, ডাকি মা তোমারে,
কেন কালী শুন না।

গ্রাম্য কবি নিজের কর্ম্মের কথা বলিতে গিয়া গৃহিণীর কর্ম্মও ভুলিতে পারে নাই। গৃহিণীও কোথাও মশার উৎপাতে তিষ্ঠিতে পারিতেছে না। গ্রাম্য কবি গৃহিণীর এ দুর্দ্দশার চিত্রও আঁকিয়াছেন।

ওরে মশা পাগল করিলি।
বনের মশারে।
মশার কামড়েরে গেলাম বাপের বাড়ী,
তথাপি দারুণ মশা চল্‌লো সারি সারি।
মোরে পাগল করিলি বনের মশারে।
মশার কামড়েরে টানাইলাম ঘোনা (১)।
ঘোনার তল থাইকা (২) মশা করছে আনা গোনা।
মোরে পাগল করিলি বনের মশারে।
মশার কামড়েরে ফাল (৩) দিয়া উঠলাম ঝাড়ে
তথাপি দারুণ মশা সঙ্গে সঙ্গে ফিরে।
মোরে পাগল করিলি বনের মশারে।" (ধুয়া)

এ সব ব্যাপারে একটু রাত্রি বেশী হইয়া পড়িল, তখন গ্রাম্য কবির সাধন-ভজনের সময়। আমাদের গ্রাম্য কবির ধর্ম্মজীবনের কথাও আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। পল্লীগ্রামে ত্রিনাথের পূজা হয়। গ্রাম্য কবি ত্রিনাথের পূজায় বসিয়াও স্তোত্র (পাঁচালী) আওড়াইতে কুণ্ঠিত নহে। গ্রাম্য কবি ভক্তি-বিনম্র সুরে, যুক্তকরে বলিতে লাগিল।

"ত্রিনাথ ঠাকুর কলিতে
আচ্‌কা (৪) জীবন উদয় হলেন,
নবীপুরের বাড়ীতে।
এক পয়সার পান-সুপারি,
আর এক পয়সার গাঁজা,
আর এক পয়সার তেল দিয়াই
তিন বাত্তি সাজা।
(সাধুরে ভাই)
আমার ঠাকুর ত্রিনাথ যেবা করে হেলা।
হাত পা তার কুকড়ি মুকড়ি (৫) চখের বাইরয় (৬) ঢেলা (৭)
(সাধুরে ভাই)।"

---

(১) মশারি; (২) নীচ, (৩) লাফ। (৪) হঠাৎ; (৫) আড়ষ্ট; (৬) বাহির হয়; (৭) আঁখি-তারা।

আপাততঃ আমরা গ্রাম্য কবিকে ঐখানেই বিদায় দিতেছি। সময় হইলে আবার তাহার মুখে ভাবের গান, বাউল-সঙ্গীত, হোলীর গান, জারীর গান, শা-মাদারের গান, নীলপূজার গান, কবির টপ্পা, ভাটিয়াল গান, সামাজিক আন্দোলনের গান প্রভৃতি শুনিয়া লইব। পল্লীগ্রামের সাধারণ লোক কি ভাবে এ সকল গানে বা কবিতায় কর্ম্মক্লান্ত দেহ জুড়ায়—আরও কত শত প্রকারের কাব্যামৃত রসাস্বাদে হাটে মাঠে ঘাটে পল্লীজীবন সুধাময় করিয়া তোলে আর এক সময় আমরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। গ্রাম্য-কবি জীবনের প্রায় প্রত্যেক কার্য্যে বা দৃশ্যে কবিতা গাহিয়াছেন।

এখন আর দু' একটী কথা বলিয়া আমরাও বিদায় গ্রহণ করিব। গ্রাম্য কবির কবিতায় পাণ্ডিত্য বা ছন্দঃচাতুর্য্য নাই বলিয়া বোধ হয় কেহ আক্ষেপ করিবেন না। মানুষের সুর তাল জ্ঞান না থাকিলেও মানুষ আপনার ভাবে মজিয়া গুন্ গুন্ স্বরে স্বভাবতই গান করে। গ্রাম্য কবিরও কবিতা-রচনায় আত্মপ্রেরণাই সম্বল—গ্রাম্য কবি মনের ভাব ভাষার আবরণে কোন প্রকারে প্রকাশ করে মাত্র। গ্রাম্য কবির ভাষার তারল্যে ও হৃদয়ের সারল্যে, তাহাই বড় সুন্দর শুনায়। নিরক্ষর গ্রাম্য কবির কবিতায় ভাষা পাইব না—পাইব চাষার উদার, সরল প্রাণ। বস্তুতঃ তাহার কবিতায় খুঁজিব, কি ভাবে নিরক্ষর কবির হৃদয়ে সৌন্দর্য্যবোধ হয়, কি ভাবে গ্রাম্য কবি উচ্চারণের কাল্পনিক লঘুগুরুভেদে, সুরের খেলায় কবিতা রচনা করে।

আমরা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে অনেকাংশে পরিচিত। অশিক্ষিত লোকের মনোবৃত্তি বা তাহাদের প্রতিনিধি স্বকীয় গ্রাম্য কবির পরিচয় লইতে হইলে—গ্রাম্য কবিকে বুঝিতে হইলে—নিরক্ষর কবির এ প্রকার গ্রাম্য কবিতাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান আলোচ্য হইয়া পড়ে। শিক্ষিত সম্প্রদায় এখন পল্লীবাস ভুলিয়া দিয়া সহরবাসী হইয়াছেন; সুতরাং এরূপ অবস্থায় সাহিত্যে অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রকৃত স্বরূপ ধরিতে হইলে ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্ট আর কোন উপায় আছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। *

শ্রীগিরিজাকান্ত ঘোষ।

---

* ঢাকা সাহিত্য-সঙ্ঘতের প্রথম অধিবেশনে বিবৃত। সভাস্থলে ইহার অধিকাংশই কবিতাই গীত হইয়াছিল।

আহুতি।

(৪)

এইখানে নবকৃষ্ণ ঘোষের কিছু পরিচয় আবশ্যক। নবকৃষ্ণ ঘোষ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। খর্ব্বাকৃতি, গঠন দোহারা, মাথার সম্মুখভাগ টাকে অনেকখানি অধিকার করিয়া লইয়াছে। পশ্চাৎভাগের কেশগুলি বেশ ঘন কৃষ্ণবর্ণ। কেহ কেহ বলিত, তাহা কলপ দেওয়ার দরুণ।

নবকৃষ্ণ নিঃসন্তান। প্রথমা পত্নীর সন্তান-সম্ভাবনার কোন আশা নাই দেখিয়া, বংশরক্ষাকল্পে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ মানস করিয়াছেন এবং হিতাকাঙ্ক্ষিণী রাঙ্গাদিদি তাঁহার মানসাগ্নিতে ইন্ধন যোগাইতেছেন। তাই তিনি স্বয়ং পাত্রী জোটাইবার ভার লইয়াছেন।

প্রাতঃকৃত্যসমাপনান্তে নবকৃষ্ণ বহির্ব্বাটীতে বসিয়া তাম্রকূট সেবন করিতেছিলেন। এমন সময়ে রাঙ্গাদিদি হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। নবকৃষ্ণ হুঁকাটী রাখিয়া মনে মনে কিছু আশা করিয়া সহাস্যে কহিল—"দিদি, এত সকালে কি মনে করে ?"

রাঙ্গাদিদি। এই ভাই, তোমার জন্যেই আমার যত মাথা ব্যথা! আমার ছোট ঠাকুরদাদার বংশ লোপ হয়, কাজে কাজেই তোমার আবার বিয়ের ঠিক না করে কি আমি স্থির থাক্‌তে পারি। আজ একটী কনে ঠিক করে এসেছি।

নবকৃষ্ণ সোৎসাহে বলিল- "সত্যি নাকি ? কোথাকার মেয়ে দিদি ?

রাঙ্গাদিদি। এই আমাদের সর্ব্বেশ্বরের মেয়ে, শিবানী।

নবকৃষ্ণ। তা'রা রাজী আছে ?

রাঙ্গাদিদি কণ্ঠস্বর ঈষৎ নামাইয়া বলিল—প্রথমে রাজী হয়নি। কত করে ক্ষেপিয়ে তবে রাজী করেছি। তা' দেখ দেরী করা হবে না। হয় ত শিবে ছোঁড়া, নয় ত তোমার বউ এসে বিয়ের সময় গোল বাধাবে। আমি বলি যদি আজ বিয়ের দিন থাকে ত, আজ রাত্রেই চার হাত এক হ'য়ে যাক, কি বল ?"

নবকৃষ্ণ হাসিয়া বলিল—"সে কথা কি তোমায় বলে জানাতে হবে, দিদি।"

"তা আমি জানি" বলিয়া রাঙ্গাদিদি চলিয়া গেল।

সৌভাগ্যক্রমে সেদিন বিবাহের দিন ছিল। প্রতিবেশীবর্গের প্রতিবাদ-

সত্ত্বেও বিনা আড়ম্বরে নির্ব্বিঘ্নে সেইদিন রাত্রিতে নবকৃষ্ণের সহিত শিবানীর বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ শিবপ্রসাদ শুধু চাহিয়া রহিল, একটী কথাও কহিল না।

কুব্‌জপৃষ্ঠে মুক্তাহারের ন্যায়, শাখামৃগহস্তে মন্দারমালার ন্যায় শিবানী-প্রসূন শেষ পথের পথিক নবকৃষ্ণের কণ্ঠলগ্না হইল।

পরদিন শিবানী স্বামীগৃহে চলিয়া গেল। নিশ্চিন্তা সর্ব্বাণী প্রাঙ্গণতলে আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

(৫)

কথা চাপা থাকে না। পিত্রালয়ে থাকিয়া নবকৃষ্ণের প্রথমা পত্নী মানদা-সুন্দরী স্বামীর দারান্তর-গ্রহণের সংবাদ পাইল; বুঝিল আজ হইতে সে স্বামীর সর্ব্বস্বত্বের একাধিপত্য হইতে চিরবঞ্চিতা হইল। সব শুনিল, বুঝিল, কিন্তু কাঁদিল না। অভিমানের দারুণ উত্তাপে অশ্রু শুখাইয়া গেল। গভীর মনস্তাপের উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের সহিত ভাঙ্গা বুকের চূর্ণ অস্থির মতই তাহার মুখ হইতে বাহির হইল—"ভালই করেছে; সুখী হবে বলেই ত বিয়ে করেছে; সুখী হোক্, আমি তার সুখের পথের কাঁটা হ'ব না।"

মানদা শ্রীরামপুরে আর ফিরিবে না স্থির করিল। কিন্তু অভিমান-গর্ব্বিতা নারী তোমার কিছু আর অবশিষ্ট আছে কি, যাহা লইয়া অভিমান আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে! যে নারীত্বে আঘাত পাইয়া আজ তুমি অভিমানে আত্মহারা, সেই নারীত্বের অস্তিত্বটুকু পর্য্যন্ত যেখানে লুটাইয়া দিয়া স্বত্ব-শূন্য নিঃস্ব দেউলিয়া হইয়া বসিয়া আছ, সেখানে আর সারশূন্য ফাঁকা অভিমান কতক্ষণ টিকিতে পারে! তাই মানদা যতই আড়ম্বরের সাহিত স্বাতন্ত্র্যের অভিনয় করিতে লাগিল, ততই সে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত দেখিতে লাগিল কোথাও একটু এই স্বাতন্ত্র্যের খালি জায়গা পড়িয়া আছে কি না। কিন্তু কৈ তাহা ত সে দেখিতে পাইল না। আপন নিষ্ফলতায় আপনি গুমরিয়া মরিতে লাগিল। সে যতই বাহিরে স্বামীর ব্যবহারে উপেক্ষার ভাব দেখাইতে লাগিল, অন্তরে ততই একটুখানি আহ্বানের প্রতীক্ষায় প্রাণ ছটফট করিতে লাগিল।

মাস দুই পরে একদিন প্রাতে শ্রীরামপুর হইতে নবকৃষ্ণের প্রেরিত লোক একখানি গাড়ী লইয়া মানদার পিত্রালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিনা ওজরে মানদা গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

যথাসময়ে গাড়ী আসিয়া নবকৃষ্ণের বহিঃদ্বারে উপস্থিত হইল। আজ প্রায় তিন মাস পরে মানদা স্বামীগৃহে ফিরিয়া আসিল। স্পন্দিত বক্ষ সজোরে চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রুরাশি অতি কষ্টে সম্বরণ করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া মানদা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। শিবানী মানদাকে দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি এক ঘটী জল আনিয়া তাহার পা ধোয়াইয়া দিল। মানদার অশ্রু আর বাধা মানিল না। শিবানীকে দেখিয়া তাহার বুক ফাটিয়া কান্না বাহির হইয়া আসিল। সেই প্রাঙ্গণতলে বসিয়া মানদা অজস্রধারে কাঁদিতে লাগিল।

শিবানী বালিকা নয়, অবোধ নয়। সে ক্রমাগত আঘাতের পর আঘাত পাইয়া দরিদ্রতার পীড়ন মধ্যে এবং তাচ্ছিল্যতার আভরণেই মানুষ হইয়া অনেকটা প্রৌঢ়ের গাম্ভীর্য্য স্থির ধীর বুদ্ধি স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সংযমের দৃঢ়তায় আপনাকে খুব শক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সংসারের মধ্যে যে আপনাকে অনেকটা নিয়োক্তার নিয়োগ পালনের মত নির্লিপ্তভাবেই ছাড়িয়া দিয়াছিল। মনে তাহার যতই গুরুভাব থাক্, বাহিরে কেহ তাহার মুখে সুখ দুঃখের কোন ভাবেরই আভাষ পাইত না। সে এই বুঝিয়াছিল, এ জগতে এবার তাহার ত্যাগের পালা। সে নিজেকে বিলাইতে আসিয়াছে; সুখ তাহার জন্য নয়, তাই সে হাসিমুখে দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছিল।

কিন্তু আজ শিবানী মানদার অবস্থা দেখিল এবং তাহার নিজের দুঃখের বোঝা যত ভারী হউক তাহা ভুলিয়া গেল। নিতান্ত অপরাধিনীর মত মানদার পায়ের কাছে বসিয়া জলভরা বড় বড় চোখ তুলিয়া, ব্যথা-ভরা চাহনিতে মানদার মুখপানে চাহিয়া করুণকণ্ঠে বলিল—

"দিদি, আমি তোমার দাসী।"

শিবানী মানদার অপরিচিতা নয়। কত দিন মানদা শিবানীকে কোলে করিয়া খাওয়াইয়াছে, ছিন্ন মলিন বস্ত্র ছাড়াইয়া নিজের নূতন রঙ্গিন সাড়ী পরাইয়া দিয়াছে। কত স্নেহের কথা, কত সোহাগের কথা বলিয়াছে, কত আদর করিয়াছে, কত যত্ন করিয়াছে। একদিন এই শিবানীর জন্য তাহার মন সহানুভূতিপূর্ণ ছিল। অন্যথা শিবানী তাহার করুণার পাত্রী ছিল। আর আজ সেই শিবানী তাহার সপত্নী; তাহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী; তাহার সুখ-সৌভাগ্যের রাহু; তাহার প্রধান শত্রু। একদিন যে তাহার করুণার ভিখারী ছিল, আজ তাহারই করুণার দ্বারে সে ভিক্ষার আঁচল পাতিতে আসিয়াছে।

শিবানীর বাক্যে মানদার মন দ্রব হইল না। সর্ব্বশরীরে যেন আরও

আগুণ ঢালিয়া দিল। জ্বালাময় কণ্ঠে প্রত্যেক কথায় বিষ ঢালিয়া মানদা তীব্র স্বরে উত্তর করিল—"কাটা গায়ে আর নুনের ছিটে দেওয়া কেন? দাসী তুই আমার, না আমি এখন তোর দাসী?"

দুই হাতে মানদার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শিবানী বলিল—"ও কথা বলে আর আমার অপরাধের বোঝা বাড়াইও না, দিদি। তুমি যে আমাকে কত ভালবাস্‌তে।"

মানদা। ভালবাস্‌তাম বলেই তুই এইবার সুদে আসলে সেই ভালবাসার শেষ করবি বলে এসেছিস্।

শিবানী আর কথা কহিতে পারিল না; অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

করুণ-কাতর বিষাদমাখা বিপন্ন মুখখানির প্রতি চাহিয়া মানদার মনটা যেন কেমন একটা বেদনা বোধ করিতে লাগিল। তাকে এখন সে যত বড় দোষীই মনে করুক, এতদিন স্নেহের চক্ষেই সে তাকে দেখিয়া আসিয়াছে। শিবানী যে কি রকম মেয়ে, মানদা তাহা ভালরূপ জানিত। তাহার জন্য মানদার মনটা সর্ব্বদা স্নেহসিক্ত থাকিত। আজ সেই শিবানী সপত্নীরূপে আসিয়া তাহার নিকট যত বড় অপরাধই করুক, তার সেই রোদনারক্ত মুখখানি তাহার নারীহৃদয়কে ব্যথা দিতে লাগিল।

রাত্রে শিবানী রন্ধন করিল। নবকৃষ্ণের আহার শেষ হইলে মানদার নিকটে গিয়া তাহাকে আহার করাইবার জন্য অনেকক্ষণ বৃথা চেষ্টা করিয়া পরিশেষে অকৃতকার্য্য হইয়া শিবানী অন্নব্যঞ্জন সমস্ত গরুর নাদায় ঢালিয়া দিয়া রান্নাঘর বন্ধ করিয়া আসিয়া সপত্নীর কোলের কাছে শুইয়া পড়িল।

কিয়ৎক্ষণ উভয়ের কেহই কোন কথা কহিল না। খানিক পরে মানদা শিবানীর মাথাটা আরও বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—"তোর জীবনটা নষ্ট করে দিলেরে, শিবানী। আমি এখন তোর কথাই ভাব্‌ছি, আমার ত দিন কেটে এসেছে। জীবনের সুখ যা' তা' খুবই ভোগ করেছি, কিন্তু তোর যে সমস্ত দিন পড়ে রয়েছে। এ রূপ কি কুঁড়ে ঘরে মানায়, এ যে রাজার ঘরেরই যুগ্যি। মানুষের কি একটু দয়া মায়া নাইরে, আমি তাই ভাবছি।"

লজ্জার খাতিরে কয়েকদিন নবকৃষ্ণ পাশ কাটাইয়া বেড়াইতে লাগিল। মানদাও সে দিকে মোটেই ঘেঁসিত না। রান্নাবাড়া পাচিকার কার্য্য হইতে পরিচারিকার যাবতীয় কর্ম্ম সমস্তই শিবানী নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিল।

অবস্থাপন্ন গৃহস্থ হইলেও নবকৃষ্ণের দাসদাসী কোন কালেই ছিল না। পূর্ব্বে যাহা মানদা করিত, এখন তাহা শিবানী করে, এই মাত্র প্রভেদ। সংসারের কোন কাজই মানদা দেখিত না। মানদা কিছু না দেখিলেও, শিবানী তাহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কোন কাজই করিত না। মানদার আদেশ ব্যতীত সে এক পদও অগ্রসর হইত না। সংসার বেশ শান্তিতেই চলিতে লাগিল। তাহাতে নবকৃষ্ণ বড় তৃপ্তি বোধ করিল। মনে মনে তাহার বিলক্ষণ আশঙ্কা ছিল যে, মানদা যেরূপ প্রখরস্বভাবা, না জানি কি বিপ্লবই বাধাইবে, এখন তাহার কোন সূচনাই দেখিতে না পাইয়া মনে মনে ভারী খুসী হইল। তথাপি মানদার সহিত বাক্যালাপ করিতে সাহসে কুলাইত না। নিতান্ত অপরাধীর মত বাহিরে সময় কাটাইয়া দিত। আহারের সময় ভিন্ন তাহাকে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যাইত না। ইহাতে মানদা সন্তুষ্ট না হইলেও শিবানী খুব খুসী ছিল। তাহার ভয় ছিল কি জানি যদি কোন ছুতায় মানদা তাহার মনের বেদনা ছাপাইয়া তুলে। যতদিন এই ভাবে কেটে যায়, যাক্।

দুই একদিন করিয়া আরও দুই তিন মাস কাটিয়া গেল। ক্রমশঃ নবকৃষ্ণের সঙ্কোচ কমিতে লাগিল। কিছু দিনের মধ্যে মানদার সহিত তাহার পূর্ব্ব ঘনিষ্ঠতা দাঁড়াইয়া গেল। শিবানী যে তাহাদের মাঝখানে সপত্নীর ব্যবধান আনিয়াছে মানদাও যেন তাহা কতকটা ভুলিয়া গিয়াছিল।

যে ভুল করিয়া ফেলিয়াছে তাহা আর সংশোধনের উপায় নাই, এমনিতর ভাব দেখাইয়া যে অনুতপ্তের মত নবকৃষ্ণ মানদার মনস্তুষ্টির জন্য ক্রমশঃ অধিকতর বশ্যতা স্বীকার করিতে লাগিল। শিবানীর প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞার ভাব আসিতে লাগিল যেন যত দোষ শিবানীর। তাহাকে উদ্ধার করিতে যাইয়াই আজ সে মানদার কাছে অপরাধী। কিন্তু শিবানীর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। আদর অনাদর কিছুতেই তাহার আস্থা ছিল না। সে সংসারের নানা কর্ম্মের মধ্য দিয়া নিজের জীবনটাকে একটানা ভাবেই টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল, তাহাতে কোন বৈচিত্র্যই ছিল না।

(৬)

শিবানীর বিবাহের ছয় মাস মধ্যেই সর্ব্বাণী সকল জ্বালা এড়াইয়া ভবধাম পরিত্যাগ করিল। যে কয়দিন বাঁচিয়াছিল, তাহার চক্ষের জল কেহ শুখাইতে দেখে নাই। অশ্রুসাগরে তাহার বুকের বোঝা অনেক কমাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু শিবপ্রসাদের মুখ দেখিয়া সর্ব্বাণী অন্তরে অন্তরে কাঁপিয়া উঠিত। সেই

বিষাদ-কালিমামাখা, চিন্তারেখাঙ্কিত প্রবীণের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বদন সর্ব্বাণীকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিত। কতদিন সান্ত্বনাবাক্য বলিতে গিয়া সর্ব্বাণী থামিয়া গিয়াছে। তাহার সেই সর্ব্বকার্য্যে ঔদাসীন্য, উৎসাহহীন ভাব, ব্যথাভরা দৃষ্টির নীরব ভৎসর্না সর্ব্বাণীর বুকে শেল বিঁধিত। সে মুখে কিছুই বলিতে পারিত না; বড় কষ্টেই তাহার দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু এ যন্ত্রণা তাহার শীঘ্রই অবসান হইল। ভগবানের অসীম করুণার মত সর্ব্বাণী মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া চির শান্তিলাভ করিল।

শিবপ্রসাদের বক্ষে শিবানীর বিধিবিড়ম্বিত বিবাহে যে আঘাত লাগিয়াছিল, সে আঘাত সহ্য করিতে তাহাকে অনেকখানি শক্তি সঞ্চয় করিতে, অনেকখানি বেগ পাইতে হইয়াছিল। তাহার আজও অল্প অল্প মনে পড়ে যে শিবানী তাহার পিতামাতার কতদূর প্রিয় বস্তু ছিল। যে কয়দিন তাঁহারা জীবিত ছিলেন, কত যত্নে কত সোহাগেই তাহাদের উভয়কে মানুষ করিয়াছিলেন। শিবানীর সুখসৌভাগ্য তাঁহাদের কতদূর প্রার্থনীয় ছিল। আর আজ সেই শিবানীকে সে নিষ্ঠুরের মত একটা মরণের সমন-জারী করা বৃদ্ধের হাতে সঁপিয়া দিয়া দায়মুক্ত হইয়াছে! ভ্রাতার উপযুক্ত কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে! স্বর্গগত পিতামাতার বেদনার কারণ হইয়াছে, এ কথা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না।

শিবপ্রসাদ মধ্যে মধ্যে ভগিনীকে দেখিতে যাইয়া তাহার স্নেহের বোনের—জন্মদুঃখিনী শিবানীর দুর্গতি প্রায়ই দেখিতে পাইত; অথচ শিবানী তাহাকে কিছুই বলিত না; মুখখানি বুজিয়াই থাকিত। শিবপ্রসাদকে যদি সে এজন্য নিমিত্তের ভাগী করিত, অভিযোগ-অনুযোগ করিত, অভিমানের কান্না কাঁদিত, তাহা হইলে বোধ হয় তাহার বুকে এতটা বাজিত না। সে ভগিনীর এই নীরবতা শেল বুকে বহিয়া কেবল পথে পথে উদাসভাবে বেড়াইয়া বেড়াইত। কেহ বলিত, "শিবেটার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে।" কেহ বলিত, "লক্ষ্মীছাড়া হ'য়ে গেছে।" শিবপ্রসাদ লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। সে আর নবকৃষ্ণের ধার দিয়া চলিত না। তাহার ভাবগতিক দেখিয়া নবকৃষ্ণ হাল ছাড়িয়া দিয়া দুঃখের সহিত বলিত—"না ছোঁড়াটার কিছুই হ'ল না, বাপের নামটা বজায় রাখ্‌তে পারলে না। আমি চেষ্টা ক'রলে কি হবে বিধিলিপি অখণ্ডনীয়।"

হায় রে অনাদৃত দরিদ্রহৃদয়! সংসারের হাটে তোমার কোন মূল্য নাই!

(ক্রমশঃ)

শ্রীউষাপ্রমোদিনী বসু।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

ভাষার মৃত্যু।

তোমার-আমার মৃত্যুর মত ভাষারও মৃত্যু আছে। সংস্কৃত, পালি, লাদ, গ্রীক প্রভৃতি এখন মৃত ভাষা। এখন আর কোথাও মাতৃভাষারূপে ইহাদের ব্যবহার নাই। মাতৃভাষারূপে এগুলি ব্যবহৃত থাকিলে ইহাদিগকে জীবিত ভাষা বলিতে পারিতাম।

মনস্বী লেখক স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চৌধুরী এ সম্বন্ধে একবার 'বঙ্গদর্শনে' লিখিয়াছিলেন :—"ভাষার মৃত্যু আছে বটে, কিন্তু উহা মাতৃগণের হাতে ; যত দিন মাতৃগণ উহার ব্যবহার করেন, যতদিন কোনও ভাষা কোন জাতির মাতৃ-ভাষারূপে ব্যবহৃত হয়, ততদিন তাহার মৃত্যু হইতে পারে না। যে ভাষা ঘরে মার কাছে স্থান না পায়, তাহা বাহিরে সমাজের কাছেও অনাদৃত হইতে থাকে ; অবশেষে অনাদরে, অবজ্ঞায়, অনাহারে, পুষ্টির অভাবে মরিয়া যায়। সুতরাং ভাষাকে দীর্ঘকাল জীবিত রাখিতে হইলে—চিরজীবী করিতে হইলে—এমন সতর্ক হইতে হইবে, এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে তাহার শক্তি, সম্পদ ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়, যাহাতে গৃহে গৃহে মাতৃদেবীরা চিরদিন সাদরে ও সাগ্রহে তাহার ব্যবহার করেন, আর যাহাতে মাতৃভক্ত মনীষিগণ ভক্তি ও আগ্রহের সহিত—অবয়বের পরিবর্ত্তন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকৃতি না ঘটাইয়া—জাতীয় সাহিত্যের সেবা করিতে থাকেন। এরূপ করিতে পারিলে ভাষা নাও মরিতে পারে, যতদিন জাতি জীবিত থাকে ততদিন জাতীয় সাহিত্যও মাতৃ-ভাষার জীবনসহচর হইয়া থাকিতে পারে।"

চৌধুরী মহাশয়ের উক্তির উপর এ প্রসঙ্গে বেশী কিছু বলা চলে না। দেশে মাতৃভাষার অনুশীলন যত বৃদ্ধি পাইবে, দেশের নারীসমাজ মাতৃভাষার ব্যবহার যত বেশী করিবেন, মাতৃভাষার আয়ু ততদিন অক্ষয়-অটুট থাকিবে।

কাব্য-কথা ; বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেন,—কাব্যের দুইটী উদ্দেশ্য ; বর্ণন ও শোধন।

এই জগৎ শোভাময় যাহা দেখিতে সুন্দর, শুনিতে সুন্দর, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুকোমল, তৎসমুদায়ে বিশ্ব পরিপূর্ণ। কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য, কিন্তু সৌন্দর্য্য খুঁজিতে হয় না—এ জগৎ যেম দেখি, তেমনি যদি লিখিতে পারি,

যদি ইহার যথার্থ প্রতিকৃতির সৃষ্টি করিতে পারি, তাহা হইলেই সুন্দরকে কাব্যে অবতীর্ণ করিতে পারিলাম। অতএব কেবল বর্ণনা মাত্রই কাব্য।

সংসার সৌন্দর্য্যময় কিন্তু যাহা সুন্দর নহে তাহারও অভাব নাই। পৃথিবীতে কদাকার, কুবর্ণ, পূতিগন্ধ, কর্কশস্পর্শ ইত্যাদি বহুতর কুৎসিত সামগ্রী আছে, এবং অনেক বস্তু এমনও আছে যে, তাহাতে সৌন্দর্য্যের ভাব বা অভাব, কিছুই লক্ষিত হয় না। ইহাও কি কাব্যের সামগ্রী? অথচ ঐ সকলের বর্ণনাও ত কাব্য মধ্যে পাওয়া যায় এবং অনেক সময় যাহা অসুন্দর, তাহারই সৃজন কবির মুখ্য উদ্দেশ্যস্বরূপ প্রতীয়মান হয়। কারণ কি?

সকলেই বৃদ্ধিশালী। কাব্যের অধিকারও বৃদ্ধির নিয়মানুসারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আদৌ সুন্দরের বর্ণনা বর্ণনা-কাব্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু জগতে সুন্দর অসুন্দর মিশ্রিত; অনেক সুন্দরের বর্ণনার নিতান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ অসুন্দরের বর্ণনা; অনেক সময়ে আনুষঙ্গিক অসুন্দরের বর্ণনায় সুন্দরের সৌন্দর্য্য স্পষ্টীকৃত হইয়া থাকে। এজন্য অসুন্দরের বর্ণনা বর্ণনাকাব্যে স্থান পাইয়াছে; কালে বর্ণনামাত্রই বর্ণনা কাব্যের উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে।

অতএব সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত বর্ণনা কাব্যের উদ্দেশ্য, স্বরূপ বর্ণনা। জগৎ যেমন আছে, ঠিক তাহার প্রকৃত চিত্রের সৃজন করিতে এ শ্রেণীর কবিরা যত্ন করেন।

আর এক শ্রেণীর কবিদিগের উদ্দেশ্য অবিকল স্বরূপ বর্ণনা নহে। অপ্রকৃত বর্ণনাও তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহারা প্রকৃতি সংশোধন করিয়া লয়েন—যাহা সুন্দর, তাঁহাই বাছিয়া বাছিয়া লইয়া, যাহা অসুন্দর তাহা বহিষ্কৃত করিয়া কাব্যের প্রণয়ন করেন। কেবল তাহাই নহে। সুন্দরেও যে সৌন্দর্য্য নাই, যে রস, যে রূপ, যে স্পর্শ, যে গন্ধ, কেহ কখন ইন্দ্রিয়গোচর করে নাই, "যে আলোক জলে স্থলে কোথাও নাই", সেই আত্মচিত্তপ্রসূত উজ্জ্বল হৈমকিরণে সকলকে পরিপ্লুত করিয়া সুন্দরকে আরও সুন্দর করেন—সৌন্দর্য্যের অতি প্রকৃত চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি করেন। অতি প্রকৃত কিন্তু অপ্রকৃত নহে। তাঁহাদের সৃষ্টিতে অযথার্থ, অভাবনীয়, সত্যের বিপরীত, প্রকৃতির নিয়মের বিপরীত কিছুই নাই, কিন্তু প্রকৃতিতে ঠিক তাহার আদর্শ কোথাও দেখিবে না।" ইহাই শোধন কাব্য।

আমাদের গৃহস্থালী

গৃহস্থালী বড়ই "বে-সজিল" হইয়া পড়িয়াছে। গৃহস্থালী পুনর্ব্বার পূর্ব্বের মত করিয়া পাতাইতে হইবে। নহিলে নিশ্চয়ই দুর্গতি ঘুচিবে না। দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনা ঘটিবে; দুর্য্যোগের পর দুর্য্যোগ উপস্থিত হইবে। সংসার শুকাইয়া উঠিয়াছে, আরও শুকাইয়া উঠিবে; সত্য সত্যই শেষে সংসার শ্মশানে পরিণত হইবে।

আধাআধি কাজে কুলাইবে না। পূর্ণ মাত্রায় পঙ্কোদ্ধার করা চাই। সংশোধন ষোল আনা রকম চাই। গৃহস্থালী আমূল মেরামত করিতে হইবে। হাফ হিন্দু, হাফ ম্লেচ্ছ হইলে চলিবে না; আধা ব্রাহ্মণ, আধা বাবু হইলে চলিবে না। দশ আনা সাধু, ছয় আনা শঠ হইলে হইবে না। বিষ্ণুপূজা কর বলিয়া বিলাতী বিস্কুটের নৈবেদ্য চালাইতে পারিবে না। "প্রায়শ্চিত্ত করিব" বলিয়া পূর্ণজ্ঞানে পাপ করিতে পাইবে না। হয় "এস্ পার" নয় "ওস্ পার।" হয় একেবারে অভ্যন্তরে আইস, নয় বরাবর বাহিরে যাও; মধ্যপথে দাঁড়াইয়া "মাতব্বরী" করিতে পাইবে না। জাতি-ধর্ম্ম-রক্ষায় সালিস নিষ্পত্তি চলে না; ধর্ম্ম-কর্ম্মে "কম্প্রমিস" নাই। পরলোকের ব্যাপার পঞ্চায়তী করিয়া "রফা" হয় না। দুই পন্থার যে পন্থা ইচ্ছা অচিরাৎ নির্ব্বাচন কর। হিন্দু থাকিবার জন্য ও হিন্দু হইবার জন্য কাহারও প্রতি অনুরোধ নাই। অনুগ্রহ করিয়া কাহারও হিন্দু হইতে হইবে না—অনুকম্পা করিয়াও যেন কেহ হিন্দু না হয়েন। ইহাতে উপরোধ, অনুরোধ, অনুনয়, বিনয় স্নেহ-মমতা, বন্ধুত্ব পূর্ব্ব-স্মৃতির খাতির কিছুই নাই। মনকে চোখ-ঠারা হিন্দুয়ানি হিন্দুসমাজ চাহে না। মনকে চোখ-ঠারা হিন্দুয়ানি এখনি চূর্ণ হউক। ডুব দিয়া জল খাইলে আর চলিতেছে না। "সিধা সড়ক" পড়িয়া আছে; সটান চলিয়া আইস, না হয় সটান চলিয়া যাও। মাঝ রাস্তায় দাঁড়াইয়া "আম্‌তা আম্‌তা" কর কেন? দুই পদ অগ্রসর হইয়া আবার এক পদ পশ্চাৎ ভাগিয়া আইস কেন? এরূপ লুকাচুরীর প্রয়োজন কি? পরের চক্ষে ধূলি দিবার প্রয়োজন কি? নিজ আত্মা কলুষিত করার আবশ্যক কি? স্বধর্ম্মে আর্থিক ও সামাজিক স্বার্থ আছে, কাজেই তাহা ষোল আনা রকম ছাড়িতে পার নাই; কিন্তু বিধর্ম্মে ও ব্যভিচারে বাসনা রহিয়াছে তোমার বার আনা রকম। বলবতী বাসন-স্রোতে কেবলমাত্র অকিঞ্চিৎকর স্বার্থমূলক স্বধর্ম্ম কতক্ষণ টিকিবে? তাই বলি কেন

আর এ কর্ম্মভোগ, কেন এ কপটতা, কেন এ কাপুরুষোচিত ভীরুতা? ইহাকেই না ইংরাজেরা Cowardice বলেন? কেন আর এ "কাউয়ার্ডিস?" বরাবর বাহিরে চলিয়া যাও, বিমুক্তদ্বারে ব্যভিচার বাসনা পূর্ণ কর; বাজার অঞ্চলে ব্রাহ্মেরা আছেন, বর্ণবিহীন বাবুও বিস্তর আছেন, প্রকাশ্যভাবে যাইয়া তাঁহাদের দল পুষ্ট কর, তাঁহাদের অনুকরণে গৃহস্থালী পাতাও, তাঁহাদের আদর্শে জীবন যাপন কর; কথাটী কহিব না। কিন্তু হিন্দুসমাজের মধ্যে থাকিয়া যে হিন্দুসমাজদ্রোহী, হিন্দুশাস্ত্রদ্রোহী হইবে, আধা ম্লেচ্ছ, আধা হিন্দু গৃহস্থালীতে তামসিক অর্চ্চনায় দেবদেবীর অবমাননা করিবে, শাস্ত্রের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া কালাপানি যাওয়ার কের্দ্দানি করিবে,—গুরু, পুরোহিত কেবল "পর্দ্দা"র জন্য নিযুক্ত করিয়া, ঠাকুর প্রসাদের পূরিয়ার মধ্যে উইলসন হোটেল পরিপাক করিবে, ইহা সহিতে পারিব না। হিন্দুসমাজ হইতে এমনতর "শাঁকের করাত" সমূলে উৎপাটন করিতে হইবে। আবর্জ্জনা ঝাঁটাইয়া সাফ কর; তুঁষ কুঁড়া ও কুশস্য কুলার বাতাসে উড়াও;—ইহাতে হিন্দুসমাজ বাঁচে বাঁচুক, মরে মরুক। পরমায়ু ফুরাইলে কে রক্ষা করিতে পারে? কিন্তু সনাতন সমাজের পরমায়ু কখনও ফুরায় নাই; কোনও কালে ফুরাইবে না; কত বাত্যা, কত বিপ্লব, কত বিপর্য্যয়, বিঘ্ন যুগে যুগে উপস্থিত হইয়াছে; হিন্দু সমাজ ফুৎকারে উড়াইয়াছে। সমুদ্র হইতে দুই দশ কলস দূষিত বারি বাহির করিয়া দিলে সমুদ্র শুকায় না।

অপ্রবৃত্তিসত্বে এবং যুগপ্রবাহে যে সকল হিন্দু গৃহস্থের গৃহস্থালীতে "গলদ" উপস্থিত হইয়াছে তাঁহাদিগের সম্বন্ধেই অদ্য আমাদিগের কথা। যাঁহারা ব্যসনার্থে বাসনানলে পুড়িয়া মরিতেছেন তাঁহাদিগের সহিত সংস্কারের কথা আমরা কহিব না; তাঁহারা অবিলম্বে বাহিরে গেলেই মঙ্গল। তাঁহাদের জন্য হিন্দু সমাজের সীমান্ত প্রদেশ প্রকৃতি এবং তাঁহাদের প্রবৃত্তিকর্ত্তৃক চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে।

যুগবিপ্লবের দৌরাত্ম্যে সাধু গৃহস্থ শত সাবধানতাসত্বেও অনাচারের একটানা স্রোতে অজ্ঞাতে যাইয়া পতিত হয়েন। তাই আজ তাঁহার গৃহস্থালী শত ছিদ্রময়—অসুখের এবং অশান্তির নিকেতন; উদ্বেগের, অলক্ষণের এবং অলক্ষ্মীর ক্রীড়াভূমি; তাই আজ তথায় মনোমালিন্য, মতভেদ, অবাধ্যতা ও অশাসন; তাই আজ তথায় বিশুদ্ধ আচারের ভগ্নাবশেষের সঙ্গে বিলাসিতার বিসম্বাদ—তাই আজ তথায় সাত্ত্বিক আহারের অব্যবহিত পার্শ্বেই নিষিদ্ধ খাদ্য কদাহারের

ব্যবস্থা। এক রন্ধনশালাতেই দেখ কি বীভৎস ব্যাপার ঘটিয়াছে। ঠাকুরভোগ রন্ধনের "উনুনে"র অব্যবহিত উপরের কুলুঙ্গিতে মেজ বধূমাতার পলাণ্ডু রাঁধিবার "ডেক্‌চি"; কারণ মেজবাবু পলাণ্ডু-রস-সংযোগ ব্যতীত মাংস ভক্ষণ করিতে পারেন না এবং সেই মাংস নিত্য রাত্রে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। ছোট বধূমাতার শরীর অসুখ, তাঁহার পথ্যের জন্য একটু "চীকেন-ব্রথ" চাই—ডাক্তারের ব্যবস্থা—কাজেই পাকশালার প্রান্তভাগে দেখ ঐ কুক্কুট-রস নিষ্কাসনের বন্দোবস্ত! মধ্যভাগে বৃদ্ধা বিধবাদিগের নিরামিষ পাকের গোময়রঞ্জিত চুল্লী!

দুর্গা-দালানের পার্শ্বস্থ কক্ষ—পূজার সময় দুর্গাদেবীর "ভোগের ঘর।" আশ্বিনের কয়েক দিন ব্যতীত সম্বৎসরের সব কয় মাস তথায় মিসনী মহাশয়ার আবির্ভাব; কারণ ন্যায়ালঙ্কারের নাতিনী কয়টী তাঁহার নিকট উলের কাজ শিখে, আর একটু ইংরেজী বাঙ্গালা পড়ে। ঠাকুরাণীটী অনেক দিন হইতে যাতায়াত করিতেছেন, মেয়েরা তাঁহাকে ভালবাসে, তিনিও তাহাদিগকে আন্তরিক স্নেহ করেন; কাজেই কোন কথা কহা হয় না।

ন্যায়ালঙ্কারের মাতা "ত্রিতলে"র সর্ব্বপ্রান্তস্থ কক্ষে "বানপ্রস্থ"-অবলম্বিনী। কিন্তু হায়! তাঁহার কুঁড়াজালির মধ্যে কে আজ একখানা পাঁউরুটীর খোসা রাখিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধা আর্ত্তনাদ করিয়া নাতি-নাতিনীদিগের পিণ্ডপ্রদানের প্রস্তাব করিতেছেন; বধূরা বৃদ্ধাকে সদ্য বৈতরণী পারের ব্যবস্থার জন্য উদ্যোগিনী হইতেছেন!

ন্যায়ালঙ্কার নিরীহ লোক। তাঁহার অজ্ঞাতে অলক্ষ্যে শনৈঃ শনৈঃ তাঁহার গৃহস্থালীতে এই সকল দুর্ব্বিপাক আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতের আলয়ে যেদিন প্রথম বিলাতি কেতার বাতাস বহিল, সেদিন কেহ তাহা গ্রাহ্য করিল না; কারণ "কালের গতিতে অমন হইয়াই থাকে; উহাতে আর বিশেষ দোষ কি?" ক্রমে সে বাতাস ঈষৎ মাত্রায় বাড়িল, আস্তে আস্তে আর একটু বাড়িল; ক্রমে বাতাস আরও তেজে বহিল; এক একটু করিয়া ন্যায়ালঙ্কার ঠাকুরের গৃহস্থালীর পুরাতন "কিস্তি" বাহির গাঙের বহুদূরে এমন স্থানে গিয়া পড়িল যে, এখন আর "হালে পানি পায় না।" সংসারতরী শীঘ্রই বুঝি বানচাল হয়!

রোগ কঠিন; সুতরাং চিকিৎসাও চাই কঠিন। উপরোধ, অনুরোধ, স্নেহ-মমতা ও চক্ষুলজ্জার অনেক প্রতিবন্ধক আসিয়া জুটিবে; কিন্তু সে সকল মানিলে চলিবে না। সুদৃঢ় পণ করিয়া সুদৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সংশোধনকার্য্য

সম্পন্ন করিতে হইবে। আমূল সংশোধন। সংশোধন রাখিয়া ঢাকিয়া করিলে চলিবে না; অশুদ্ধাচারের সংস্পর্শমাত্র গৃহস্থালী হইতে দূর করিতে হইবে। সংশোধন প্রথমতঃ পাকশালায় আরম্ভ করিয়া বহির্ব্বাটীর দিকে আইস। ইতস্ততঃ করিলে চলিবে না। স্নেহের বন্ধন, প্রাণের বন্ধন ছিন্ন হয়, তাহাও স্বীকার; তাহাও পণ করিলে তবে এ কার্য্য করিতে পারিবে; নহিলে পারিবে না। না পারিলেও মঙ্গল নাই। কালবিলম্বে রোগ কঠিন হইতে কঠিনতর হইতেছে; অতএব তৎপর হও।

৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

সংগ্রহ।

বন্দুক ও কামান।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'নারায়ণে' আচার্য্য শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন "বজ্র বা কামান-বন্দুক" নামক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহাতে তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রাচীন যুগে হিন্দুরা বন্দুক ও কামানের ব্যবহার জানিতেন।

"নালিকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং
বৃহৎ-ক্ষুদ্রবিভেদতঃ। ১৯৫।৪ অঃ ১৬

নালিকাস্ত্র দুই প্রকার;—ক্ষুদ্রনালিক ও বৃহন্নালিক। এই ক্ষুদ্রনালিকই বন্দুক এবং বৃহন্নালিকই কামান। শুক্রাচার্য্য উহাদিগের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

তির্য্যগূর্দ্ধচ্ছিদ্রমূলং
নালং পঞ্চবিতস্তিকম্।
মূলাগ্রয়োর্লক্ষ্যভেদি
তিলবিন্দুযুতং সদা॥ ১৯৬ ঐ

যাহার পরিমাণ দৈর্ঘ্যে পাঁচ বিতস্তি বা আড়াই হাত, যাহার গোড়ার দিকে বক্রভাবে ছিদ্র থাকে ও গোড়ায় এবং অগ্রভাগে লক্ষ্যভেদ জন্য দুইটি "বিন্দু" বা মাছী থাকে, উহার নাম ক্ষুদ্রনালিক। তথাহি—

কল্লাঘাতাগ্নিকৃদ্গ্রাব-
চূর্ণধৃক্ কর্ণমূলকম্।
সুকাষ্ঠোপাঙ্গবুধ্নঞ্চ
মধ্যাঙ্গুলবিলান্তরম্॥ ১৯৭ ঐ

যাহার গোড়া উত্তম কাষ্ঠে নির্ম্মিত, মধ্যে এক অঙ্গুলি পরিমাণ বিল বা সুষির, মূলে কর্ণ থাকে, উহাতে অগ্নিচূর্ণ বা বারুদ থাকে এবং যন্ত্রে আঘাত দিলেই উহা প্রস্তরখণ্ডে পড়িয়া অগ্নির উৎপাদন করে।

স্বান্তেঽগ্নিচূর্ণসন্ধাতৃ-
শলাকা-সংযুতং দৃঢ়ম্।
লঘুনালিকমপ্যেতৎ
প্রধার্য্যং পত্তিসাদিভিঃ॥ ১৯৮ ঐ

উক্ত নালিকাস্ত্রের পার্শ্বে অগ্নিচূর্ণ গাদাইবার জন্য দৃঢ় শলাকা থাকে, ইহারই নাম লঘুনালিক। পদাতিক সৈন্য ও অশ্বারোহী সৈন্যেরা ইহার ব্যবহার করে। তথাহি—

যথা যথা তু ত্বক্‌সারং
যথা স্থূলবিলান্তরম্।
তথা দীর্ঘং বৃহদ্‌গোলং
দূরভেদি তথা তথা॥ ১৯৯
মূলকীলভ্রমাৎ লক্ষ্যে,
সমসন্ধানভাজি তৎ।
বৃহন্নালিকসংজ্ঞং তৎ
কাষ্ঠবুধ্নবিবর্জিতম্।
প্রবাহ্যং শকটাদ্যৈস্তু
সুযুক্তং বিজয়প্রদম্॥ ২০০

আর যে নালিকাস্ত্রে নলের ভিতরটা বাঁশের মত বড় ছিদ্রবিশিষ্ট ও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও দীর্ঘ, গোড়ার দিকে যাহার এরূপ শঙ্কু থাকে, যাহা ঘুরাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎই লক্ষ্যের উপর যাইয়া গোলা পতিত হয়, ইহার নামই "বৃহন্নালিক"।

ইহার গোড়ায় কাঠের বাঁট থাকে না ও ইহা শকটাদি দ্বারা বাহিত হয়। সুপ্রযুক্ত হইলে ইহাতে বিজয় সুনিশ্চিত।

* * *

বৃহন্নালিক ত শকট দ্বারা বাহিত হইত ? হাঁ, ক্ষুদ্রনালিক "হস্তধার্য্য" এবং উহাতে দুইটা "বিন্দু" (তিলবিন্দু বা মাছি ধনুর্বেদ ৫২ শ্লোক দেখ) থাকিত বলিয়া উহার নাম "বিন্দুক"; উহার অপভ্রংশে "বন্দুক" শব্দ ব্যুৎপাদিত। আর বৃহন্নালিক "শকটবাহ্য।" বেদে "হস্তধার্য্য" ও "শকটবাহ্য", উভয় প্রকার বজ্র বা কামানের কথাই বিবৃত আছে। যথা—

আ যৎ বজ্রং দধিষে হস্তে। ২।২৮।৭ম

দধে হস্তয়োঃ বজ্রমায়সম্। ৭।৮১।১ম

পুরন্দরা বজ্রহস্তা ইন্দ্রাগ্নী। ৮।১০৯।১ম

ঋগ্‌বেদে আছে, তখন সৈনিকেরা গর্ত্ত খুঁড়িয়া উহাতে থাকিত (গর্ত্ত-সৈন্য), স্ত্রীলোকেরা কামানের যুদ্ধ করিত, বিশ্‌পালা নামক একজন ভারত-মহিলার পা কামানের গোলায় উড়িয়া গেলে অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে লৌহময় পদ গড়াইয়া দেন। রমণীরা রথে চড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আহার্য্য দান করিতেন। অর্জ্জুনের সম্মোহন ও প্রস্বাপন বাণ এখনও পাশ্চাত্যেরা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। কিন্তু জর্ম্মাণেরা যে ধূম বা gas ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, দেবাসুর যুদ্ধে ভারতে উহাও ব্যবহৃত হইয়াছে। উহার নাম 'বায়ব্যাস্ত্র'।"

পুরাতনী।

"পাখী সব করে রব" কবিতার সমালোচনা।

সকলেই জানেন, "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল" কবিতাটীর রচয়িতা স্বর্গীয় মদনমোহন তর্কালঙ্কার। যুক্তাক্ষরবর্জ্জিত এই কবিতাটীর সৌন্দর্য্যে বাঙ্গালী পাঠকমাত্রই বাল্যকাল হইতে মুগ্ধ। এই কবিতায় যে কোনও দোষ আছে বা থাকিতে পারে, ইহা সহজে মনে হয় না।

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত এই কবিতার রচনা-মাধুর্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেও বলিতেন, কবিতাটীর স্বভাববর্ণনায় দোষ আছে। এই সকল দোষের উল্লেখ করিয়া তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পরলোকগত মহেন্দ্রনাথ রায় ১২৯০ সালের 'উদ্বোধন' পত্রের কার্ত্তিক সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়া-

ছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা মহেন্দ্রবাবুর সেই লেখাটী এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সর্ব্বজনপ্রশংসিত

'পাখী সব করে রব' কবিতার অপূর্ব্ব সমালোচনা।

একদিন চাঁদড়া-নিবাসী আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বাঙ্গলা পদ্য-সংক্রান্ত নানাবিধ কথোপকথন চলিতেছিল। মধ্যে ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'পাখী সব করে রব' এই কবিতার কথা উঠিলে অম্বিকাবাবু বলেন, "উহা আদ্যোপান্ত দোষে পরিপূর্ণ।" তাহা শুনিয়া আমি বলিলাম, "কিন্তু সর্ব্বসাধারণের মতে উহা অতি মনোহর।" আমার পূর্ব্বের ধারণা প্রবল দেখিয়া তিনি আমায় বলিলেন, "এ বিষয় আমি বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহোদয়ের নিকটে শুনিয়াছি।" এই কথা শুনিবামাত্র আমি তটস্থ ও কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অক্ষয়বাবুর নিকটে গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি তর্কালঙ্কারের রচনা মাধুর্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া অবশেষে বলিলেন, "কিন্তু প্রভাত-বর্ণনাটি প্রকৃত স্বভাব-বর্ণন নহে ; প্রত্যুত স্বভাবের বিরুদ্ধবর্ণন।" এই কথা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কিরূপ বলিয়া দিন।" তৎপরে তিনি বলিলেন, "তুমি এক এক পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি কর। আমি তাহার দোষাদোষ বলিয়া যাই।" আমি ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করিতে লাগিলাম, তিনি পর পর উত্তর করিয়া গেলেন। তখন আমার নিশ্চয় মনে হইল, উহা এই দণ্ডেই পুস্তক হইতে উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পুস্তক মধ্যে উহা রাখিয়া শিশুগণকে আর কুসংস্কার জন্মাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। সেই জন্যই আমি সাধারণের গোচরার্থে আমার আবৃত্তি ও অক্ষয়বাবুর উত্তর পশ্চাৎ লিখিতেছি,

আবৃত্তি।—পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল॥

উত্তর।—রাত্রি প্রভাত হইবার সময়ে "সকলি" দূরে থাক্, অতি অল্প পুষ্পই প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। বেল, মল্লিকা, নবমল্লিকা, বনমল্লিকা, রজনীগন্ধ, গন্ধরাজ, জুথী, জহরচাঁপা ইত্যাদি অনেক সুপ্রসিদ্ধ সুগন্ধি পুষ্প বৈকালে বা প্রদোষকালে প্রস্ফুটিত হয়। কৃষ্ণকলি প্রভৃতি কতকগুলি সুদৃশ্য পুষ্পও বৈকালে প্রকটিত হয়। সেফালিকাও সন্ধ্যার পরে বিকসিত হইয়া গন্ধ বিস্তার করে। পদ্ম, সূর্য্যমণি, অপরাজিতা, করবীর (করবী) এই সমুদায় পূজার পুষ্প সূর্য্যোদয়ের পরে এবং কোনটা কিছু বেলাতে ফুটিয়া উঠে। কুমুদ, টগর, ধুস্তুর

(ধুতুরা) প্রভৃতি কতকগুলি পুষ্প রাত্রিকালে বিকসিত হয়। আমার "শোভনো-দ্যানে" দুই এক প্রকার পুষ্প আছে, তাহা প্রভাতকালে প্রস্ফুটিত হওয়া দূরে থাকুক, অর্দ্ধ রাত্রিতে প্রস্ফুটিত হইয়া প্রাতে এবং কোনটা কিছু বেলায় মুদিত হইয়া যায়। অন্যান্য অনেক পুষ্প প্রভাত ভিন্ন অন্য সময়ে বিকসিত হইতে দেখা যায়।

আবৃত্তি।—রাখাল গোরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে॥

উত্তর।—যে সময়ে রাত্রি প্রভাতের উপক্রম হইয়া পাখীর "রব" শুনিতে পাওয়া যায়, "রাখালেরা" সে সময়ে "গোরুর পাল" লইয়া "মাঠে যায়" না। তাহারা দুগ্ধ দোহনাদি করিয়া সূর্য্যোদয়ের কিছু পরে গোচারণে যায়।

আবৃত্তি।—ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল।
পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল॥

উত্তর।—মালতী ফুল বৈকালে ফুটে। এ সম্বন্ধে আর কি বলিব?

আবৃত্তি।—শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর।
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির॥

উত্তর।—যে ঋতুতে "পাতায় পাতায়" টপ্ টপ্ করিয়া "নিশির শিশির পড়ে" সেই ঋতুর প্রভাত সময়ের শীতল বায়ু প্রহারে সহজ লোকের "শরীর জুড়ায়" না এবং যে ঋতুতে "পাতায় পাতায় নিশির শিশির পড়ে", সে ঋতুতে "মালতী ফুল" প্রস্ফুটিত হয় না।

অক্ষয়বাবু তর্কালঙ্কারের প্রভাত-বর্ণনের এরূপ সমালোচনা করিয়া ওস্তাদী কবিওয়ালাদের কথা উপস্থিত করিয়া তাহাদের কবিত্ব-শক্তি ও ভাষা-জ্ঞান, উভয়ের বিস্তর প্রশংসা করিলেন। কবির রচনা সুন্দর, প্রণালী শুদ্ধ; এমন কি নানা স্থানে প্রস্তাবিত বিষয় সমুদয় সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান বোধ হইতে থাকে, এইরূপ বলিতে লাগিলেন এবং উপস্থিত বিষয়ের উদাহরণ উদ্দেশে হরুঠাকুরের পশ্চাৎ লিখিত বর্ষা-বর্ণনাটি কীর্ত্তন করিলেন,

"সুধীর ধারা বহিছে ঘোরতর রজনী।
এ সময় প্রাণসখী রে কোথায় গুণমণি?
এই খদ্যোত বিদ্যুৎজ্যোতিঃ প্রকাশে,
দিবা মত যেমন দিনমণি॥
কদম্ব কেতকী, চম্পক জাতী, সেঁউতি সেফালিকা,
ঘ্রাণেতে প্রাণেতে দ্রোহ জন্মায়।
এই ময়ূর ময়ূরী হরষিত হেরি চাতক চাতকিনী॥"

সীবন-শিক্ষা

সীবন বা সেলাই একটী বিশেষ উপকারী, নিত্য প্রয়োজনীয় ও লাভজনক উপজীব্য। সেলাই শিক্ষার উপযোগী সরল ভাষায় বহুসংখ্যক চিত্রের দ্বারা বিশদরূপে বর্ণিত। শতাধিক পৃষ্ঠায় বহুমূল্য স্বদেশী এণ্টিক কাগজে সুন্দর-রূপে মুদ্রিত। সূচীধারণ হইতে বস্ত্রকর্ত্তন ও সর্ব্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিবার ইহাই একমাত্র উৎকৃষ্ট পুস্তক। হাতে ও কলে যত প্রকার সেলাই হইতে পারে, তাহা চিত্র দ্বারা প্রদর্শিত। মহিলাদিগকে উপহার দিবার ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। বঙ্গের ঘরে ঘরে এরূপ পুস্তকে আদর হওয়া উচিত। ইহা অনেক বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুবিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুত জানকীনাথ বসাক-প্রণীত। স্বর্ণাঙ্কিত উৎকৃষ্ট বাঁধাই। মূল্য ১৲ টাকা।

সরল কবিরাজী চিকিৎসা

কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ রায় প্রণীত।

আয়ুর্ব্বেদমতে চিকিৎসাবিষয়ক অভিনব পুস্তক। দুরূহ আয়ুর্ব্বেদকে যতদূর সহজ উপায়ে বুঝাইতে পারা যায় তাহার ত্রুটি হয় নাই। প্রত্যেক রোগের বিবরণ, তাহার ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ এবং লক্ষণভেদে ঔষধ, অনুপান, পাচন, মুষ্টিযোগ-প্রয়োগের ব্যবস্থা এবং পথ্যাপথ্য এমন সরলভাবে লেখা হইয়াছে যে, বাঙ্গালা ভাষায় সামান্য জ্ঞান থাকিলেই এই পুস্তক-সাহায্যে সামান্য খরচে কঠিন কঠিন রোগ আরোগ্য করিতে সক্ষম হইবেন। ছাত্র, চিকিৎসক এবং গৃহস্থ সকলেরই উপযোগী। বায়ু-পিত্ত-কফের জটিল সমস্যা লইয়া আর মাথা ঘামাইতে হইবে না—লক্ষণ দেখুন আর ব্যবস্থিত ঔষধ দিয়া ঘরের ও পরের রোগ বিদূরিত করুন। দরিদ্র বাঙ্গালীর ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে। মূল্য ১৲ টাকা।

মনোমোহন লাইব্রেরী,

২০৩।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রুষ-জাপানযুদ্ধেরইতিহাস

৪৫ খানি অত্যুৎকৃষ্ট হাফটোন ছবি ও ম্যাপসহ বহুমূল্য স্বদেশী এণ্টিক কাগজে অতি সুন্দররূপে মুদ্রিত ও প্রকাণ্ড পুস্তক। অন্ন ও মৎস্যভোজী ক্ষুদ্রকায় জাপানীগণ কি অপূর্ব্ব রণকৌশলে ও বিজ্ঞানবলে অর্দ্ধ-পৃথিবীর অধিপতি ও ইউরোপের সর্ব্বপ্রধান শক্তি রুষদিগকে জলে ও স্থলে, প্রতি যুদ্ধে, সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া জগৎকে বিস্মিত, চকিত ও স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হওয়া প্রত্যেক নরনারীর অবশ্য কর্ত্তব্য। এই পুস্তকে সার্পনেল, হাই আঙ্গেল প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে যে সকল অতি-ভীষণ গোলা আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার দ্বারা পোর্টআর্থার প্রভৃতি মহা দুর্ভেদ্য দুর্গসমূহ কি প্রকারে বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহা মনোমুগ্ধকর ফটো চিত্রের দ্বারা এমন সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে যে, পাঠকগণ যেন রুষ-জাপান-যুদ্ধ প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন বলিয়া বোধ হইবে। অতি সরল সুমিষ্ট ভাষায় লিখিত—অল্প-শিক্ষিতা স্ত্রীলোকেও অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। পড়িতে পড়িতে শরীর রোমাঞ্চিত হইবে। পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় জাপানীগণের অদ্ভুত বীরত্ব ও জন্মভূমির জন্য অকাতরে প্রাণদান;—ইহা যে কত কৌতূহলোদ্দীপক ও লোমহর্ষণ ঘটনায় পূর্ণ, তাহা লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব। একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। উপহার দিবার পক্ষে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। ইহা দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রতি খণ্ড ১৷৷০ টাকা। একত্র দুই খণ্ড লইলে ২৷৷০ টাকা।

মনোমোহন লাইব্রেরী।

২০৩।২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

PRINTED AND Published BY S. C. PALIT,
AT KARUNA PRESS,
53, Baranashi Ghosh Street, Calcutta,

ARGHYA, REG. NO. C 691.

১ম বর্ষ] [৪র্থ সংখ্যা।

শ্রাবণ, ১৩২৫] August, 1918.

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন শ্রীসুরেশচন্দ্র পালিত, বি-এল্

কার্য্যালয়—৫৩ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমেরিকায় আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক ক্ষমতায় প্রস্তুত।

মেহ, প্রমেহ প্রদর, বাধক, অজীর্ণ, অম্ল, পুরুষত্বহানি, ধাতুদৌর্ব্বল্য, বহুমূত্র, অর্শ, বাত, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি ব্যাধি মন্ত্রের ন্যায় আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা, মাশুলাদি ।৵০ আনা।

বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সালসা।

সাধারণতঃ ইহা রক্তপরিষ্কারক, বিশুদ্ধ রক্ত-উৎপাদক, পারদ এবং উপদংশ বিনাশক, বলকারক, আয়ুবর্দ্ধক, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ ও রক্তদুষ্টজনিত বাত প্রভৃতি নানাপ্রকার জটিল রোগ এবং পুরাতন মেহ, প্রমেহ, প্রদর প্রভৃতি দুর করিতে ইহা অদ্বিতীয়। সুস্থ শরীরে ইহা ব্যবহার করিলে শরীরের স্ফূর্ত্তি এবং মুখের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ১॥০ টাকা, মাশুলাদি ।৵০ আনা।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি ডি হাজরা,

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

অর্ঘ্য

৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩২৫।

ওফেলিয়া ও জুলিয়েট। *

এ জগতে প্রেমের সর্ব্বশক্তিত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত। প্রতীচ্য ভূখণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন যুগে হোমর-ভার্জ্জিল, পেট্রার্ক-দান্তে, স্পেন্সার-সেক্সপীয়ার এবং শেলী-বায়রণ-কীট্স-টেনিসন-এলিয়ট-ব্রণ্টি অবতীর্ণ হইয়া এ কথার যাথার্থ্য উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। প্রাচ্য ভূখণ্ডেও কালিদাস-ভবভূতি-শ্রীহর্ষ, জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস-ভারতচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল, রমেশচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, এমন কি অনুরূপা ও নিরুপমা, প্রভৃতি কবি ও আখ্যায়িকাকারগণও প্রেমের জয় গাহিয়াছেন ও গাহিতেছেন। ফল কথা, জগতের সর্ব্বদেশে সর্ব্বযুগেই প্রেমের গীত অবিরত গীত হইতেছে। হইবারই ত কথা। নানা দুঃখক্লেশপূর্ণ এই জগতে মানবের তাপিত প্রাণকে সুশীতল করিবার উপযুক্ত বস্তু প্রেম ভিন্ন আর কি আছে? এই স্বর্গীয় বস্তু যে উপভোগ করিতে পারে, পৃথিবী তাহার পক্ষে স্বর্গ, কিন্তু প্রেমহীনের নিকট স্বর্গও নরকযন্ত্রণাপ্রদ।

প্রেম যদিও একই বস্তু, তথাপি দেশকালপাত্রভেদে আমরা ইহার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিপরিগ্রহ দেখিতে পাই। সম্বন্ধের গুরুলাঘবভেদে 'ভক্তি' ও 'স্নেহ' নামক প্রেমের দুইটি বিশিষ্ট রূপান্তরের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা এক নায়ক-নায়িকার প্রেম বা দাম্পত্যপ্রেমেরই বহুবিধ রূপ দেখিতে পাই। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ও ভিন্ন ভিন্ন যুগের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণ তাঁহাদের রচিত কাব্য, নাটক ও আখ্যায়িকাসমূহে প্রেমের এই প্রকারভেদ সবিস্তরে বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইউরোপের কাব্যাকাশের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক মহাকবি সেক্সপীয়ার কর্ত্তৃক অঙ্কিত দুইটি নারীচরিত্র অবলম্বন করিয়া প্রেমের বিভিন্ন

---

* রজনীকান্ত গুপ্ত স্মৃতি-পাঠাগারে পঠিত।

প্রকার বিকাশ দেখাইতে চেষ্টা করিব। দুইটী চরিত্রই অতীব মনোরম, এবং পাঠকগণের সুপরিচিত। সে দুইটি চরিত্র—ওফেলিয়া ও জুলিয়েট।

ওফেলিয়া এবং জুলিয়েট, উভয়েই অল্পবয়স্কা (১) উভয়েই সংসারানভিজ্ঞা, উভয়েই কোমলহৃদয়া, উভয়েরই হৃদয় প্রেমের মন্দাকিনী ধারার স্পর্শে পবিত্রীকৃত। এই পর্য্যন্ত দেখিলে দুই জনকে একই জগতের একই প্রকার জীব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একটু গভীর পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, তাহাদের পরস্পরের সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই অধিক, তাহারা যেন এক জগতের জীব নহে। নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল মধ্যস্থ ইউরোপের নন্দনকাননসদৃশ রবিকরোদ্ভাসিত উত্তর ইতালীর জুলিয়েট সূর্য্যকিরণের ন্যায় সদা হাস্যময়ী প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় প্রফুল্লা ও সুন্দরী! পক্ষান্তরে শীতমণ্ডলসন্নিবিষ্ট, সমুদ্রপরিবেষ্টিত ডেন্মার্কের ওফেলিয়া অপেক্ষাকৃত স্থিরা, ধীরা, গম্ভীরা ও সঙ্কোচবতী, যেন অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত কোরক, অথবা মেঘান্তরাল হইতে দৃষ্ট শশিকলার ন্যায় স্নিগ্ধা ও সুন্দরী। জুলিয়েট প্রণয়-তপন-কিরণের প্রথম স্পর্শেই মেমননের মূর্ত্তির ন্যায় কলকূজনচঞ্চলা, পক্ষান্তরে ওফেলিয়া যেন মদনোন্মাদরহিতা প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি। জুলিয়েট প্রণয়ালাপপ্রগল্‌ভা নব যুবতী, আর তাহার পার্শ্বে ওফেলিয়া যেন প্রণয়স্পন্দনানুভববিহীনা ব্রীড়াসঙ্কুচিতা নববধূ।

উল্লিখিত চরিত্রদ্বয়ের বৈসাদৃশ্যের মূলে মহাকবি যে কলানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। প্রথমেই দেখা যায়, Romeo and Juliet এবং Hamlet নাটকদ্বয়ের প্রতিপাদ্য বস্তুর বিভিন্নতাই নায়িকাদ্বয়ের চরিত্রগত বিভিন্নতার প্রধান কারণ। নায়ক-নায়িকার উদ্দাম প্রণয় লইয়াই Romeo and Juliet নাটকের সৃষ্টি। দর্শনমাত্রেই যুবক-যুবতীর হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব, অতি অল্পকালের মধ্যেই সেই প্রেমের বিকাশ ও পরিপুষ্টি, এবং ক্যাপুলেট ও মণ্ট্যাগো পরিবারদ্বয়ের শত্রুতার ফলে ঘটনাচক্রের জটিলতা-নিবন্ধন হতভাগ্য প্রণয়িযুগলের ('a pair of star-cross'd lovers') সেই উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধনশীল অপূর্ব্ব প্রণয়ের অকালে

---

(১) জুলিয়েটের বয়স চতুর্দ্দশ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই, একথা 'Romeo and Juliet'এর দুই স্থানে উল্লিখিত আছে। 'Hamlet'এ ওফেলিয়ার বয়সের যদিও কোনও উল্লেখ নাই, তথাপি তাহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাহাকে অল্পবয়স্কা বলিয়াই মনে হয়।

বিনাশ,—এই ব্যাপারটিই Romeo and Juliet নাটকের মেরুদণ্ড। তবে অবশ্য মূল ঘটনাটির পরিপুষ্টিসাধনের জন্য নাট্যকারকে কার্য্যকারণ-পরম্পরায় কতকগুলি অবান্তর ঘটনার অবতারণা করিতে হইয়াছে। সেগুলি বাদ দিলে মূল আখ্যানবস্তুর পরিপুষ্টি ত হয় না, সৌন্দর্য্যও থাকে না। পরিবারদ্বয়ের স্ব স্ব দলভুক্ত আত্মীয় কুটুম্ব ও অনুজীবিগণের কলহ, একাধিক নরহত্যা, ফ্রায়ার লরেন্সের ভীষণ মুষ্টিযোগ প্রভৃতি ঘটনাসমূহ এই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু একথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে ইহাদের মধ্যে কোনটিই নাটকের মুখ্য বিষয় নহে। ক্যাপুলেটের পক্ষের কত জন লোক হত হইল বা মণ্ট্যাগোর পক্ষের কত জন লোক আহত হইল, ক্যাপুলেট ভবনে সান্ধ্যভোজনে কত জন ভদ্রলোক এবং কত ভদ্রমহিলা সমবেত হইয়াছিল, প্যারিস জুলিয়েটের উপযুক্ত পাত্র কি না, টাইবল্ট ও প্যারিস অথবা মার্কুশিও ও বেনভলিও, ইহাদের মধ্যে কে মরিল, কে বাঁচিল, এ সকল বিষয় জানিবার জন্য পাঠক বা দ্রষ্টৃবর্গের একটু সাময়িক কৌতূহল হয় বটে, কিন্তু রোমিও জুলিয়েটের প্রণয়ের ইতিহাসের অধ্যায়ের পর অধ্যায় (যদিও অধ্যায়গুলি অতীব অল্প-সংখ্যক) জানিবার জন্য আমাদের যে কৌতূহল, যে ঔৎসুক্য দেখা যায়, তাহার তুলনায় পূর্ব্বোক্ত কৌতূহল কিছুই নয় বলিলেই হয়। সাধুপুরুষ যেমন সাংসারিক কর্ত্তব্যনিচয়ে ব্যাপৃত থাকিয়াও নির্লিপ্তভাবে আপনার দৃষ্টিকে সর্ব্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে রক্ষা করেন, Romeo and Julet পাঠ বা উহার অভিনয়দর্শনকালে আমাদের মনও সেইরূপ আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী দ্বারা অল্পবিস্তর আকৃষ্ট হইয়াও নায়ক-নায়িকার জ্বলন্ত প্রেমবহ্নির দিকেই অবিরত ধাবিত হয়। জুলিয়েটের পিতৃগৃহে তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎ হইতে ফ্রায়ার লরেন্সের গৃহে তাহাদের প্রেমপূর্ণ জীবনের শোচনীয় পরিণাম পর্য্যন্ত ঘটনাটি একটি স্বপ্নদৃষ্ট ভীষণ দুর্ঘটনার ন্যায়ই আমাদের মনের মধ্যে থাকিয়া যায়। তাহার পার্শ্বে অন্য কোন অবান্তর ঘটনা স্থান পায় না।

পক্ষান্তরে Hamlet নাটকের আখ্যানবস্তু হ্যামলেট ও ওফেলিয়ার প্রণয় নহে, পরন্তু হ্যামলেটের পিতৃহত্যার অন্তর্নিহিত জটিল রহস্যের উদ্ঘাটন ও তাহার প্রতিশোধ প্রদানরূপ ভীষণ সমস্যার সমাধান। হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মার হ্যামলেটের নিকট আবির্ভাব ও প্রতিহিংসাগ্রহণার্থ উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যাবলি-প্রয়োগ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে হ্যামলেটের হস্তে ক্লডি-য়াসের নিধন পর্য্যন্ত যতবার হ্যামলেট আমাদের সম্মুখীন হয়, ততবারই দেখিতে

পাই, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ-গ্রহণই তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত, এই ভীষণ সমস্যার সমাধানের দিকেই তাহার চিন্তাস্রোতঃ প্রবর্ত্তিত; অথচ কখনও কখনও প্রেতাত্মার বাক্য সত্য কি অমূলক এই সন্দেহদোলায় দোলায়মান হওয়ায় তাহার চিত্তের অবস্থা অতীব ভয়ঙ্করী। প্রধানতঃ এই অব্যবস্থিত চিত্ততার নিমিত্তই হ্যামলেটের চরিত্র এত জটিল ও দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিয়াছে।

হ্যামলেটের হৃদয়ে যে প্রেমবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ওফেলিয়াকে সে যে প্রেমপত্র দিয়াছিল, তাহার

"Doubt that the stars are fire,
Doubt that the sun doth move,
Doubt that to be a liar,
But never doubt I love."

প্রভৃতি কথাগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সে ওফেলিয়াকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত। ওফেলিয়ার সমাধিদৃশ্যে হ্যামলেটের মুখোচ্চরিত "Ten thousand brothers cannot love her so much" প্রভৃতি বাক্যও ইহার আর একটি প্রমাণ। নাটকখানির মধ্যে আরও কয়েক স্থলে ওফেলিয়ার প্রতি তাহার প্রগাঢ় প্রণয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিশেষ এই যে, যখনই হ্যামলেট ওফেলিয়ার সম্মুখে নিজ হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছে, তখনই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তাহার উচ্ছ্বাসপূর্ণ বাক্যাবলীর মধ্যে প্রণয়ের অভিব্যক্তি অপেক্ষা প্রতিহিংসারূপ কর্ত্তব্যপালন ও জীবনমরণের সমস্যা-সমাধানের নিমিত্ত উদ্বেগের অভিব্যক্তিই অধিক। তাহার হৃদয়ের প্রেমধারা কঠোর কর্ত্তব্যরূপ বালুকার আবরণে লুক্কায়িতা অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায়ই প্রবাহিতা। বালুকারাশি ভেদ করিয়া সেই শীতল জলের দর্শন বা স্পর্শ লাভ করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার।

হ্যামলেটের প্রেমজ্ঞাপক বাক্যাবলীও তাহার মনোভাবের ন্যায় জটিল ও দুর্ব্বোধ। রোমিও প্রেমের দাস, প্রেমের সার্থকতাই তাহার জীবনের সার্থকতা; জুলিয়েটকে সে একদিনের জন্যও আপনার করিয়া লইতে পারিলে তাহার পর সে সহাস্যমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারে। কিন্তু হ্যামলেট কর্ত্তব্যের দাস, কর্ত্তব্যপালনই তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য; প্রেমের সার্থকতাকে সে কখনও জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করে নাই (এবং সে সার্থকতা তাহার ইহজীবনে ঘটেও নাই)। রোমিওর পক্ষে প্রেমই

essential, কিন্তু হ্যামলেটের পক্ষে উহা essential নহে, accidental মাত্র। (২)

এইবার আলোচ্য নাটকদ্বয়ের আখ্যানবস্তুর তারতম্যানুসারে নায়িকাদ্বয়ের চরিত্রের কিরূপ তারতম্য হইয়াছে তাহা দেখা যাউক। Romeo and Julietএ শুধু প্রেমের লীলাই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং এখানে নায়ক ও নায়িকা উভয়েরই চরিত্র প্রেমরসের পরিপুষ্টির উপযোগী করিয়াই গঠিত হইয়াছে। এখানে দৃশ্যের দৃশ্যে আমরা উদ্দাম প্রেমের অভিনয় দেখিতে পাই। দেখিতে পাই, প্রেমজগতের দুইটি মুগ্ধ জীব সংসার-সমাজের বন্ধন ছিন্ন করিয়া লোকলজ্জাভয় ত্যাগ করিয়া অভিভাবকগণের আদেশ ও উপদেশ অমান্য করিয়া হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া ভবিষ্যতের ভাবনা না ভাবিয়া আবেগপূর্ণ-হৃদয়ে অহরহঃ পরস্পরের অভিমুখে ছুটিতেছে, কোন বাধা মানিতেছে না, কাহারও অপেক্ষা করিতেছে না, যেন মহাকর্ষণের অলঙ্ঘ্য গতিতেই ছুটি-তেছে। প্রেমই তাহাদের ধ্যান, প্রেমই তাহাদের জ্ঞান, প্রেম ভিন্ন অন্য কোন বস্তু তাহাদের মনে স্থান পায় না। রোমিও যেমন জুলিয়েটের দর্শনমাত্রেই মুগ্ধ হইল, জুলিয়েটও তেমনই রোমিওর দর্শনমাত্রেই আপনা ভুলিল। রোমিও যখন তাহার প্রণয়োৎসুক হৃদয় জুলিয়েটের দিকে বাড়াইয়া দিল, জুলিয়েটও তখন তাহার হৃদয় না দিয়া থাকিতে পারিল না,—সেও যে রোমিওর মত মজিয়াছে। তখন হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিল, দুই হৃদয় এক হইল, প্রেমের অভি-যান সার্থক হইল। প্রেমের টানে পড়িয়া জুলিয়েট আপনাকে ভুলিল, মাতা পিতাকে ভুলিল, জ্ঞাতি ও স্বজনকে ভুলিল, পারিবারিক শত্রুতা ভুলিল, সমাজের সকল বাধা অতিক্রম করিয়া গৃহত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল। যুবক-যুবতীর এই অহেতুক উদ্দাম প্রেমের জয়ঘোষণা করাই এখানে কবির উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া বিচার করিতে গেলে জুলিয়েটের কার্য্য-পরম্পরাকে আদৌ অশোভন বলিয়া মনে হয় না। পরন্তু জুলিয়েট যদি

(২) হ্যামলেট ওফেলিয়াকে যে প্রেম দিয়াছিল, ওফেলিয়া পূর্ণ মাত্রায় তাহার প্রতিদান করে নাই, ইহাই হ্যামলেটের উন্মত্ততার প্রকৃত কারণ কি না, এই কথা লইয়া রাজা, রাণী ও পলোনিয়াসের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, ওফেলিয়া কর্তৃক এই প্রত্যাখ্যান হ্যামলেটের উন্মাদের একটি কারণ হইলেও অনেকের মধ্যে একটি, এবং সেরূপ বলবৎও নহে।

রোমিওর প্রেমের পূর্ণমাত্রায় প্রতিদান না করিত তাহা হইলে প্রেমের এই অপূর্ব্ব বিকাশ দেখান হইত না, সুতরাং কবির উদ্দেশ্যও বিফল হইত।

ওফেলিয়ার চরিত্রে এতদূর প্রেমপ্রবণতা দেখিতে পাই না। সে জানে যে হ্যামলেট তাহাকে ভালবাসে এবং সে নিজেও যে হ্যামলেটকে ভালবাসে না তাহা নহে, কিন্তু তাহাকে কখনই প্রণয়স্রোতে গা ভাসাইয়া দিতে দেখি না। সুনিপুণ কবি-চিত্রকর তাহাকে এমন একটি বালিকাসুলভ সরলতার আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন যে, হ্যামলেটের প্রণয়বচনের মর্ম্ম সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে, কি উহা তাহার ঐ আবরণে ঠেকিয়া ফিরিয়া আসিতেছে, তাহা তাহার কথাবার্ত্তার ভাবে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। হ্যামলেটের ন্যায় সেও—অথচ সম্পূর্ণ বিভিন্ন কারণে—জটিল ও দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিয়াছে।

ফলতঃ ওফেলিয়া যে হ্যামলেটের প্রেমের পূর্ণ প্রতিদান না করিয়া তাহাকে কতকটা প্রত্যাখ্যাত ও ক্ষুব্ধ করিয়াছে, এই ব্যাপারের মূলে ওফেলিয়ার অত্যধিক সরলতা ব্যতীত আরও একটি নিগূঢ় কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে,—উহা তাহার পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃস্নেহ। জুলিয়েট পতিভক্তির প্রতিমূর্ত্তি, ওফেলিয়া মূর্ত্তিমতী পিতৃভক্তি। জুলিয়েটে আমরা দেখিতে পাই, নারীহৃদয়ের অন্যান্য সমুদায় বৃত্তিকে তিরোহিত করিয়া তাহার পতিভক্তিই পূর্ণ মূর্ত্তিতে বিরাজমানা; কিন্তু ওফেলিয়ায় দেখিতে পাই, পিতৃভক্তি (এবং কিয়ৎ পরিমাণে ভ্রাতৃস্নেহও) তাহার হৃদয়ের অন্যান্য বৃত্তিনিচয়কে, এমন কি প্রণয়কেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। ওফেলিয়া নিজমুখেই দুই একবার তাহার পিতার নিকট বলিয়াছে যে, হ্যামলেট তাহার নিকট বেশ সুমিষ্ট প্রেমের কথা বলে, কিন্তু সময়ে সময়ে হ্যামলেটের ভাবগতিক দেখিয়া তাহার বড় ভয় হয়। এই অকপট উক্তি তাহার বালিকাসুলভ সরলতারই পরিচায়ক। তাহার পর সে পিতা ও ভ্রাতা কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হইয়াছে যে, হ্যামলেটের ভালবাসা শুধু ছুটো কথার ফাঁকা আওয়াজ মাত্র, তাহার গভীরতা বা স্থিরতা আদৌ নাই, তাহা অধিক দিন স্থায়ী হইবে না, তাহাতে ওফেলিয়ার জীবনে দুঃখ ভিন্ন সুখ আনয়ন করিবে না, ইত্যাদি; এবং তাহারা সততই তাহাকে হ্যামলেটের ভালবাসার মায়াজাল হইতে নিজেকে দূরে রাখিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছে। এই পরামর্শের ফলও ফলিয়াছে।

ওফেলিয়া যদি জুলিয়েটের মত প্রগল্‌ভা হইত, তাহা হইলে হয় ত সে

পিতার ও ভ্রাতার কথার আস্থা স্থাপন না করিয়া প্রিয়তমকেই জীবনের সুখের নিদান মনে করিয়া তাহারই কণ্ঠলগ্না হইত। কিন্তু সে তাহা করে নাই। একে সে সরলা, তাহার উপর পিতৃস্নেহে প্রতিপালিতা এবং পিতারই উপর সম্যক নির্ভরশীলা; সুতরাং সে 'আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া' এই মহাবাক্যের অনুবর্ত্তিনী হইয়া পিতার আদেশই শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছে, এবং পিতৃদত্ত শিক্ষার ফলে (অন্ততঃ কিছুদিন) হ্যামলেটের প্রণয়সম্ভাষণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিয়াছে। এই অবস্থায় আমরা তাহার হৃদয়ের সবিশেষ কোন পরিচয় পাই না, মনে হয় সে যেন যন্ত্রচালিতার ন্যায়ই কার্য্য করিয়া যাইতেছে।

অবশ্য ওফেলিয়া চিরদিনই যে এইরূপ মদনবাণে অবিদ্ধা ছিল, তাহা বোধ হয় না। নাটকের মধ্যে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাই যে, ওফেলিয়া পূর্ব্বের সেই উদাসীন ভাব একটু একটু করিয়া ত্যাগ করিতেছে, হ্যামলেটের মনের ভাব বা কথার অর্থ সম্পূর্ণ না বুঝিয়াও তাহার বিপদে অল্প অল্প সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে, যেন মায়ানিদ্রায় নিদ্রিতা রাজকন্যা প্রণয়ের সোণার কাঠির স্পর্শে একটু একটু করিয়া জাগরিত হইতেছে। (তবে বোধ হয় এখন পলোনিয়াসের শাসনের কড়াকড়িও কিছু কমিয়াছে।) কিছুদিন এমন হইয়াছে যে, হ্যামলেটও প্রণয়ব্যাপার লইয়া ওফেলিয়ার উপর (প্রধানতঃ পরোক্ষে) একটু আধটু টিটকারী দিয়া প্রতিশোধ লইতে পারিয়াছে। কিন্তু প্রণয়কিরণস্পর্শে ওফেলিয়ার হৃদয়ের সুপ্ত প্রণয়কোরক যতই প্রবুদ্ধ হউক না কেন, উহা কখনও দীপ্তিতে তাহার পিতৃভক্তির প্রফুল্ল পঙ্কজকে ম্লান করিতে পারে নাই। ওফেলিয়ার উন্মত্ততার পক্ষে হ্যামলেটের নির্ব্বাসনদণ্ডের কিঞ্চিৎ কার্য্যকারিত্ব থাকিলেও হয় ত থাকিতে পারে, কিন্তু পিতৃশোকই যে উহার প্রধান কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমার বোধ হয়, ওফেলিয়ার এই উন্মত্ততার মূলে হ্যামলেটের হৃদয়বিদারক মানসিক দ্বন্দ্বের মতই ভীষণ এক কঠোর মানসিক দ্বন্দ্ব নিহিত আছে। থাকিবারই কথা। প্রিয়তম যখন (প্রায় বিনা অপরাধেই) প্রণয়িনীর পিতৃহন্তা হইয়া দাঁড়ায়, তখন প্রেমময়ী অথচ পিতৃভক্তিশালিনী রমণীর মনের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠে। ওফেলিয়ার ঠিক এই অবস্থা হইয়াছে। সে জানে যে হ্যামলেট প্রায় বিনা অপরাধেই তাহার জীবনের আরাধ্য দেবতা পিতাকে নিধন করিয়াছে; অথচ সে ইহাও জানে যে, এ ক্ষেত্রে হ্যামলেটের কেবল অবিমৃশ্যকারিতা ভিন্ন অন্য কোন দোষ বা কোন প্রকার অসদভিপ্রায় নাই। এই দুইটি পরস্পর বিরোধী

ভাব তাহার মনোমধ্যে উদিত হইয়া তাহার বালিকা-হৃদয়কে সবলে আলোড়িত ও নিষ্পেষিত করিয়াছে। ইহার ফলে তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে—এমন অবস্থায় পড়িলে অনেকেরই এইরূপ হয়।

ওফেলিয়ার পাগলামির কথা ভাবিতে ভাবিতে আমরা প্রকৃত বিষয় হইতে একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বলিতেছিলাম যে, রোমিও যেমন জুলিয়েটকে ভালবাসিয়া তাহার নিকট হইতে পূর্ণ মাত্রায় সেই ভালবাসার প্রতিদান পাইয়াছিল, হ্যামলেট ওফেলিয়াকে ভালবাসিয়া তাহা পায় নাই। তাহার কারণও যথাসম্ভব দেখাইয়াছি। এখন এই না পাওয়ার মধ্যে (Poetic art) কাব্যকলার কি তত্ত্ব নিহিত আছে, এবং ইহাতে কবির কি উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, তাহা দেখিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রেমের জয়গানই Romeo and Juliet নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং সেখানে নায়িকার প্রণয়-প্রগল্‌ভতা বেশ শোভনীয় হইয়াছে। কিন্তু Hamlet নাটকের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। ওফেলিয়া যদি প্রথম হইতেই হ্যামলেটের প্রেমের স্রোতে গা ঢালিয়া দিত, তাহা হইলে বোধ হয় হ্যামলেটকেও সেই সঙ্গে দরিয়ার ভাসিতে হইত। হ্যামলেট যে মুহূর্ত্তে ওফেলিয়াকে ভালবাসিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তেই যদি সে ভালবাসার পূর্ণ প্রতিদান পাইত, তাহা হইলে তাহার জীবন অনেকটা সরস, রমণীয় ও মধুময় হইত বটে; কিন্তু কবির ও কাব্যের উদ্দেশ্য ঐখানেই হয় ত নষ্ট হইয়া যাইত। হ্যামলেট একে ভাবপ্রবণ ও অব্যবস্থিতচিত্ত, তাহাতে যদি সে প্রণয়সুখে একবার মাতিত, তাহা হইলে বোধ হয় সে তাহার কঠোর কর্ত্তব্যের কথা একেবারেই ভুলিয়া যাইত, অথবা ভুলিয়া না যাইলেও উহা সম্পাদন করিবার উপযুক্ত শক্তি তাহার একেবারেই থাকিত না। একে ত তাহার কর্ত্তব্যসাধনের পথ অতীব বিঘ্নসঙ্কুল; তাহার উপর যদি তাহাকে প্রণয়ের আদানপ্রদানব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইত, তাহা হইলে সহস্র বিঘ্নের উপর আরও একটি অতি প্রবল বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইত। হয় ত এমনও হইতে পারিত যে, হ্যামলেট প্রেমের মায়াজালে জড়িত হইয়া সাধারণ প্রেমিক যুবকদের দলভুক্ত হইয়া পড়িত, জগদ্বিখ্যাত হ্যামলেট চরিত্রের কোন বিশিষ্টতা বা অসাধারণত্ব থাকিত না, এতদিনে তাহা বিস্মৃতির অতলস্পর্শ গর্ভে নিমজ্জিত হইত।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কবির উদ্দেশ্য যদি তাহাই, তাহা হইলে তিনি হ্যামলেটের হৃদয়ক্ষেত্রে প্রেমের বীজ বপন না করিলেই ত পারিতেন, দিয়া

কাড়িয়া লওয়া অপেক্ষা না দেওয়াই ত ভাল ছিল। তাহা হইতে পারিত বটে, কিন্তু তাহা হইলে হ্যামলেটের চরিত্র একটু অস্বাভাবিকতা-দোষে দুষ্ট হইত না কি? হ্যামলেটের ন্যায় ভাবপ্রবণ ত্রিংশদ্‌বর্ষীয় যুবকের হৃদয়ে আদৌ প্রেমের সঞ্চার হয় নাই, একথা কি বিশ্বাস্য? তাই সুনিপুণ কবি তাহার হৃদয়ে প্রেম দিয়াও তাহার প্রণয়িনীর হৃদয়কে সরলতা ও পিতৃভক্তির সহজ ও স্বাভাবিক আবরণে আবৃত করিয়া তাহার নিকট হইতে দূরে দূরে রাখিয়া তাহার প্রেমকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে কাব্যকলার আরও একটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। পরলোকগত পিতার প্রেতাত্মার নিদেশপালন-রূপ যে ভীষণ সমস্যা হ্যামলেটের সম্মুখে বর্ত্তমান, তাহার সহিত ব্যর্থ প্রণয়ের দারুণ আঘাত মিলিত হইয়া হ্যামলেটের সমস্যাটিকে জটিলতর ও ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছে, ফলে হ্যামলেটের চরিত্রও অধিকতর দুর্জ্ঞেয় হইয়া উঠিয়াছে।

Romeo and Juliet ও Hamlet উভয়ত্রই নায়ক ও নায়িকার মৃত্যুতে নাটকের যবনিকা পতন হইয়াছে। তন্মধ্যে নায়িকাদ্বয়ের মৃত্যুর উপর দুই চারিটি কথা বলিবার আছে। উহা বলিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

জুলিয়েট ও ওফেলিয়ার জীবনের গতি যেমন বিভিন্ন প্রকার, তেমনই তাহাদের মৃত্যুও সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপায়ে সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু ঘটনাদ্বয় সমভাবেই করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী। জুলিয়েট উদ্দাম প্রেমের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিল, কোন বাধাবিঘ্ন মানে নাই। তাহার জীবনদীপ অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুল্লেখার ন্যায় আমাদের চক্ষুর সম্মুখে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, আবার ঐরূপ উগ্রভাবেই তাহা নির্ব্বাণ হইয়াছে। প্রিয়তমের মৃতদেহ দর্শন করিয়া প্রাণের আবেগে সে তীক্ষ্ণ অসির আঘাতে আত্মপ্রাণ বিনষ্ট করিয়াছে। রঙ্গমঞ্চের উপরিভাগে দর্শকবৃন্দের সমীপেই এই নিদারুণ ঘটনা ঘটে। কিন্তু ওফেলিয়ার জীবন যেমন উদ্দাম-ভাবাবেশ-বিহীন, তাহার মৃত্যুও তদ্রূপ ধীরে, অতি ধীরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে সংঘটিত হইয়াছে। সাগরবেষ্টিত উপদ্বীপে তাহার জন্ম, সাগরের প্রশান্ত বারিরাশির ন্যায় শান্ত ও নয়নানন্দকর হরিদ্বর্ণ তৃণপত্ররাজির ন্যায় স্নিগ্ধ তাহার জীবন, উইলো গাছের নীচে সাগরের সুনীল সলিলেই ধীরে ধীরে তাহার জীবনের অবসান হইয়াছে। সে অতি শান্তভাবে, অতি সন্তর্পণে, অতি ধীরে যেন স্বপ্নের ন্যায় অজ্ঞাতসারে কখন হ্যামলেটের হৃদয়ে এবং

পাঠকবর্গের কল্পনায় উদিত হইয়াছিল, আবার সেইরূপ শান্তভাবে স্বপ্নের ন্যায়ই তিরোহিত হইয়াছে, তাহার পবিত্র আত্মা অসীম সমুদ্র ও অনন্ত আকাশের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, কেবল তাহার মধুময়ী স্মৃতিটুকু আমাদের হৃদয়ফলকে অঙ্কিত রহিয়া গিয়াছে।

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।

মস্ত কবি।

আমরা সবাই মস্ত কবি
বিশ্বভুবন ছাড়া
করবো একটা রকম কিছু
নূতন মাথার দ্বারা।
নূতন রকম ছন্দবন্ধ
রকমারি অর্থ তার,
সরস্-রসে সাজ্‌বে বধূ—
কাব্যরাণী চমৎকার।
'ভারতচন্দ্র' 'ঈশ্বর গুপ্ত'
নেহাৎ তারা সেকেলে,
আমরা সবাই মস্ত কবি
দেখবে জগৎ একালে।
'নবীন' 'মধু' হার মানিবে
নাকে মুখে দিয়ে খৎ
ঋষি হ'ব 'নোবেল' পাব
জেনে রেখো ভবিষ্যৎ।

'বঙ্কিম' সে ত তুচ্ছ অতি
নবীন কবির ধারে,
'রজনী' ত ঘুমেই বিভোর
'দ্বিজেন' পরপারে।
'রবি'র চেয়ে স্নিগ্ধ মধুর
চন্দ্র মোরা জনে জনে
ছুট্‌বে মোদের কাব্যছটা
কবিতারি কুঞ্জবনে।
নাইক মোদের গোঁফের রেখা
নাইক শ্মশ্রু লম্বমান
অধর-কোণে মুচ্‌কে হাসি
উপচক্ষু বর্ত্তমান।
গড়্‌বো একটা নূতন বিশ্ব
নূতন 'আর্টের' দ্বারা
আমরা জনে জনে মস্ত কবি
বিশ্বভুবন ছাড়া।

শ্রীঅবনীকুমার দে

ঠাকুর রামকৃষ্ণের গল্প।

একজন লোক মাঠে শৌচে গিয়াছিল। সে মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—আমি ঐ গাছতলায় একটী সুন্দর গিরগিটী দেখিয়া আসিলাম। গিরগিটীটা টক্‌টকে লাল। আর একজন বলিল,—সে কি কথা! আমি তোমার একটু আগেই ঐ গাছতলা থেকে ফিরিয়া আসিতেছি, গিরগিটীটা লাল কেন হইবে? সবুজ। আর একজন এই কথা শুনিয়া বলিতে লাগিল,—তোমাদের কিছু আগে আমি ঐ গাছতলা দিয়া আসিবার সময়ে স্পষ্টই দেখিয়াছি, গিরগিটীটা লালও নয়, সবুজও নয়, একেবারে নীল। আরও দুই একজন লোক সেখানে উপস্থিত ছিল। তাহাদের কেহ বলিল, ঐ গিরগিটীটাকে আমি দেখিয়াছি,—উহার রং হরিদ্রা; কেহ বলিল,—ওটা পাংশুবর্ণ; কেহ বলিল, উহার গায়ের রং মেটে।

তখন উহাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়া গেল। সকলেই বলিতে লাগিল,—আমি নিজের চোখ্‌কে বিশ্বাস করিব, না তোমার কথায় বিশ্বাস করিব?

একজন লোক সেইখান দিয়া যাইতেছিল, সে উহাদের গোলমাল শুনিয়া বলিল,—ব্যাপার কি?

তখন সকলেই গিরগিটীটার রংয়ের কথা বলিল। তাহাদের কথা শুনিয়া লোকটী বলিল,—আমি এই বাগানটাতেই থাকি। ঐ গাছতলায় যে গিরগিটীটা থাকে, সেটাকে আমি জানি। তোমরা যে যাহা বলিতেছ, সকলের কথাই ঠিক। গিরগিটীটা বহুরূপী; কখন ওটা লাল হয়, কখনও সবুজ হয়, কখনও নীল হয়, কখনও হল্‌দে হয়, রকম রকম উহার গায়ের রং হইয়া থাকে। রংয়ের বদল অনবরতই হইতেছে। আবার কখনও কখনও দেখিতে পাই, উহা একেবারেই সাদা—কোনও রকম রংই নাই, একেবারে বর্ণশূন্য।

এই লোকটির কথা শুনিয়া উহাদের বিবাদ মিটিয়া গেল।

[এই গল্প বলিয়া ঠাকুর বলিতেছেন—ঈশ্বর লইয়াও এই রকম ঝগড়া-বিবাদ, তর্কবিতর্ক হইয়া থাকে। কেহ বলে, ঈশ্বর নিরাকার, কেহ বলে ঈশ্বর সাকার; আবার কেহ বলে, তিনি সগুণ; কেহ বলে নির্গুণ। ইহাদের সকলের কথাই ঠিক। তিনি শ্রীকৃষ্ণের মত মানুষের দেহ ধারণ

করিয়া আসেন, ইহাও সত্য; নানারূপে ভক্তকে দেখা দিয়া থাকেন, ইহাও সত্য। আবার তিনি নিরাকার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ এ কথাও সত্য। বেদে তাঁহাকে সাকার নিরাকার দুই বলিয়াছে, সগুণও বলিয়াছে, নির্গুণও বলিয়াছে। সকলের কথাই ঠিক; সকলের কথাই সত্য।]

৺কৃষ্ণদাস পাল।

৺কৃষ্ণদাস পাল খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। কিসে তিনি খাঁটি ছিলেন আমি সেইটুকু বুঝাইয়া বলিব। একদিন অপরাহ্নে কৃষ্ণদাসের বৈঠকখানায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছে, মিউনিসিপ্যালিটীর একটা ব্যবস্থার কথা লইয়া খুব আলোচনা চলিতেছে। চেয়ারম্যান স্যর ষ্টুয়ার্ট হগ কৃষ্ণদাসের বাটীতে আসিয়া বিতণ্ডার পরিসমাপ্তি করিবেন; সকলেই হগ সাহেবের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। নীচে বাটীর গেটের বাহিরে সাঁকোর উপর ঘনঘোর কৃষ্ণকায়, পাঁচী ধুতী পরিহিত প্রায় সর্ব্বাঙ্গ উলঙ্গ ঈশ্বর পাল উবু হইয়া বসিয়া আছেন। এমন সময়ে কড়বড় করিয়া ঘোরার খুরের শব্দ হইল, অশ্বারোহণে স্যর ষ্টুয়ার্ট হগ আসিলেন। তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার সহিস আসিয়া পৌঁছে নাই; তখন ঈশ্বর পালের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। সাহেব অমনি তাহাকে বলিলেন—"এই ঘোড়া পাকড়ো।" ঈশ্বর পাল চারিদিকে চাহিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে তাড়াতাড়ি কৃষ্ণদাস বলিলেন—"স্যর ষ্টুয়ার্ট উনি আমার জনক।" ইহাই কৃষ্ণদাস পালের বিশিষ্টতা। যাহার কক্ষে রাজা মহারাজা সবাই গড়াগড়ি যাইতেছে, যাঁহার গৃহে স্যর ষ্টুয়ার্ট হগ হাজির, সেই কৃষ্ণদাস অমন একটা কালা আদমী, কদাকার কুৎসিত, অর্দ্ধনগ্ন, দেশী—খাঁটি দেশী ঈশ্বরচন্দ্র পালকে অম্লানমুখে অকম্পিতকণ্ঠে যেন কতকটা দর্পদম্ভ প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণদাস বলিলেন, "স্যর ষ্টুয়ার্ট; উনি আমার জনক, তোমার ঘোড়ার সহিস নহেন।"

কৃষ্ণদাস খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন, তিনি নিজের বাপকে বাপ বলিতে পারিতেন, নিজের জননীকে জননী বলিতে পারিতেন। ভাল হউক, মন্দ হউক, সুন্দর হউক, কুৎসিত হউক, আমার জনকজননী আমারই জনকজননী; আমার দৃষ্টিতে অতি সুন্দর অতি মনোহর—সজীব, সাকার দেবতা! কৃষ্ণদাস নিজের জনককে ইংরেজী দৃষ্টিতে সুন্দর করিয়া লইবার কোনও চেষ্টাই কখনও করেন নাই, নিজেও কখনও সাহেব সাজেন নাই। লর্ড নর্থব্রুক, লর্ড লিটন, লর্ড রিপণ প্রভৃতি উদার শিষ্টাচারপরায়ণ বড়-লাটের পাল্লায় পড়িয়াও তিনি কখনও লাটবাড়ীতে এক পেয়ালা চা পান করেন নাই। সেই চুরুট মুখে দিয়া চুরুটের ফাঁক দিয়া গড়্-গড়্ করিয়া ইংরেজী বলিতেন, দেশের কাজ করিতেন এবং নিজের প্রজার গণ্ডীর মধ্যে সগর্ব্বে এবং সতেজে আবেষ্টিত থাকিতেন। তাহার পর তিনি খাঁটি 'ডিমক্রাট' ছিলেন। পাড়ার বামার মা, ক্ষেমীর পিসী, যেদো, মেধো যেমন তাহার কাছে অবাধে যাইতে পাইত, তিনি তাহাদের সুখ-দুঃখের কাজ যেমন অম্লানমুখে করিতেন, তেমনই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার কাজে প্রাণ ঢালিয়া লিপ্ত হইতেন। তিনি দেশটাকে, সাম্রাজ্যটাকে সাকল্যে—সর্ব্বাবয়বে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বুকের উপর রাখিয়াছিলেন বলিয়া জাতিবর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ইতর ভদ্র সকলের সেবা করিতে পারিতেন। সত্যই তিনি সেকেলের হিসাবে বড়লোক ছিলেন—সকলের মুরুব্বা ছিলেন। তিনি একালের হিসাবে ধনী বড়মানুষ ছিলেন না, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে ঘণ্টা নাড়িতে হইত না, কার্ড পাঠাইতে হইত না, মুহুরীর বা খানসামার সহিত মোলাকাৎ করিয়া উপদেবতার স্তব ও পূজা করিতে হইত না। খাঁটি বাঙ্গালার বড়লোক তিনি, তাঁহার সকল দরজা সকল সময় খোলা থাকিত, দেশবাসী সকলের সকল কথা তিনি শুনিতে ভালবাসিতেন—শুনিতে চাহিতেন! তাঁহার বিরক্তি ছিল না, দেশের জন্য "খাটিয়া খাটিয়া প্রাণ গেল" বলিয়া তাঁহার মুখে অহঙ্কারের স্পর্দ্ধা ফুটিত না। তিনি দেশের ও দশের হইয়া জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণদাসের এই বিশিষ্টতা কিসের জন্য ছিল? তিনি সত্যই দেশকে ও দশকে আপনার বলিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। এ পক্ষে তাঁহার তিলমাত্র ভাবের ঘরে চুরি ছিল না। তিনি দেশকে এবং দশকে ভালবাসিতেন বলিয়া বামার মার বকুনী, ক্ষেমীর পিসীর কাঁদুনী, যেধোর, মেধোর

আপসানী কাণ পাতিয়া শুনিতেন। তাহারা যে তাঁহার পাড়া-প্রতিবেশী, আপন জন! তিনি যে তাহাদের, তাহারা যে তাঁহার আপনার, তাই তিনি অবিচলিতচিত্তে, হাস্যমুখে যেমন তাহাদের কাজ করিতেন, তেমনই হিন্দু পেট্রিয়ট লিখিতেন, এসোসিয়েসনের কাজ করিতেন। আজকালিকার বাবুরা দেশ ও সমাজ হইতে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া আছেন; তাঁহারা দেশের একটু আধটু কাজ করিয়া মনে করেন, দেশের লোককে ও জাতিকে কৃতার্থ করিলাম, তাহারা আমার পদানত হইয়া থাকিবে। তাই তাহারা দুইটা বাজে লোকের সহিত দশটা কথা কহিয়া অবসন্ন হন আঃ উঃ করেন এবং ব্যাংয়ের ছাতার মত ঠেলিয়া উঠিয়া নেতাগিরির বাহার ফুটাইতে চেষ্টা করেন। ইহারা সবাই ভাবের ঘরে চোর। যদি তুমি দেশের দরিদ্র এবং মূর্খদের আপনার জন বলিয়া ভালবাসিতে না পার, তাহাদের বকবকানী সহিতে না পার, তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য সদা সচেষ্ট না হও, তাহাদের কুটীরে যাইয়া দাঁড়াইতে না পার, তাহা হইলে কেমন করিয়া বলিব তুমি দেশভক্ত—মাতৃভক্ত। আবার বলি, ভাল হউক, মন্দ হউক, সুন্দর হউক, কুৎসিত হউক, আমার দেশ, আমার জাতি, আমার জনক, আমার জননী বলিয়া কৃষ্ণদাস দেশের ও জাতির সর্ব্বস্বটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি তজ্জন্য কখনও লজ্জাবোধ করিতেন না, নিজেকে হীন বোধ করিতেন না; তাই তিনি হিন্দু, তাই তিনি হিন্দুয়ানীর হিসাবে বড় 'ডিমক্রাট' ছিলেন।

কৃষ্ণদাসের হিসাবে বড়লোক এদেশে ক্রমে লোপ পাইতেছে। এখন অনেকে ধনী হইয়াছে, অনেকে দুই দিনের দুনিয়ার দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া বেজায় ভারী হইতেছেন, বড় মানুষ হইতেছেন, কৃষ্ণদাসের আদর্শের বড়লোক মুরব্বী আর নাই বলিলে চলে। এক আছেন মান্যবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার কাছেও সেই পুরাতন বাঙ্গালার পুরাতন পদ্ধতি বিরাজমান। অবারিতদ্বারে যে ইচ্ছা সে যাও, একটু চাপিয়া ধরিলে যাহার তাহার নামে সুপারিস চিঠি আদায় করিতে পার। এই দুইদিন হইল এক গরীবের গরু মরিয়াছে সেও সুরেন্দ্র বাবুর দ্বারস্থ। কৃষ্ণদাসের আদর্শের নেতা ও বড়লোক ঐ এক সুরেন্দ্রনাথ আছেন।

আজ মনে পড়ে কৃষ্ণদাসকে জাতির ভাগ্যের এই সন্ধিক্ষণে, জগতের এই মহামুহূর্ত্তকালে মনে পড়ে সেই স্থিরমনীষী দূরদর্শী কৃষ্ণদাসকে। তিনি সত্যই

বাঁচিয়া থাকিলে আধুনিক হঠাৎ নায়ক কালুকা নেতার দল তাঁহার সহিত কেমন ব্যবহার করিতেন বলিতে পারি না, হয়ত সে বৃদ্ধকে স্পর্দ্ধার দল পিঞ্জরাপোলে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিত। কৃষ্ণদাস যে বেজায় ভালমানুষ ছিলেন, ইংরেজ সিবিলিয়ানদের পোষ মানাইতে জানিতেন, তাহা নহে। তিনি বিষয়-বিশেষে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিতেন। আসামের কুলি আইন হইবার সময়ে তিনি যে সব সন্দর্ভ পেট্রিয়টে ছাপাইয়াছিলেন তাহা এখন ছাপিলে ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত হয়। মান্যবর লায়ান সাহেবকে তাই একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কৃষ্ণদাসকে ত অত মিঠে মানুষ করিয়া চিত্রিত করিয়াছ, স্যর জর্জ্জ ক্যাম্বেলের বিরুদ্ধে তাঁহার লেখা এবং আসাম কুলি আইনের লেখাগুলি আমাকে পুনর্মুদ্রিত করিবার অনুমতি দিতে পার? কৃষ্ণদাস কেবলই নরম ছিলেন না—নরম গরম দুই ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের শাসক-সম্প্রদায়ের সহিত আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। আজ তিনি বা তাঁহার মত কেহ থাকিলে একটা সওদার বন্দোবস্ত হইতে পারিত। তিনি ভুলিতেন না এবং কাহাকেও ভুলিতে দিতেন না যে, আমরা প্রজার জাতি, রাজা ইংরেজের বিদ্যা-বুদ্ধি, শিক্ষা-সভ্যতা সর্ব্বস্বই আমাদের গ্রহণ করিতে হইতেছে; ইংরেজ আমাদের আদর্শ। অন্য সকল যেমন আমরা ইংরেজের নিকট হইতে গ্রহণ করিতেছি, রাজনীতিক অধিকারও তেমনি গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের যাহা সহে ও রহে, তিনি তাহাই লইতে পরামর্শ দিতেন। এই সন্ধিক্ষণে তাঁহার মত বিচক্ষণ রাজনীতিকের প্রয়োজন।

আমার দুঃখ এই, আমরা বড় শীঘ্র শীঘ্র সব ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছি। বাঙ্গালার গত চল্লিশ বৎসরের রাজনীতিক ইতিহাস আমরা ভুলিয়াছি। যাঁহারা নেতা হইতে চাহেন, তাঁহারা পুরাতন ইতিহাস-কথা শুনিতে বা সংগ্রহ করিতে শ্রমস্বীকার করেন না। সত্যই আমরা কৃষ্ণদাস পালকে ভুলিয়াছি; তাঁহাকে চিনিতে ভুলিয়াছি, তাঁহাকে বুঝিতে ভুলিয়াছি। তাই তাঁহার নাম ধরিয়া আমরা আমাদের মনের কথা তাঁহার উপর আরোপ করিতে চেষ্টা করি। ইহা ঠিক নহে। লোকটা কেমন ছিল ও কি ছিল সেইটুকু বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। সে বোধের পক্ষে গত চল্লিশ বৎসরের রাজনীতিক ইতিহাসের আলোড়ন আমাদের সহায়তা করিবে। আমি কৃষ্ণদাস পালকে প্রথম কিশোরেই দেখিয়াছিলাম। আমার মনে আছে, কৃষ্ণদাস পাল একজন খাঁটি দেশাত্মবোধপ্রবুদ্ধ বিরাট পুরুষ ছিলেন। আমার মনে আছে, কৃষ্ণদাস দেশ-

টাকে ও জাতিটাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন—আপনার বলিয়া দেশের সর্ব্বস্বটাকে জড়াইয়া ধরিতে জানিতেন। আমার মনে আছে, কৃষ্ণদাস নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও মনীষার পুঁটুলি অহঙ্কারের কুক্ষিতে সংগ্রহ করিয়া স্বদেশ ও স্বসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া উচ্চে দাঁড়াইয়া দেশের ও জাতির প্রতি অনুকম্পা-পরায়ণ হইয়া অবসরমত দেশসেবা করিতেন না। আমার মনে আছে, কৃষ্ণদাস যেমন দর্পদম্ভের সহিত নিজের বাপকে বাপ বলিয়াছিলেন, তেমনই দর্পদম্ভের সহিত নিজের দেশকে ও নিজের জাতিকে আমার নিজের বলিয়া শ্লাঘা করিতে পারিতেন। তাই কৃষ্ণদাস দেশের সকলের কৃষ্ণদাস ছিলেন, তাহার পর ছিল না—সবাই আপনার অন্তরঙ্গ পুরুষ ছিল। ধনী নির্ধন কেহই তাঁহার দানের সহায়তায়—অনুকম্পার সাহায্যে—সাহচর্য্যে বঞ্চিত ছিল না।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

আহুতি।

(৭)

শিবানীর অতটা ভালমানুষী নবকৃষ্ণ মানদার প্রীতিকর হইলেও রাঙ্গাদিদি প্রমুখ পাড়ার যত ক্রূরপ্রকৃতি, নিষ্কর্ম্মা, পরচর্চ্চাপ্রিয় লোকেদের সেটা মোটেই ভাল লাগিত না। তাহারা সুযোগ পাইলেই শিবানীকে পরামর্শ দিতে ক্রটী করিত না। রাঙ্গাদিদি মানদার ভয়ে নবকৃষ্ণের বাটীর দিকে যাইত না বটে, কিন্তু অন্তরালে পাইলেই শিবানীকে নানা উপদেশ দিতে কোনও মতে কৃপণতা করিত না।

শিবানী সকল লোকের সকল প্রকার উপদেশ নীরবে শুনিত। কাহারও বাক্যের কোন উত্তর বা প্রতিবাদ করিত না।

দুই তিন বৎসর বেশ নির্ব্বিবাদে কাটিয়া গেল। কিন্তু যে জন্য শিবানীকে বিবাহ করিয়া নবকৃষ্ণ গৃহে আনিল, তাহার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। সকলে মনে করিল, শিবানীও বুঝি বন্ধ্যা হইল। নবকৃষ্ণ বড় আশায় ক্রমশঃ নিরাশ হইয়া পড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে শিবানীর প্রতি তাহার যে সহানুভূতিটুকু ছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইতে বড় বিলম্ব হইল না। ইহার উপর শিবানীকে বিবাহ করার এক বৎসর পরেই নবকৃষ্ণের চাকুরীতে পেনসন হইয়া গেল; বয়স হইয়াছে বলিয়া সাহেব কর্ম্ম হইতে অবসর প্রদান করিল।

নবকৃষ্ণের ধারণা যে অলক্ষ্মী শিবানীকে গৃহে আনিয়াই ইহা ঘটিল ; তাহার এমন কি বয়সও হইয়াছে যে সে চাকুরী করিতে পারে না !

সময়ে সময়ে শিবানীর প্রতি মানদা ইদানীং বড় রূঢ় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ঐ গেল, ঐ ফেল্লে, ঐ নষ্ট কল্লে, ডোক্‌না, অপয়া, হাড়-হাবাতে ইত্যাদি মধুর বচন নিয়তই তাহার প্রতি বর্ষিত হইত। নবকৃষ্ণ তাহা নিবারণ না করিয়া বরং তাহাতে পোষকতা করিত। শিবানী কলের পুতুলের মত চলিত, ফিরিত, উঠিত, বসিত ; প্রাণপণে খাটিত। কিন্তু যেন প্রাণ নাই ; কাণে যেন কিছুই প্রবেশ করে না, অঙ্গে যেন কিছুই বেঁধে না, এমনিতর ভাব। মানদা ইহাতে আরও জলিয়া যাইত, ভাবিত ইহা শিবানীর গর্ব্বিত ভাব ; মানদাকে উপেক্ষা করা, সুতরাং লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না। শিবানী বুঝিত এই দুর্ব্যবহার মানদার ইচ্ছাকৃত নয়, সপত্নী-বিদ্বেষই তাহাকে ইহা করাইতেছে।

কয়েক দিন হইতে প্রত্যহ রাত্রে শিবানীর অল্প অল্প জ্বর হইতেছিল। উপবাস করিয়া করিয়া শরীর দুর্ব্বল। তাহার উপর সাংসারিক কর্ম্মের পরি-শ্রমে ক্লান্ত দেহ যেন টানিয়া তুলিতে পারিতেছিল না। এ সব দেখিয়াও মানদা দুপুর বেলায় আহারাদির পর সইএর বাটী বেড়াইতে যাইবার সময় শিবানীকে বলিয়া গেল—"ছাদে মটর শুখাতে দিয়াছি, ভাঙ্গিয়া রাখিস্।"

শিবানী সমুদয় উচ্ছিষ্টাদি পরিষ্কার করিয়া পুকুরে কাপড় কাচিতে গেল। সে কাপড় কাচিয়া জলের কলসী কক্ষে লইয়া যেমন ঘাট হইতে উঠিতে যাইবে অমনি পা পিছলাইয়া পূর্ণকুম্ভ সমেত পড়িয়া গেল। কপালটা কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল ; কোমরে অত্যন্ত আঘাত পাইল। শীঘ্র উঠিতে পারিল না, দুর্ব্বল দেহে অতি কষ্টে ধীরে ধীরে উঠিয়া সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কেহ কোথায় আছে কিনা।

এমন সময় পিছন হইতে কে বলিল—"আহা, পড়ে গেছ বুঝি।"

মুখ ফিরাইয়া শিবানী দেখিল, যশোদা বাসন মাজিতে ঘাটে আসিতেছে।

যশোদা সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বলিল—"এমন লোকের পাল্লায় পড়েছ, বৌ দিদি, গতরটা যে ছেঁচে গেল তা দেখবে না, কলসী ভেঙ্গেছে কি না তাই আগে দেখ্‌বে। আহা! কয়দিন উপবাস যাচ্ছে, তার উপর এই খাটুনী, মানুষের শরীরে কি অত সহ্য হয়! সোনার অঙ্গ কালী হয়ে গেছে! দেখ, বৌদিদি বাড়ী গিয়ে মটর ভাঙ্গিতে বস না ; একটু শোওগে যাও। আমি এই

বাসন ক'খানা মেজে শিগ্‌গির যাচ্ছি, তোমার মটর আমি ভেঙ্গে দেব এখন।"

যশোদা বাস্তবিক শিবানীকে অত্যন্ত স্নেহ করিত। সে গোয়ালার মেয়ে, তাহাতে মানুষের প্রাণ ছিল। সে যতটা পারিত শিবানীর সাহায্য করিত। ছোটবেলা হইতে সে শিবানীকে দেখিয়া আসিতেছে, শিবানীর উপর তাহার বড় মমতা। নবকৃষ্ণের বাটীর পার্শ্বেই তাহাদের বাটী। শিবানীর অবস্থা সে ভালরকমই জানিত। আজ যখন মানদা শিবানীকে মটর ভাঙ্গিতে বলিয়া সইএর বাটীতে বেড়াইতে গেল যশোদা সে সব কথা শুনিয়াছিল। সে শিবানীর সাহায্যের জন্য তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া লইতে ঘাটে আসিয়া দেখিল, শিবানী পড়িয়া গিয়া অতি কষ্টে উঠিল। মনে মনে সে মানদাকে অভিসম্পাত করিতে করিতে শিবানীর নিকট উপস্থিত হইল।

শিবানী সামলাইয়া ব্যস্তভাবে বলিল—"না, না, বেশী লাগেনি। আমি মটর ভাঙ্গতে পারব, তোমাকে আর ভাঙ্গতে হ'বে না। তাই ত ঘড়াটা টোল খেয়ে গেছে দেখছি।"

যশোদা ক্রুদ্ধভাবে বলিল—"টোল খেয়েছে ত কি হবে; ভয় দেখে বাঁচি না। অত ভয় কর বলেই অত দুর্গতি করে; গতরটা যে ভেঙ্গে গেল তা' দেখবে না। কাজ আর সংসার নিয়েই গেলে। আমি যা বলি শোন; বাড়ী গিয়ে একটু শুয়ে থাকগে, আমি এখনি যাচ্ছি।"

শিবানী ভয়ে ভয়ে বাটী প্রবেশ করিয়া দেখিল, মানদা বাটী আসিয়াছে। শিবানীকে দেখিয়া মানদা বলিয়া উঠিল—"বলি সুয়োরাণী, এই দাসী বাঁদীর কথাটা কাণে যায়নি না, গ্রাহ্য হয় নি। মটরগুলো সব পায়রা এসে খেয়ে ফেল্লে, না ভাঙ্গতে পারিস তুলেও কি রাখতে নেই; এত লোকসান যে দেখতে পারিনা; ঘাটে গেছিস ত আজ নয়। গল্প করা কি বাড়ী বসে হয় না? ওমা, ঘড়াটাকে ভাঙ্গলি কি করে; সেদিন পাঁচ টাকা দিয়ে ঘড়াটা কিন্‌লাম। এমন আস্কুটে, হাড়হাবাতে ত কখন দেখিনি। তা' হবে না যেমন ঘরের মেয়ে; ওরা কি আর জিনিসপত্রের যত্ন জানে। বলি চুপ করে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলে যে, কি করে ভেঙ্গে ফেল্লি বল না।"

শিবানী আস্তে আস্তে ঘড়া নামাইয়া ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর করিল—"হাত ফস্‌কে পড়ে গেছলো।"

মানদা গর্জ্জন করিয়া বলিল"—কেন ভাত খাওনা নাকি। হাত পায়ে

বল নেই, হাত কসকে পড়ে যায়। কাঁড়ি কাঁড়ি গিলতে পার, আর কাজের বেলা শক্তি থাকে না, জিনিস ভাঙ্গ।”

এমন সময় নবকৃষ্ণ বহির্বাটী হইতে আসিয়া শিবানীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—“দূর করে দাও বাড়ী থেকে, আপদ বিদেয় হলে বাঁচি। কেবল লোকসান, কেবল ক্ষতি ভিন্ন কথা নেই। এ সংসারে এসে পর্য্যন্ত আমার সব উড়ে পুড়ে যাচ্ছে। কি দুর্ব্বুদ্ধিই ঘটেছিল আমার! সর্ব্বেশ্বর হালদার আমার সর্ব্বনাশের জন্যই ছটো পাপ রেখে গিছলো। দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে!”

শিবানী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; কোন কথার উত্তর করিল না। ভিজা কাপড় গায়ে শুখাইয়া গেল; কপালের জমাট বাঁধা রক্তটা উত্তেজনায় আবার ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। জ্ঞানহীনার মত মুহ্যমান হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যশোদা আসিয়া হাত ধরিয়া ঠেলিয়া বলিল—“তুমি কি মেয়ে, ছোট বউ-দিদি, ভিজে কাপড় গায়ে শুখিয়ে গেল, এখনও ছাড়নি, যাও কাপড় ছাড়গে।

যশোদা শিবানীকে ঠেলিয়া গৃহমধ্যে পাঠাইয়া দিল।

“এক ছিলুম তামাক সাজ ত যোশী, এই কথা যশোদাকে বলিয়া নবকৃষ্ণ রোয়াকে গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল।

মানদা তখন অনর্গল বলিয়া যাইতেছে—“আমি বলি, তোর ভালর জন্যে। সংসারের কিছু কি আমার সঙ্গে দিবি? আমি আর ক’দিন; যা’ থাকবে, তোরই থাকবে, সেটা বুঝিস্ না, এই আমার দুঃখু”—যশোদার আগমনে এইরূপ প্রকার নানা উপদেশ শিবানীর প্রতি বর্ষণ হইতে লাগিল।

ইদানীং শিবানীর এ রকম লাঞ্ছনা নিত্যই চলিত। শিবপ্রসাদ মধ্যে মধ্যে ভগ্নীকে দেখিতে আসিয়া তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইত। কয়েক দিন হইতে সে আর শিবানীকে দেখিতে আসে নাই। শিবানী প্রত্যহ আশা করিয়া থাকিত আজ দাদা দেখিতে আসিবে; আশায় আশায় দিন কাটিত। ক্রমে সূর্য্য দিবসান্তে অবসরপ্রাপ্ত কেরাণীকুলের মত ধীরে ধীরে দিক্-চক্রবালের অন্তরালে গমন করিয়া সন্ধ্যার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিয়া দিত। শিবানীও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিরাশার ব্যথাভরাচিত্তে ভ্রাতার অশুভ চিন্তায় কাতর হইয়া পড়িত।

এইরূপে কিছু দিন গত হইলে একদিন শিবানী শুনিতে পাইল মানদা বলিতেছে—“হবে না, ভগবান কি নেই? এখনও রাত দিন হচ্ছে। আমার

সাদা মনে কালি দিয়েছে; আমার সাধের সুখের সংসারে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, সে যদি পাগল না হবে তবে কে হবে? পাপের শাস্তি যাবে কোথায়?"

বিপুল বিক্ষোভাগ্নির একটা তপ্ত হল্‌কা যেন শিবানীর সর্ব্বাঙ্গ ঝলসাইয়া দিয়া গেল। শিবানী জানিত মানদার যত আক্রোশ শিবপ্রসাদের উপর পড়িয়াছিল। সে যদি এ ঘরে বোনের বিবাহ না দিত তাহা হইলে ত এ আপদ জুটিত না; তাহার এ জ্বালা পোহাইতে হইত না।

শিবানী বুঝিল তা'র কপাল ভাঙ্গিয়াছে। তাহার চিন্তাই তাহার দাদার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটাইয়াছে। সে আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল "কি করিলে ঠাকুর, এত পাপ করিয়াছিলাম যে তা'র কি মার্জ্জনা নাই? হে জগদীশ্বর, আমাকে যত দুঃখ দাও, বুক পেতে নেব, আমার দাদাকে কেন অমন করে দিলে, তাঁ'র মতি ফিরিয়ে দাও। আর যদি সবই নিলে হরি, তবে আর আমাকে কেন রাখ্‌লে; নাও আমাকে, তোমার অভয় শান্তিময় কোলে টেনে নাও; আর ত পারি না; আর যে সহ্য হয় না। কোথা তুমি, মৃত্যু, এস চিরশান্তিময় প্রিয় বন্ধু, এস তাপিতের অবলম্বন, শিবানীকে ডেকে নাও!"

ভগবানের দয়া হইল না। শিবানীর মৃত্যু বা শিবপ্রসাদের বিকৃত মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। উন্মত্তাবস্থায় শিবপ্রসাদ কোথায় চলিয়া গেল, কেহ কোন সন্ধান লইল না।

দুঃখের উপর ক্রমাগত দুঃখ দিয়া এত দিন পরে বিধাতার বুঝি দয়া হইল। শিবানীর সন্তান-সম্ভাবনা জানা গেল। নবকৃষ্ণের আনন্দের সীমা রহিল না।

যথাসময়ে শিবানী এক কন্যা সন্তান প্রসব করিল। অপুত্রক নবকৃষ্ণ পুত্র-মুখ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বঞ্চিত হইয়া প্রথমে কিছু ক্ষুণ্ণ হইল বটে, পরে কন্যার মুখ দেখিয়া সব ভুলিয়া গেল।

মানদা বলিল—"মেয়েই বা ক'টা আছে। ওই আমার সাত রাজার ধন মাণিক।"

তাহার শুষ্ক বুকটা মাতৃত্বের উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ক্ষুদ্র শিশুর মুখ চুম্বন করিয়া যেন সে নূতন জগতের অস্তিত্ব অনুভব করিল। তাহার মন হইতে আজ যেন সমস্ত ময়লা ধুইয়া গিয়া সেই শিশুর মুখের মতই পবিত্র

স্বচ্ছতায় টল্ টল্ করিতেছিল। নিজের অভাগ্য অতৃপ্ত অক্ষমতার ক্ষোভ-জীর্ণ মনটা শিবানীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল।

শিবানী কন্যাকে সপত্নীর ক্রোড়ে অর্পণ করিয়া বলিল—"নাও, দিদি, তোমার মেয়ে নাও; আজ হ'তে তুমি ওর মা।" মানদার স্নেহসিক্ত আর্দ্র চক্ষের দুই বিন্দু কম্পিত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। আনন্দোচ্ছ্বসিত বক্ষে শিশুকে চাপিয়া পুনঃ পুনঃ মুখ চুম্বন করিয়া মানদা বলিল—"শিবানী, আজ তুই আমার প্রাণ ঠাণ্ডা কর্‌লি। এত দিনের অতৃপ্তির জ্বালা আজ জুড়িয়ে দিলি।"

নিঃসন্তান মানদা সপত্নী-তনয়াকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া মাতৃস্নেহে পালন করিতে লাগিল।

ক্রমে আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন শীতের সন্ধ্যায় শিবানী রন্ধন চাপাইয়া কলসী লইয়া পুষ্করিণীতে জল আনিতে গিয়াছে। জল লইয়া গৃহে ফিরিবার সময় হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া আম বাগানের দিকে চাহিয়া রহিল। বাগানের পাশে পথের ধারে একজন লোক বসিয়া আছে। এই পৌষের দারুণ শীতে অনাবৃত দেহে শতছিন্ন মলিন বস্ত্র! ধূলি-ধূসরিত ক্ষীণ শরীরখানি যেন ক্লান্তিভরে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। বোধ হইল, তাহার দাদা শিবপ্রসাদ।

শিবানীর সর্ব্বাঙ্গ থর থর কাঁপিয়া কক্ষস্থিত জলের কলসী পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। অতি কষ্টে তাহা সামলাইয়া, কলসী পথিমধ্যে নামাইয়া বৃক্ষ-তলে অগ্রসর হইয়া দেখিল, সত্যসত্যই তাহার দাদা, শিবপ্রসাদ। সে গৌরবর্ণ নাই, সে সুঠাম গঠন নাই, দেহ জীর্ণ শীর্ণ, কালিমামাখা কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট, কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন!

অস্ফুট চীৎকার করিয়া শিবানী সেইস্থানে বসিয়া পড়িল। দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া শিবানী ডাকিল—"দাদা।"

কেই বা তা'র ডাক শুনিল? কেই বা উত্তর দিবে? উন্মাদ মৃদু মৃদু হাসিয়া কি বলিল। শিবানী বুঝিতে পারিল না। খানিক পরে শিবানীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"কেমন আহুতি দিয়েছি। বড় ক্ষিদে পেয়েছে: দু'টী ভাত দেবে।"

শিবানী আর চাপিয়া থাকিতে পারিল না; দম ফাটিবার উপক্রম হইল। বাড়ী গিয়া ত কাঁদিতে পারিবে না, তাই সে সেখানে বসিয়া খুব কাঁদিয়া মনের ভার লাঘব করিল।

শিবানীর মনে পড়িল সে রাস্তায় বসিয়া আছে; এখনই কেহ আসিয়া পড়িবে। অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া উঠিয়া বলিল—"আমার সঙ্গে এস ভাত দিব।"

পাগল উঠিল। শিবানীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া তাহাদের বাটীর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল।

আজ শিবানী বড় দুঃসাহসের কাজ করিয়াছে। আজ সে মানদাকে না জানাইয়া শিবপ্রসাদকে ভাত দিল। সে জানিত, তাহার সপত্নীকে জানাইলে তাহার ভাইকে দু'টা ভাত দিয়াও তৃপ্ত হইতে পারিবে না। যত লাঞ্ছনাই অদৃষ্টে থাকুক, আজ সব সে বুক পেতে সহিবে বলিয়া, আপনাকে খুব শক্ত করিয়া লইয়াই দাদাকে ভাত দিয়া বলিল—"দাদা, খাও।"

শিবপ্রসাদ আহারে বসিল।

নবকৃষ্ণ তখন বাটী ছিল না। মানদা শিবানীর মেয়েকে ঘরের মধ্যে দুধ খাওয়াইতেছিল। বাহির হইয়া দেখিল, শিবানী রান্নাঘরের রোয়াকে একটী লোককে খাওয়াইতে একান্ত নিবিষ্টচিত্ত। সে অবাক হইয়া গেল, তার পর বুঝিল লোকটী আর কেহ নয়—শিবানীর ভাই, শিবপ্রসাদ।

কি এতদূর স্পর্দ্ধা! এত স্বাধীনতা! তাহাকে না জানাইয়া এই গৃহিণীপণা! মানদার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কিছু না বলিয়া স্থির-ভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

উঠানে গোলার তলায় একটা কুকুর বসিয়াছিল। সে একদৃষ্টিতে শিব-প্রসাদের ভাতের থালার দিকে চাহিয়া লেজ নাড়িতেছিল। পাগলের দৃষ্টি তাহার প্রতি পড়িল। "তোর ক্ষিদে পেয়েছে, ভাত খাবি, এই নে"—বলিয়া শিবপ্রসাদ থালা সহিত ভাত কুকুরটার সম্মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। ঝন ঝন শব্দে থালাখানা বাজিয়া উঠিল, কুকুরটা ভয়ে পলাইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শিবপ্রসাদ "আয়, আয় ভাত খাবি আয়" বলিতে বলিতে চলিয়া গেল।

শিবানী প্রমাদ গণিল।

এইবার মানদা গর্জ্জন করিয়া উঠিল। "পোড়ারমুখী এত বড় বুকের পাটা হয়েছে—আমাকে জিজ্ঞাসা নাই, বলা নাই, এত গিন্নিপণা, আমি কেউ নয় না? তুই মনে করেছিস মেয়ের মা হ'য়ে রাজা হ'য়েছিস্। আমি বাঁদী, আমাকে জিজ্ঞাসা করবার দরকার কি! আজ বাড়ী আসুক আগে, আমি কেউ কিনা তা' পরে জানাব। এত তেজ, এত দর্প! ভাল চাস ত ঐ সব

পরিষ্কার করে ঘাট থেকে নেয়ে আয়। নেয়ে এসে, তবে হেঁসেল ছুঁতে পাবি।"

মানদা যতক্ষণ চীৎকার করিয়া পাড়া মাথায় করিতেছিল, শিবানী ততক্ষণ উচ্ছিষ্টগুলি পরিষ্কার করিয়া সেই শীতের রাত্রে একাকিনী পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গেল।

নবকৃষ্ণ বাড়ী ঢুকিয়া বলিল—"ব্যাপার কি এত চেঁচাচ্চ কেন?"

কণ্ঠস্বর আরও উচ্চে তুলিয়া মানদা গর্জ্জিয়া উত্তর করিল—"চেঁচাচ্চি কেন, বুঝ্‌তে পাচ্চি না। সংসারের কি আর লক্ষ্মীশ্রী আছে? যেদিন পোড়াকপালী বাড়ী ঢুকেছে, সেদিন লক্ষ্মী চলে গেছে। মিটমিটে ডান ছেলে খাবার রাক্কস। যেন কত ভাল মানুষ, কিছুই জানে না। এত লোকসান কি দেখা যায়? থালা বাটি ভেঙ্গে তচ্‌নচ্‌! তুমি ত ওর দোষ দেখতে পাও না! সুয়ো রাণীর সব ভাল, দুয়ো দু' চক্ষের বিষ!"

নবকৃষ্ণ মানদার ক্রোধের কারণ জানিতে ব্যগ্র না হইয়া নিরুত্তরে হুঁকা কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে বসিয়া গেল।

নিষ্ফল আক্রোশে গস্ গস্ করিতে করিতে মানদা ঘরের মধ্যে গিয়া ঝনাৎ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

বিবেকানন্দের উপদেশ।

ধর্ম্মই ভারতের সর্ব্বস্ব।

ভারতে ধর্ম্মই জাতীয় হৃদয়ের মর্ম্মস্থলী। ঐ ভিত্তির উপরই জাতীয় প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত। রাজনীতি, প্রভুত্ব, এমন কি বিদ্যাবুদ্ধির চর্চ্চাও এখানে গৌণ মাত্র—ধর্ম্মই সুতরাং এখানকার একমাত্র কার্য্য—একমাত্র চিন্তা। * * * রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় কখনও ভারতীয় জীবনের অত্যাবশ্যক বিষয় বলিয়া পরিগণিত হয় নাই—ধর্ম্ম-অবলম্বনেই কেবল ভারত চিরকাল বাঁচিয়া আছে ও উন্নতি করিয়াছে এবং উহার সহায়তাতেই ভবিষ্যতে উহা জীবন ধারণ করিবে।

ভারতের মেরুদণ্ড—ধর্ম্ম।

ভারতের ধর্ম্মজীবনই জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ, উহাই যেন জাতীয় জীবনরূপ সঙ্গীতের প্রধান সুর। * * * সুতরাং যদি তোমরা ধর্ম্মকে কেন্দ্র না করিয়া, ধর্ম্মকেই জাতীয় জীবনের জীবনীশক্তি না করিয়া, রাজনীতি, সমাজনীতি বা অপর কিছুকে উহার স্থলে বসাও, তবে তাহার ফল এই হইবে যে, তোমরা একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। যাহাতে এরূপ না ঘটে, তজ্জন্য তোমাদিগকে তোমাদের জীবনীশক্তিস্বরূপ ধর্ম্মের মধ্য দিয়া সকল কার্য্য করিতে হইবে। তোমাদের স্নায়ুতন্ত্রী তোমাদের ধর্ম্মরূপ মেরুদণ্ডে দৃঢ়সম্বদ্ধ হইয়া তাহাদের সুর বাজাইতে থাকুক।

'দানমেকং কলৌ যুগে।'

এখন দানই একমাত্র কর্ম্ম। দানের মধ্যে ধর্ম্মদান, আধ্যাত্মিক জ্ঞানদানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। দ্বিতীয় বিদ্যাদান, তৃতীয় প্রাণদান, চতুর্থ অন্নদান।

ভারতের দানশীলতা।

এই দরিদ্র, অতি দরিদ্র দেশে (ভারতে) লোকে কি পরিমাণ দান করে, লক্ষ্য কর। এখানে লোকে এরূপ আতিথেয় যে, যে কোনও ব্যক্তি বিনা সম্বলে ভারতের উত্তর প্রান্ত হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারে। লোকে পরমাত্মীয়কে যেমন যত্নের সহিত সেবা করে, তদ্রূপ তিনি যেখানে যাইতেন, লোকে সেই স্থানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তুসমূহের দ্বারা তাঁহার সেবা করিবে। এখানে কোথাও যতক্ষণ এক টুকরাও রুটি থাকিবে, ততক্ষণ কোন ভিক্ষুককেই না খাইয়া মরিতে হয় না।

'অর্ঘ্যে'র নিয়মাবলী।

'অর্ঘ্যে'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহর ও মফস্বল সর্ব্বত্র বার আনা। ভিঃ পিঃতে লইলে ইহার উপর এক আনা অতিরিক্ত কমিশন লাগে।

'অর্ঘ্যে'র জন্য প্রবন্ধ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দিবার নিয়ম নাই। লেখকেরা নকল রাখিয়া প্রবন্ধ পাঠাইবেন।

টাকা-কড়ি, প্রবন্ধ, বিনিময়ের কাগজ এবং চিঠিপত্র নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নামে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন,

অর্ঘ্য-কার্য্যালয়,

৫৩ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ARGHYA, REG. NO. C 691.

৯ম বর্ষ] [৫ম সংখ্যা।

অর্ঘ্য

September, 1918.

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন শ্রীসুরেশচন্দ্র পালিত, বি-এল্

কার্য্যালয়—৫৩ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্য-লিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন, বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে 'সুরমা'র বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা 'সুরমা' ব্যবহার করিলে ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যে "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে। বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ।৶৹ সাত আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ৸৶৹ তের আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকল প্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি, ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ॥৶৹ এগার আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষম জ্বর এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

শ্রীশক্তিপদ সেনগুপ্ত কবিরাজ—আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড টেরিটীবাজার, কলিকাতা।

"কেন হেন বারে বারে"

ওরফে

আশ্রম-চতুষ্টয়। (১)

ভগ্নহৃদয় হতাশপ্রেমিক প্রাণের দারুণ আবেগে আক্ষেপ করিয়া গায়িয়াছেন—

কাঁদাইয়া অভাগারে কেন হেন বারে বারে
গগন-মাঝারে শশী 'আসি' দেখা দেয় রে!

আজ এই সান্ধ্য-সম্মিলনে সমাগত ভদ্র মহোদয়গণের মধ্যে অনেকেই হয়ত আমাকে দেখিয়া সেই সুরে সুর মিলাইয়া ধরিবেন—

জ্বালাতন করিবারে কেন হেন বারে বারে
সভার মাঝারে তুমি আসি' দেখা দাও রে!

অবশ্য এই সভামণ্ডপ কবির কাব্যাকাশ নহে, আর আমিও দয়িতাহীনের হৃদয়ে দবদহনবৎ প্রতীয়মান তুহিনদীধিতি নহি। কিন্তু তথাপি আমি জানি যে, তোমারা আমার উপর চটিয়াছ। চটিবে বৈ কি? কারণ, কুইনাইনকে কে কোন্ কালে ভালবাসে? তোমাদের সামাজিক জীবন হিন্দুশাস্ত্রের যে সকল প্রাচীন আজগুবি আচার-অনুষ্ঠানরূপ ম্যালেরিয়া জ্বরে জর্জ্জরিত হইয়া যমালয়ের পথে অগ্রসর হইতেছিল, আজকাল সৌভাগ্যক্রমে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে তাহাদের বন্ধন অপেক্ষাকৃত অনেক শিথিল হইয়াছে, এবং তোমরা ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র-প্রমুখ মনীষিগণের মস্তিষ্কোদ্ভূত

---

(১) রজনীকান্ত গুপ্ত-স্মৃতিপাঠাগারে সান্ধ্যসম্মিলনে পঠিত; ২৪এ কার্ত্তিক, ১৩২৩ এবং 'সৎসঙ্গে' 'নায়ক' কার্য্যালয়ে পুনঃপঠিত; ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩২৩।

"বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার"-জাতীয় প্রবন্ধপাঠে পরিমার্জ্জিতচিত্ত হইয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিলে তাহা আরও শিথিল হইয়া ক্রমে একেবারেই অন্তর্হিত হইবে, সে দিন 'সতাং সঙ্গে' এই সুসমাচার ও সদুপদেশ তোমাদিগকে দিবার জন্য, বর্ত্তমান কালের ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইনের ন্যায় 'বাহাদুর' সাজিয়া বাহাদুরী লইতে গিয়াছিলাম, তাই তোমরা আমার উপর চটিয়াছ। কিন্তু চট, তাহাতে আমার দুঃখ নাই। কারণ তোমরা শুন আর নাই শুন, আমার বক্তব্য আমি বলিব; তোমরা কর আর নাই কর, আমার কর্ত্তব্য আমি করিব। সেবার তোমরা আমাকে ডাকিয়া আনিয়াছিলে, কিন্তু এখন হইতে না ডাকিলেও আসিব। মনে রাখিও, তোমরাই কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখাইয়াছ।

আমার বক্তব্য অনন্ত। আমি যদি আমার সকল কথা তন্ন তন্ন করিয়া বলিতে যাই, তাহা হইলে কয়খানি 'এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা'র সৃষ্টি হইবে তাহা বলা যায় না। [তোমরা হইলে এখানে বোধ হয় মহাভারতের তুলনা দিয়া বসিতে !] অতএব আমার সকল কথা আমি একদিনে বলিতে পারিব না। যত বার সভাসমিতিতে আসিব, প্রত্যেক বারেই কিছু কিছু করিয়া বলিব। এবার প্রাচীন আর্য্যগণের নির্বুদ্ধিতার পরাকাষ্ঠার পরিচায়ক দ্বিজাতিগণের অনুষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-চতুষ্টয়ের মুণ্ডভোজনের আয়োজন করা যাউক।

ইংরেজী ভাষায় একটী কথা আছে, তাহার অর্থ, অলস মস্তিষ্ক সয়তানের কর্ম্মভূমি বা কারখানা। এ একটা আমাদের সে কালের বিকৃতমস্তিষ্ক মুনিঋষি মহোদয়গণের বিষয়ে, তথা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির সর্ব্বসাধারণের বিষয়ে, বিশিষ্টরূপ প্রযুক্ত হইতে পারে। কথায় বলে, 'নেই কাজ ত খই ভাজ'। সেকালের লোকের আহার, নিদ্রা ও বিড়্ বিড়্ করিয়া মন্ত্রপাঠ ব্যতীত অন্য কোন কাজ ছিল না,(২) কেবল মাঝে মাঝে ব্রাহ্মণগণ আফিমখোর কমলাকান্তের মত বসিয়া ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া বাখারীর কলম (আপনাদের বাখারীর মত হাত ও কঞ্চির মত আঙ্গুলের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার

---

(২) যদি এই আলস্য ও নিষ্কর্ম্মতার সার্টিফিকেট চাও, তাহা হইলে তোমাদিগকে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্যে' 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

জন্য ?) আলতার রংয়ে ডুবাইয়া (৩) পিপীলিকাপদসদৃশ অক্ষরে 'হিং টিং ছট্' সাপ-ব্যাঙ্ মাথামুণ্ডু কত কি লিখিয়া যাইত। কাহার সাধ্য সে সকল লেখার অর্থ বুঝে! ক্ষত্রিয়গণ অসদের শিরোমণি ছিল, কেবল মাঝে মাঝে পেটের দায়ে (এবং গৃহিণীর তাড়নাতেও বটে) ধনুর্ব্বাণ লইয়া 'মৃগয়া করিতে যাই' বলিয়া 'রিপ্ ভ্যান্ উইঙ্ক্‌লে'র মত কাঠবিড়ালী মারিতে বহির্গত হইত, এবং আলে কালে কখনও কখনও এক আধটা দাঙ্গা করিয়া আসিয়া 'ভীষণ রণে জয়লাভ করিয়া আসিয়াছি' বলিয়া বাড়ীতে আসিয়া ধারি ভাঙ্গিত। (৪)

এতক্ষণ শুধু ভূমিকাই করিলাম। এইবার প্রকৃত ব্যাপার লইয়া পড়িব।

সেকালের দীর্ঘশিখ (অথচ হ্রস্ববুদ্ধি) মুনিগণ মানবজীবনের পরিচালনার জন্য দীর্ঘ দীর্ঘ নিয়মাবলীর সৃষ্টি করিয়া জীবনের সমস্ত স্বাধীনতাটুকু নষ্ট করিতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই। [আমাদের পরম দুর্ভাগ্যবশতঃ কবি রঙ্গলাল তখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই, নতুবা তাঁহার স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কবিতা পাঠ করিলে তাহারা কখনই স্বেচ্ছায় আপনাদের স্বাধীনতানাশের আয়োজন করিতে পারিত না।] তাহারা নিয়ম করিয়াছিল, প্রত্যেক দ্বিজাতির

---

(৩) ষ্টিফেন অথবা পি, এম, বাকৃচির কালির পরিবর্ত্তে গোলা আলতার ব্যবহার (তখনও তরল আলতার উদ্ভব হয় নাই) তখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অত্যধিক স্ত্রৈণতার পরিচায়ক নহে কি?

(৪) রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত লঙ্কাসমর ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দুইটি বড় বড় দাঙ্গা ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রথমটির কারণ লঙ্কা চুরি। রাবণের একটি লঙ্কার বাগান ছিল। হনুমান (ইনি হ্যানিমানের পোষ্যপুত্র ছিলেন) প্রভৃতি বানরগণ (বোধ হয় হোমিওপ্যাথির উন্নতিসাধনের নিমিত্তই) সেই বাগানে লঙ্কা চুরি করিতে গিয়াছিল। তাহাতেই রাক্ষস ও বানরে একটা দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়। দ্বিতীয়টির কারণ অন্নক্ষেত্রে জুয়া-খেলা। [কুরু = ওদন = অন্ন।] দুর্য্যোধন একটি অন্নক্ষেত্র (অর্থাৎ অন্নসত্র) খুলিয়াছিল। একদিন যুধিষ্ঠির সেখানে পাশা খেলিতে যায়। পাচক ব্রাহ্মণ শকুনি রন্ধনশালা পরিত্যাগ করিয়া পাশা খেলিতে আসায় সব ভাত ধরিয়া যাওয়ায় অতিথি-সৎকারের ত্রুটি হয়, তাহাতেই এই দাঙ্গার উদ্ভব। এই দাঙ্গা মোটে ১৮ দিন চলিয়াছিল। লঙ্কা চুরির দাঙ্গাটি ইহা অপেক্ষা অধিকদিন স্থায়ী হইলেও ইলিয়াডে বর্ণিত ট্রয়ের যুদ্ধ, অথবা ইউরোপের ইতিহাসে বর্ণিত শত বৎসরব্যাপী যুদ্ধ কিংবা ত্রিংশদ্ বর্ষব্যাপী যুদ্ধের (The Hundred years' War & the Thirty Years' War) তুলনায় কিছুই নহে। [ইউরোপের বর্ত্তমান মহাসমরও কতদিন চলিবে কে জানে?] সুতরাং ঐ দাঙ্গাকে কোন মতেই প্রকৃত যুদ্ধ বলা যাইতে পারে না।

(বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের) জীবন চারিটী ভাগে বিভক্ত হইবে,—যথা ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং ভৈক্ষ্য বা সন্ন্যাস। এইরূপ কৃত্রিম বিভাগের ফল কিরূপ বিষময়, এক একটি করিয়া তাহা দেখাইতে চেষ্টা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

(ক) ব্রহ্মচর্য্য।

একটা কথা আছে, 'কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে টঁ্যাশ টঁ্যাশ'। অর্থাৎ মানুষকে যদি বাল্যকালে সুশিক্ষা না দেওয়া যায়, তাহা হইলে চির-জীবনে তাহার আর সুশিক্ষালাভের আর আশা থাকে না। বাল্যকালই শিক্ষার প্রকৃষ্ট সময়। কিন্তু প্রাচীন ঋষিগণ যেরূপ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বিধান করিয়াছিল, তাহাতে মানুষের পক্ষে বাল্যকালে এবং কৈশোরে প্রকৃত শিক্ষা-লাভের উপায় একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। গুরুগৃহে বাসকালে তাহার স্বাভাবিক বৃত্তিনিচয়ের আদৌ স্ফূর্ত্তি হয় না; কারণ সেখানে সে আর কিছুই করিতে পায় না, কেবল গুরুর আজ্ঞাবাহী ভৃত্যরূপে অবস্থান করিয়া কতক-গুলি গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করে। এরূপ গ্রন্থপাঠের কোন ফলই হয় না। কারণ, শুধু পড়িয়া কে কবে পণ্ডিত হইয়াছে? 'শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খা যস্তুক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্'; একথা যাহাদের লেখনী হইতে বহির্গত হইয়াছে, বড়ই দুঃখের বিষয় তাহারাই আবার স্বীয় শিষ্যগণকে এই দোষে দুষ্ট করিত। কারণ শিষ্যগণের গুরুগৃহে কেবল শাস্ত্রাধ্যয়নই হইত, ক্রিয়ার ক-ও তাহারা শিখিতে পারিত না।

গ্রন্থলব্ধ জ্ঞান (theoretical knowledge) অপেক্ষা ব্যবহারিক জ্ঞান (practical knowledge) অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত এবং এই কারণেই আজকাল শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ শুধু বিজ্ঞানচর্চ্চার ব্যবহারিক ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া অন্যান্য বিষয়েও ব্যবহারিক শাখার সৃষ্টি করিয়াছেন। যথা, গণিতের সহিত যন্ত্রের বাক্স (অবশ্য কর্ম্মকারের বা সূত্রধরের যন্ত্রের বাক্স নহে); জ্যামিতির সহিত ব্যবহারিক জ্যামিতি; ভূগোলের সহিত কাগজের মানচিত্র ও কাষ্ঠের ভূমণ্ডল (আবার আজকাল নাকি ভারতবর্ষের বন্ধুরগাত্র মানচিত্রেরও (৫) সবিশেষ প্রয়োজন হইতেছে); ইতিহাসের সহিত ঐতিহাসিক ভূচিত্রাবলী; ইত্যাদি। আধুনিক Kinder-

(৫) Relief Map.

garten System ও Direct Method of Teaching ইহাদেরও উন্নততর সংস্করণ। আশা করি, আরও কিছুদিন পরে ভাষাশিক্ষার সৌকর্য্যার্থেও ফনোগ্রাফ, গ্রামোফোন ও প্যাথিফোন প্রভৃতির ন্যায় নানারূপ নব নব যন্ত্রের আবির্ভাব হইবে। সেকালে এসব ছিল কি? তখন অধ্যাপকের ছাত্রগণ চতুষ্পাঠীতে বসিয়া নিবিষ্টমনে 'হযবরট্ লণ্' 'এচোইয়বায়াবঃ' অথবা 'স্তোশ্চুনাশ্চুঃ' কুটকুটে কচুরন্যায় কণ্ঠস্থ করিত, কিন্তু চতুষ্পাঠীর চতুঃসীমার বাহিরের কোন বস্তুরই বড় একটা খোঁজ-খবর রাখিত না। তাহারা চিনির বলদের মত 'স্ত্রী যোষিদবলা যোষা নারী সীমন্তিনী বধূঃ' প্রভৃতি কবিত্বপূর্ণ শ্লোকাবলীর ভার মস্তিষ্কে বহন করিত। ইহাতে তাহাদের 'বাস্তবে'র জ্ঞান আদৌ হইত না। 'ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী' প্রভৃতি জয়দেবের সুমিষ্ট পদাবলী তাহাদের পাঠের বিষয়ীভূত ছিল কি না, প্রত্নতত্ত্বজ্ঞানের অভাববশতঃ তাহা ঠিক বলিতে পারি না; কিন্তু একথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচনসমিতি (কথাটা বড় বেশী আধুনিক হইল কি ?) ঐরূপ রসাশ্রিত কবিতা তাহাদের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচন করিলেও, তাহারা স্বভাবের দোষে 'মনসা বারাণসীং গচ্ছতি'র ন্যায় মনে মনেই উহার (রসগ্রহণ না করিয়া) ভাবগ্রহণ করিত, কখনও 'বিকচনলিনে যমুনাপুলিনে' গিয়া উহার ব্যবহারিক জ্ঞানলাভের চেষ্টামাত্র করিত না। তাহারা কাব্য-নাটক পাঠ করিত বটে, কিন্তু কাব্যকলায় ব্যবহারিক জ্ঞানলাভের প্রধান উপায় থিয়েটার ও অন্যান্য বহুবিধ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য স্থানসমূহে আধুনিক কালের ছাত্রগণের ন্যায় তাহাদের স্বাধীন গতিবিধি না থাকায় তাহারা মোটেই ঐ সমস্ত বিষয়ের ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিত না, সুতরাং তাহাদের শিক্ষাও সম্পূর্ণ হইত না। (৬)

আমাদিগকে ভবিষ্যৎ জীবনে যে সকল জিনিষ লইয়া কারবার করিতে হইবে, বাল্যকাল হইতেই সেই সকল জিনিষের সহিত একটু আধটু পরিচিত হইতে চেষ্টা করা উচিত। নতুবা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ অবস্থায় সংসারে প্রবেশ করিলে হাবুডুবু খাইয়া মরিতে হয়। সেকালের ব্রহ্মচর্য্যপালনকারী টোলের

(৬) শুনা যায়, সংস্কৃতশিক্ষার্থী একজন আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে সীতাবিরহে রামচন্দ্রের বুদ্ধিভ্রংশের পরিচায়ক শ্লোকবিশেষ পাঠ করিয়া অভ্যাসবশে তাহার 'practical' করিবার জন্য তিন দিন ধরিয়া গ্রামে গ্রামে অশোকতরুর অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছিলেন! দেখ দেখি কী অনুসন্ধিৎসা, কী অধ্যবসায়!

ছাত্রদের ঠিক এই অবস্থাই হইত। তাহারা যখন সংসারে প্রবেশ করিত, তখন তাহারা সংসারের কোন দ্রব্যেরই সংবাদ রাখিত না। এমন কি, সংসারের যে দুইটি প্রধান বস্তু—কামিনী ও কাঞ্চন (১)—তাহা ভোগ করা ত দূরের কথা, তৎসম্বন্ধে তাহাদের কোন অভিজ্ঞতাই থাকিত না। হয় ত তাহারা বিবাহের পূর্ব্বে কখনও স্ত্রীলোক দেখিতে এবং কাঞ্চন স্পর্শ করিতে পাইত না। ফলে গার্হস্থ্যজীবনে অর্থ পাইলেও তাহারা অভ্যাসের অভাবে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে পারিত না। ঠিক এই কারণেই বিবাহিতা স্ত্রীদের সহিতও তাহারা যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে পারিত না। কারণ, হয় সুন্দরী স্ত্রী পাইয়া 'কি যেন কি হ'য়ে গেলাম বলব তাহা কাহারে'; অবিরত মনে মনে এই চিন্তা করিয়া ক্রমে ক্রমে স্ত্রৈণত্বের চরম সীমায় উঠিত, আর না হয়, জীবনের প্রায় অর্দ্ধাংশ কঠোর নিয়মসংযমাদি বন্ধনে সম্পূর্ণ গদ্যময়ভাবে অতিবাহিত করিয়া, এখন সংস্কারবশে তাহারই পুনরাবৃত্তি করতঃ নারীনিগ্রহের একশেষ করিয়া তুলিত। আবার এই সকল লোক যখন সমাজের নেতা হইয়া অধস্তন পুরুষগণের জন্য নিয়মাবলীর উদ্ভাবন করিত, তখন সেই সকল নিয়ম কেমন মনোহর হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ব্রহ্মচর্য্য-প্রথার আর একটি বিষময় ফলের কথা এখনও বলি নাই। মানবজীবনের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহের মধ্যে, স্বাবলম্বনশিক্ষা ও আত্মসম্মানরক্ষা, এই দুইটি অন্যতম। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যপ্রথায় এই দুইটিরই দারুণ অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এক জাহাজ বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া ঘরে বসিয়া তাহা ছড়াইব, আর আমার ছাত্রগণ ভিক্ষা করিয়া আনিয়া আমার, আমার পত্নীর ও তাহাদের উদরান্নের সংস্থান করিবে, এ কোন্ দেশী কথা? আর ছাত্রগণ সুস্থসবল শরীর লইয়া ভিক্ষাই বা করিতে যাইবে কোন্ লজ্জায়? এই সব সঙ্কীর্ণহৃদয় স্বেচ্ছাভিখারীর দল এতটুকু এতটুকু আদর্শ লইয়া বড় হইয়া জগতের যে কি উপকার করিবে, তাহা ত ভাবিয়াই পাই না।

আবার এমন অনেক নির্লজ্জ আছে, যাহারা ছাত্রগণের ভিক্ষালব্ধ অন্ন

---

(১) কামিনী ও কাঞ্চন যে সংসারের মধ্যে অপকৃষ্ট বস্তু নহে, পরন্তু উৎকৃষ্ট বস্তু, একথা যে অস্বীকার করিবে, সে মনুষ্যনামের অযোগ্য। কারণ, প্রথমটি আমাদের জীবনকে মধুময় করিয়া আমাদিগকে কর্ম্মে উৎসাহ দেয় ('রমণীয় করিবারে রমণী এ ভবে'), এবং দ্বিতীয়টি জগতের অধিকাংশ সৎকার্য্যেরই প্রধান সহায়। দৃষ্টান্ত—অদ্যকার এই সান্ধ্য-সম্মিলন।

গুরু অধ্যাপকের এই অধ্যাপনাকে বিদ্যা-'দান' বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। এইরূপ শিক্ষা দেওয়াকে যদি বিদ্যাদান বলিতে হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে, কন্যার পিতা পাঁচ শত টাকা মাত্র পণ লইয়া যোগ্য পাত্রে কন্যাটিকে দান করিয়াছেন, এবং সাইলকও য়্যাণ্টনিওকে তিন হাজার ডুক্যাট দান করিয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার বক্তব্য অনন্ত। সুতরাং যতই বলিব, পুঁথি তত বাড়িয়া যাইবে। অতএব ব্রহ্মচর্য্যের কথা এইখানেই শেষ করিয়া এইবার দ্বিতীয় আশ্রম গার্হস্থ্যের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা যাউক।

(খ) গার্হস্থ্য।

আমড়ার আঁঠি হইতে যেমন আমগাছ জন্মিতে পারে না, চা'লের গুঁড়ি হইতে যেমন উৎকৃষ্ট লুচি প্রস্তুত হয় না, এবং অক্ষর গণিয়া কবিতা লিখিতে পারিলেই যেমন নোবেল প্রাইজ্ পাওয়া যায় না, সেইরূপ বাল্যকালে যাহাদের আদৌ সুশিক্ষা হয় নাই, তাহাদের নিকট পরিণত বয়সে পাকা গৃহস্থালীর আশা করিতে পারা যায় না। সুতরাং সেকালের গৃহস্থগণ গৃহস্থালীর কিছুই জানিত না, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তাহারা শৈশবে ও বাল্যকালে ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও দর্শন প্রভৃতির কতকগুলি সূত্র আওড়াইয়া আসিয়াছে মাত্র; পৃথিবীতে বাস করিতে হইলে যে সকল বস্তুর প্রয়োজন, তাহাদের কোনটিরই সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। পুঁথিগত বিদ্যা লইয়া যে সংসার চলে না, এ কথা কে না জানে? গৃহিণী গৃহে তণ্ডুলের অভাব জ্ঞাপন করিলে এই সকল লোক যে 'ডুমর্থে সে সেন্'—বলিয়া তাহার উত্তর দিবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

তাহা ছাড়া, সেকালের সংসারী লোকেরা কতকগুলি অদ্ভুত ও হাস্যোদ্দীপক ধারণা মস্তিষ্কে বহন করিয়া সংসারে বাস করিত। গৃহে অতিথি আসিলে নিজে না খাইয়াও তাহাকে খাওয়াইতে হইবে; অতিথি যদি ভগ্নমনোরথ হইয়া কোন গৃহস্থের গৃহ হইতে ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে সে তাহার পাপটুকু গৃহস্থকে দিয়া গৃহস্থের পুণ্যটুকু লইয়া চলিয়া যাইবে; শত্রুও গৃহে আসিলে তাহার যথোচিত অতিথিসৎকার করিতে হইবে; কি শীত, কি গ্রীষ্ম, বার মাসই গৃহে চব্বিশ ঘণ্টা আগুন জ্বালিয়া রাখিতে হইবে; ইত্যাদি ইত্যাদি হাজার হাজার অদ্ভুত নিয়মের বশীভূত হইয়া সেকালের

গৃহস্থদিগকে জীবন যাপন করিতে হইত। (৮) কিন্তু এই সকল নিয়ম সর্ব্বদা পালন করিতে হইলে মানুষকে কি রকম ভয় ও বিপদে কালযাপন করিতে হয়, তাহা কেহ ভাবিবার অবসর পাইত না, অথবা অবসর পাইলেও অধিকার পাইত না। নিজে না খাইয়া মরিয়া গেলে অতিথিসৎকার করিবে কে, তর্কশাস্ত্রের এই সামান্য কথাটা তাহাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিত না। শত্রুকে বিশ্বাস করিয়া গৃহে স্থান দিলে যে সে গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে, তাহা কাহারও বুদ্ধিতে যোগাইত না। গৃহে সর্ব্বদা আগুন জালিয়া রাখিলে, হাওয়া লাগিয়া হঠাৎ সেই আগুন দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিয়া গৃহখানিকে যে একেবারে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিতে পারে, বিজ্ঞান জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ এ কথাটা আদৌ বুঝিতে পারিত না। এক কথায় বলিতে গেলে, গৃহস্থাশ্রমের এই নিয়মসমূহ সেকালের পণ্ডিতম্মন্য শাস্ত্রকার-দিগের দারুণ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে সকল অন্ধধী শাস্ত্রকার এই সকল নিয়ম অবলীলাক্রমে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল, তখনকার দিনে তাহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া গণ্য হইলেও আজকাল বহরমপুরেই তাহাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত।

আরও দুঃখের বিষয় এই যে, নির্লজ্জ নীতিশাস্ত্রকারগণ নিরীহ গৃহস্থ-দিগকে ভ্রম ও কুসংস্কারে পূর্ণ গার্হস্থ জীবন যাপন করাইয়াই ক্ষান্ত থাকিত না, পরন্তু আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমই শ্রেষ্ঠ, এই আজগুবি কথাটা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু এরূপ গার্হস্থ্যাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, তাহা ত ভাবিয়া পাই না। অবশ্য যদি বিবেকহীনতা, নির্ব্বুদ্ধিতা এবং অদূরদর্শিতাই মানবের শ্রেষ্ঠত্বের উপাদান হয়, তাহা হইলে ইহা সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ, এ কথা স্বীকার্য্য। উক্ত নীতিশাস্ত্রকারগণ বলে, গার্হস্থ্যাশ্রম শ্রেষ্ঠ ; কারণ ইহা মানবের স্বার্থত্যাগশিক্ষার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। কথাটা শুনিলে বড়ই হাসি পায়। কথায় বলে, 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'। একজন আগন্তুককে চারিটী অন্ন দেওয়াই যাহাদের ত্যাগের আদর্শ, এবং একবেলা আপনি অনাহারে থাকিয়া একজন অতিথিকে আহার করানই যাহাদের মতে স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, তাহারা এ কথা বলিবে না ত আর

(৮) সেকালের গার্হস্থ জীবনের আরও কতকগুলি অসুবিধার কথা 'বাপের বেটা বাহাদুর' প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কে রাখিবে? হাঁড়ির ভাত একমুঠা সকলেই দিতে পারে। আজকাল দেশের স্নসন্তানগণ দেশের লোকের উপকারের জন্য সভাসমিতিতে সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়া চাঁদার খাতায় নাম লিখিয়া আপনাদের ক্লেশোপার্জ্জিত রাশি রাশি অর্থ যেরূপ মুক্তহস্তে দান করিতেছেন, সেরূপ করিতে হইলে বোধ হয় সেকালের লোকেরা ধর্ম্মঘট করিয়া 'দান' ও 'ত্যাগ' শব্দ দুইটিকে অভিধান হইতে একেবারে উঠাইয়া দিত। তাহা ছাড়া, সেকালের গৃহস্থেরা যেরূপে অতিথিকে অন্নদান করিত, তাহাতে এককালে দুই একজনের অধিক লোকের উপকার হইত না! কিন্তু এই আধুনিক কালের দানপ্রথায় এককালে সহস্র সহস্র লোকের উপকার হয়। এইটাই ভাল নয় কি? আর দশের স্বার্থের নিকট একের স্বার্থ, অধিকের স্বার্থের নিকট অল্পের স্বার্থ বলি দেওয়াই ত ইদানীন্তন সমাজযন্ত্রের পরিচালক অর্থশাস্ত্রের মূলমন্ত্র।

(গ) বানপ্রস্থ।

এই আশ্রমটির বিধান করায় তর্কশাস্ত্রের যতদূর অপমান করা হইয়াছে, এমন আর কিছুতেই নহে। কারণ ইহাতে আমরা অনেকগুলি পরস্পর-বিরুদ্ধভাবাপন্ন আচারঅনুষ্ঠানের বলপূর্ব্বক একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই। প্রথমেই দেখ, যাহারা একমুখে "অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥" বলিয়াছে, তাহারাই আবার অন্য মুখে বলিতেছে, প্রৌঢ়াবস্থা অতীত না হইতেই স্বোপার্জ্জিত ধনসম্পত্ত অন্যকে ভোগ করিতে দিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন কর। 'আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ' যাহাদের কথা, সঞ্চিত ধন অপরকে অর্পণ করিয়া, ভবিষ্যতের ভাবনা না ভাবিয়া, রিক্তহস্তে গৃহত্যাগ তাহাদেরই বিধান। ধন যদি গৃহেই পড়িয়া রহিল, তাহা হইলে গৃহত্যাগের পর আপদ্ হইতে উদ্ধার করিবে কে? নির্ব্বুদ্ধিতার ও অপরিণামদর্শিতার ইহা অপেক্ষা শোচনীয় নিদর্শন আর কি হইতে পারে? আবার দেখ, বানপ্রস্থাশ্রমে গৃহিণী নিকটে থাকিবে, অথচ গৃহে বাস করা চলিবে না, (৯) এরূপ অদ্ভুত ব্যবস্থার প্রয়োজন কি? ইহা কি গৃহের নূতন কর্ত্তা ও গৃহিণী (অথচ প্রাণাপেক্ষা প্রিয়) পুত্র ও পুত্রবধূকে নির্ব্বিবাদে ঘর-সংসার করিতে দিবার জন্য পুরাতন কর্ত্তা ও গৃহিণীর স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ

---

(৯) তবে যদি 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে' বাক্যের এইরূপ অর্থ কর যে, গৃহিণী যেখানে থাকিবেন সেই স্থানই গৃহ, তাহা হইলে আমি নাচার।

(কারণ শাশুড়ী ও বধূ একত্র থাকিলেই দ্বন্দ্ব বাধিবে, ইহাই সংসারের নিয়ম), না, 'যঃ পলায়তে স জীবতি' নীতির অনুসরণ করিয়া মোহান্ধ যুবক পুত্র এবং মুখরা ও কর্ত্রীত্বপ্রিয়া যুবতী পুত্রবধূর হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার উপায় মাত্র ? সস্ত্রীক গৃহত্যাগের প্রকৃত কারণ এ দুইটির মধ্যে যেটিই হউক না কেন, গৃহত্যাগ করিয়া বনে যাওয়ার কোন প্রয়োজন ত দেখিতে পাই না। যখন দেখি, পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে বনিবনাও হইতেছে না, তখন তাহাদিগকে একখানা পৃথক্ বাড়ী করিয়া দিলে চলিতে পারে, অথবা নিজেরাই পুরাতন বাটী পরিত্যাগ করতঃ একখানি নূতন বাটী নির্ম্মাণ করিয়া কিংবা পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরে গিয়া একখানি বাড়ী ভাড়া করিয়া স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারি। স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া বনে বাস করা এবং পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান শুধু যে বিপজ্জনক তাহা নহে, পরন্তু সম্মানহানিকরও বটে। কিন্তু হায়! দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাই যাহাদের জীবনের অন্যতম আদর্শ, তাহাদের নিকট হইতে আত্মসম্মানজ্ঞানের প্রত্যাশা করা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

তোমরা হয়ত বলিবে, কিছুদিন গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া পার্থিব সুখভোগের পর ধর্ম্মালোচনার নিমিত্ত বানপ্রস্থাশ্রমের বিধান করা হইয়াছে। অবশ্য মানবমাত্রেরই ধর্ম্মচর্চ্চা করা উচিত, একথা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু ধর্ম্মচর্চ্চা করিবার জন্য গৃহ ছাড়িয়া বনে যাওয়ার প্রয়োজন কি ? তোমাদের শাস্ত্রকারগণের মুখেই ত শুনিতে পাই যে, সংসারই ধর্ম্ম-সাধনের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। স্ত্রী নিকটে থাকিলে ধর্ম্মবিষয়ে চিত্তের একাগ্রতা হয় না, এ কথাও বলিতে পারিবে না ; কারণ তোমাদের মুনিঋষিরাই বিধান করিয়াছে, 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ,' এবং বানপ্রস্থাশ্রমে স্ত্রী ত সঙ্গেই থাকে। সুতরাং এরূপ বুজরুকির প্রয়োজন কি ?

তোমরা যাহাই বল, আমার বিশ্বাস, এই বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বনের প্রকৃত কারণ মানুষের কাপুরুষতা। তোমরা সকলেই জান, সংসারে থাকার সুখও যত, কষ্টও তত। মানুষ যখন সংসারের নানাবিধ অভাব-অসুবিধার সহিত বহুবর্ষব্যাপী ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া শেক্‌স্‌পীয়ারের দ্বিতীয় রিচার্ড ও চতুর্থ হেনরীর মত ক্লান্ত ও অবসন্ন (world-weary) হইয়া পড়িত (অনেকের আবার যৌবন অতিক্রান্ত না হইতেই এরূপ ঘটিত), তখন তাহারা জীবনের অবশিষ্ট অংশটা বিশ্রামে (retirement) কাটাইয়া দিতে পারিলে আর কিছুই চাহিত না। এই বিশ্রামলালসা অবশ্য কাপুরুষতার নামান্তর ব্যতীত আর

কিছুই নহে, এবং ইহা হইতেই বানপ্রস্থ প্রথার উদ্ভব হইয়াছে। কারণ এই আশ্রমে থাকিয়া মানুষ সংসারের প্রায় সব সুখ ভোগ করিতে পারে, অথচ সংসারের অধিকাংশ কষ্টই তাহাকে সহ্য করিতে হয় না। তাহার ভাল ঘর না থাকায় চোর-ডাকাত-আগুনের ভয় করিতে হয় না, জমিজমা না থাকায় মেঘের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিতে হয় না, জমিদারের খাজনা দিতে হয় না, চৌকিদারী ট্যাক্স দিতে হয় না; ইন্‌কম্ ট্যাক্সের দাবী পূরণ করিতে হয় না, বারোয়ারীর চাঁদা দিতে হয় না, আত্মীয়কুটুম্বগণের সহিত লৌকিকতা রক্ষা করিতে হয় না, অথচ স্ত্রী পুরুষে মনের সুখে কেমন আরামে কালযাপন করা যায়। আর উপরি পাওনা স্বরূপ লোকের প্রশংসা লাভ করা যায়; কারণ লোকে বলে, আহা! অমুক বড় ধার্ম্মিক; এত অল্প বয়সে—ইত্যাদি। সমাজকে ফাঁকি দিয়া সংসার করিবার এরূপ সহজ উপায় আর আছে কি?

(ঘ) ভৈক্ষ বা সন্ন্যাস।

চতুর্থ এবং শেষ আশ্রমের নাম ভৈক্ষ বা সন্ন্যাস। মানুষ যখন এই আশ্রম অবলম্বন করে, তখন আর তাহার জীবনের অধিক দিন অবশিষ্ট থাকে না। ইহা হইতেই তোমরা বুঝিতে পারিতেছ যে, আমার বক্তব্য বিষয়ও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

এই আশ্রমটির কথা মনে হইলেই সঙ্গে সঙ্গে দুইটি ভীষণ সমস্যা স্বতঃই মনে উদিত হয়, এবং অনেক ভাবিয়াও সেগুলির কোন সন্তোষজনক সমাধান করিতে পারি না। প্রথমতঃ মানুষ সুখের বানপ্রস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া এই কষ্টসাধ্য সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিত কেন, তাহার কারণ নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। (১০) দ্বিতীয়তঃ, কোন লোক যখন ভৈক্ষ অবলম্বন করিত, তখন তাহার স্ত্রীর কি দশা হইত,—সে স্বামীর সহিত সন্ন্যাসিনী হইত, কি পুত্র পুত্রবধূর নিকট ফিরিয়া যাইত, কি দময়ন্তীর ন্যায় নিদ্রিতাবস্থায় স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া বনে বনে কাঁদিয়া বেড়াইত,—তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে

* (১০) আমার একজন প্রত্নতত্ত্ববিৎ বন্ধু বলেন, তিনি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন যে, সেকালের লোকেরা যখন বানপ্রস্থ অবলম্বন করিত, তখন তাহাদের ধনসম্পত্তি কিয়দংশ সঙ্গে লইত (পুত্র এবং বিশেষতঃ পুত্রবধূর ভয়ে বেশী লইতে পারিত না)। কিছুদিন পরে যখন উহা ফুরাইয়া যাইত, তখন ভিক্ষা ব্যতীত জীবন ধারণের আর অন্য কোন উপায় থাকিত না।

পারি না। তবে এটা বেশ বুঝা যায় যে, স্বামী ভৈক্ষ্য অবলম্বন করিলে স্ত্রী যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তাহার দুর্গতির পরিসীমা থাকিত না। এইরূপ নারীনিগ্রহ দ্বারা ধর্ম্মসাধনের ব্যবস্থা যে মুনি দিয়াছেন, তিনি কেমন বিজ্ঞ ও ধর্ম্মজ্ঞ, তাহা কাহাকেও বেশী করিয়া বুঝাইতে হইবে না।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়ার যে অর্থে বার্দ্ধক্যকে second childishness বা দ্বিতীয় শৈশব বলিয়াছেন, একটু ভাবিয়া দেখিলে এই কথাটি তাহা অপেক্ষা ব্যাপকতর অর্থে সন্ন্যাসাবলম্বী বৃদ্ধের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে। কারণ ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-চতুষ্টয়ের নিয়মাবলী পালন করিতে হইলে ভিক্ষায় জীবনের আরম্ভ এবং ভিক্ষাতেই জীবনের শেষ করিতে হয়। বাল্যকালে গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া ভিক্ষা করিয়া বিদ্যার্জ্জন করিতে হয়, আবার বার্দ্ধক্যে সেই ভিক্ষা দ্বারাই জীবন ধারণ করিতে হয়। সেকালের লোকেরা ভিক্ষাতে যে কি অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছিল, তাহা তাহারাই জানে। যাহারা দরিদ্র তাহাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু ধনিসন্তানেরাও যে এরূপ করিতে বাধ্য হইত, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। (আজকালও অনেক বৈষ্ণব ভিখারী দেখা যায়, যাহাদের বাড়ীতে বড় বড় ধানের গোলা বাঁধা আছে। ইহারা প্রয়োজনবশতঃ ভিক্ষা করে না, ভিক্ষাই ইহাদের ব্যবসায়।)

আর একটা কথা। বাল্যকালে ভিক্ষা করা যেরূপ ক্লেশকর ও সম্মান-হানিকর, বার্দ্ধক্যে ভিক্ষা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক কষ্টপ্রদ ও অপমান-জনক। কারণ বালকের শরীরে অনেক পরিশ্রম সহ্য হয়, এবং বিদ্যালাভের জন্য ভিক্ষা করায় তত বেশী অপমান নাই। কিন্তু বার্দ্ধক্যে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ যদি ভোগসুখে যৌবন অতিবাহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ত কথাই নাই। তাহা ছাড়া, জীবনে একবার যশস্বী ও সম্মানিত হইয়া স্বেচ্ছায় সে যশঃ ও সম্মান বিসর্জ্জন দিয়া অযশস্কর ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে মানুষের মনে কিরূপ কষ্ট হয়, তাহা বিবেকী ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন।

উপসংহার।

উপরিউক্ত আশ্রম-চতুষ্টয়ের আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, সেকালের পাণ্ডিত্যাভিমানী মহামূর্খ মুনিঋষিদিগের নির্ব্বুদ্ধিতা, অদূরদর্শিতা, এবং আত্ম-নির্ভরশীলতা ও আত্মসম্মানজ্ঞানের অভাবই মানুষের জীবনকে চারিটী অদ্ভুত কৃত্রিম বিভাগে বিভক্ত করিয়াছিল। আর এই বিভাগ চতুষ্টয়ের মধ্য দিয়া

একটী লোকের জীবন সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করিলে পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলিতে ইচ্ছা করে,—A life ingloriously begun ended as ingloriously. ইতি—

শ্রীবাহাদুর শর্ম্মা।

[বকলম শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ।]

আহুতি।

(৯)

কিছুদিন কাটিয়া গেল। মনটা খাবি খাইয়া মরিলেও শিবানী শিবপ্রসাদের একবার খোঁজ লইতে পারিল না। কতদিন পরে যদি তাহার দেখা পাইল, ধরিয়া রাখিতে পারিল না। কি শক্তি তা'র যে সে ভাইকে ঘরে রাখিবে, যত্ন করিবে! কে'ই বা তা'র ব্যথার ব্যথী আছে যে তাহার খোঁজ লইয়া তা'র প্রাণটা ঠাণ্ডা করিয়া দিবে! কোথায় বেড়াচ্ছে! কে তা'কে দয়া করে দু'টো ভাত দিচ্ছে! বোধ হয় অনাহারেই দিন কাটছে! শিবানী কি করে মুখে ভাত তোলে! এ কয় দিন তা'র একরূপ উপবাসেই কাটিয়া গেল।

একদিন বৈকালে শিবানী পুষ্করিণীর ঘাটে কাপড় কাচিতে যাইয়া শুনিল যে, প্রতিবেশিনীগণ বলাবলি করিতেছে, শিবপ্রসাদ অদূরস্থ ভগ্ন মন্দিরে অসুস্থ অবস্থায় পড়িয়া আছে।

শিবানীর প্রাণের ব্যথা কে বুঝিবে? তা'হার প্রাণের রুদ্ধ বেদনাটা গুমরাইয়া উপর দিকে ঠেলিয়া অশ্রুরূপে বাহির হইতে লাগিল। সজোরে ঠোঁটটা চাপিয়া চক্ষের জল মুছিয়া শিবানী পূর্ব্বকার সমস্ত ভুলিয়া গিয়া ছুটিয়া মন্দিরদ্বারে উপনীত হইয়া দেখিল, শিবপ্রসাদ মন্দিরতলায় পড়িয়া রোগ-

যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। সে কাছে বসিয়া গায়ে হাত দিয়া দেখিল, গা অতিশয় গরম। ডাকিল—“দাদা”। শিবপ্রসাদ নয়ন মেলিয়া বলিল—“জল।”

শিবানী তাড়াতাড়ি অঞ্চল ভিজাইয়া জল আনিয়া তাহা নিঙড়াইয়া আস্তে আস্তে তাহার গালে দিতে লাগিল। সে তথা হইতে আর উঠিল না। কন্যার কথা ভুলিয়া গেল, নির্য্যাতনের কথা ভুলিয়া গেল। ভ্রাতার লুণ্ঠিত মস্তক কোলে তুলিয়া লইয়া উদাস দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। মুখে বাক্য নাই, চক্ষে জল নাই, স্থান কাল জ্ঞান নাই, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য মনে নাই, যেন প্রস্তর-প্রতিমা।

কিছুক্ষণ পরে শিবপ্রসাদ চীৎকার করিয়া উঠিল—“আঃ! বেঁচেছি, শিবানী মরেছে, যাক বেশ হ'য়েছে।” সেই শব্দে শিবানীর চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া শিবানী বলিল—“এই যে তোমার শিবানী, দাদা। সে ত মরে নাই; তা'র ত মরণ নাই।” শিবপ্রসাদ চক্ষু মেলিয়া শিবানীর প্রতি চাহিয়া বলিল—“কে তুই, দুরূহ! হাঁ সত্যি আমি দেখিছি সে মরেছে। আমি নিজে হাতে তা'কে পুড়িয়ে মেরেছি; তা'কে জলন্ত আগুনে আহুতি দিয়েছি। তা'র শিখা উঠে আমাকে পুড়িয়ে মেরেছে। দেখছিস্ না, সব পুড়ে কাল হ'য়ে গেছে। ভালই হ'য়েছে! আর কত পুড়বে, সব ছাই হ'য়ে গেছে, সব ছাই হ'য়ে গেছে।”

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর গাঢ় অন্ধকার পথ-ঘাট ডুবাইয়া দিয়াছে। সেই জনহীন মন্দিরমধ্যে অন্তর বাহিরে নিবিড় অন্ধকার লইয়া মরণাতুর ভ্রাতার মস্তক কোলে করিয়া সংজ্ঞাশূন্য শিবানী স্থাণুর ন্যায় বসিয়া রহিল।

এমন সময়ে একটা আলোক লইয়া কয়েক জন লোক সেইদিকে আসিতে লাগিল। নবকৃষ্ণ শিবানীকে খুঁজিতে যশোদার সহিত কয়েক জন লোক লইয়া বাহির হইয়াছে। সে লণ্ঠন-হস্তে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় শিবানীকে দেখিয়া তাহার হাত ধরিয়া এক টান দিয়া তুলিয়া সরোষে বলিল,—‘বাড়ী চল্’। শিবপ্রসাদের মাথাটা ঠক্ করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল।

শিবানী নবকৃষ্ণের পায়ের উপর পড়িয়া আর্ত্তনাদের সহিত বলিয়া উঠিল—“ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, আজকার রাতটার মত দাদাকে বাড়ী নিয়ে চল; ওকে একলা ফেলে যেও না। দাদা আর বাঁচবে না।”

গর্জ্জিয়া নবকৃষ্ণ উত্তর করিল—"না, বাঁচে, মরুক। বাঁচবে না বলে আবদার কর্‌তে এসেছে। কে তোকে বল্লে বাঁচবে না। পাগল শিগ্‌গির মরে না। বায়ু বৃদ্ধি হ'য়েছে, তাই পড়ে আছে। তুই বাড়ী চল। ভাইকে কোলে ক'রে বসে আছে, কালামুখী লজ্জা করে না। লোকের কাছে আমার মাথা হেঁট করাবি ; শত্রুর মুখ হাসাবি, মতলব করেছিস্, নয় ?"

শিবানীর আজ লজ্জা নাই। সে দৃঢ়ভাবে, দৃঢ়স্বরে বলিল—"দাদাকে বাড়ী না নিয়ে যাও, আমি যা'ব না। বেশ যশোদাকে আমার কাছে রেখে যাও, আমি আজ দাদার কাছে থাকব। শুধু আজকের রাতটা। তোমার পায়ে পড়ি, আমার এই কথাটা রাখ। আমি কখন তোমার কাছে কিছু চাইনি, আজ এই ভিক্ষা চাইচি, দয়া কর। কখনও তোমাদের অবাধ্য হয় নি, আজ হচ্চি ; আমায় মাপ কর। তোমার পায়ে পড়ি ; শুধু আজকের রাতটা আমাকে দাদার সেবা কর্‌তে দাও। জন্মের শেষ, মনের খেদ মিটিয়ে নি। আর কখনও বলব না।"

হতভাগিনীর কাতরতা এবং কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় নবকৃষ্ণ বুঝিল, আজ সহজে সে নড়িবে না ; জোর আজ চলিবে না। শিবানীর অপরিসীম ধৈর্য্যের বাঁধ আজ ভাঙ্গিয়াছে, আজ জোর করিলে বিপরীত ফল ফলিবে। সুতরাং নবকৃষ্ণ কণ্ঠস্বরটা নরম করিয়া মিষ্টভাবে বলিল—"তুমি মেয়ে মানুষ, একলা কি কর্‌তে পারবে। যা'তে ভাল হয়, আমি তা'র বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।"

যশোদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"যশোদাও তুই ওকে নিয়ে যা'—এই কথা বলিয়া গ্রামস্থ কবিরাজকে আনিবার জন্য একজন লোক পাঠাইয়া দিল।

শিবানী নড়িল না ; সমভাবেই বসিয়া রহিল। যশোদা শিবানীর হাত ধরিয়া সান্ত্বনাসূচক স্বরে বলিল—'এস বউদিদি, বাড়ী—এস। ভয় কি ? তোমার ভাই ভাল হ'বে। কবিরাজ ম'শায় এলে ওষুধ দিলেই সেরে যাবে। ভয় কর না। এই রাতে একলা মেয়ে মানুষ, তুমি কোন সাহসে এখানে থাকৃতে চাচ্চ।"

নবকৃষ্ণ নরমভাবে বলিল—"তুমি বাড়ী যাও, দেরী কর না। না হয় শিবপ্রসাদকে আমরা নিয়েই যাচ্চি। তুমি যাও, কোন ভয় নাই। কেন দেরী কচ্ছ, এখনি কবিরাজ আসৃবে। এত রাতে তোমাকে এখানে দেখে কি মনে করবে, বল দেখি। ছি! অবুঝ হোয় না।"

হাত ধরিয়া নবকৃষ্ণ শিবানীকে মন্দিরের বাহিরে টানিয়া আনিল।

যশোদা বলিল—"তা'হলে আর ভাবছ কেন বউদিদি। উনি ত শিবু দাদাকে নিয়ে যাবেন, বলছেন চল, আমরা এগিয়ে যাই।"

উপায়ান্তর না দেখিয়া শিবানী কোন উত্তর করিল না, নীরবে যশোদার সহিত চলিল। প্রাণটা হাহাকার করিতেছে, মনটা মন্দিরের মধ্যে দাদার কাছে পড়িয়া আছে, বুকটা ফাটিয়া পড়িতেছে। শিবানী কলের পুতুলের মত চলিয়াছে। তাহার যে কি ব্যথা, সে আর কে বুঝিবে? তাহার স্নেহময় দাদা, তাহার একমাত্র সান্ত্বনার স্থল প্রিয়তম ভাই, তাহার বাপের বংশধর, তাহার জন্যই না আজ এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত! ভগ্নীর দুর্ভাগ্যই না তাহার দাদার মন ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। তাহার দুঃখের ভাবনা ভাবিয়াই না তাহার দাদার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল। আজ সে নিরাশ্রয় অনাথ নিঃসহায় অবস্থায় মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। আজ সে ক্ষুধায় অন্ন পায় না; তৃষ্ণায় জল পায় না; রোগে ঔষধ পায় না; কেন তাহার জন্যই নয় কি? সেই ত সব কষ্টের মূল। সেই ত তাহার অকাল মৃত্যুর কারণ! হায়! সে যদি না জন্মিত, যদি জন্মিয়াই মরিত, তাহা হইলে তাহার বাপের বংশ এমন শোচনীয়ভাবে লোপ পাইত না!

মানদা শিবানীর কন্যা কল্যাণীকে কোলে করিয়া বসিয়াছিল। শিবানীকে যশোদার সহিত বাটী প্রবেশ করিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"যশোদা, কোন আক্কেলে তোরা আবার ও কালামুখীকে বাঁড়ী আনতে গিয়েছিলি, বল্‌ত। চুলোয় গিছলো, গিছলোই, তা' আবার মাথায় করে আনা কেন? বুড়ো মিন্সের প্রাণ ছটফট কচ্ছিল কিনা, ছুটে গেল, খুঁজতে মরণ নেই, গলায় দড়ি! আচ্ছা, তোরাই বল্ না কেন গেরস্ত ঘরের বউ, সোমত্ত মেয়ে, কি বুকের পাটা ভয় নেই, ডর নেই, এই রাত দুপুরে একলা বাড়ীর বাইরে রয়েছে; ওকে আবার ঘরে ঠাঁই দিতে আছে, যা' যে চুলোয় ছিলি, সেই চুলোয় যা'! উঠিসনে, খবর্দার বল্‌চি, ঘরে উঠিস নে।"

সেই দারুণ শীতে ভিজা কাপড়ে শিবানী উঠানে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার শীত বোধ নাই; মানদার বাক্যে দুঃখ-অভিমান কিছুই নাই। তাহার অসার দেহে যেন অনুভব শক্তি মোটেই নাই। নীরবে কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

যশোদা বলিল—"এবারকার মত মাপ কর, বড় বউদিদি ঠাকরুণ। হাজার হোক কম বয়েস ত, বুঝতে না পেরে একটা কাজ করে ফেলেছে, কি করবে বল। তুমি হলে বড়, তোমাকেই সব সইতে হয়; সব ঢেকে ঢুকে নিতে

হয়।" শিবানীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"তা' যাও, আর দাঁড়িয়ে কেন, কাপড় ছাড়গে, মেয়েটাকে একবার কোলে করগে। মাই-খেগো মেয়ে ত বটে।"

মানদা। মেয়ের উপর ত ওর মায়ার সীমা নেই, তাই মাই দেবে। ওসব মেয়ে মানুষের কি দয়া মায়া থাকৃতে পারে! আমি যাই মেয়ে তাই কত ঢেকে ঘর করি, তা' তোরা কি জানৃবি বল? কিন্তু সহ্যর ত একটা সীমা আছে, আর সহা যায় না!

'সেটা ছোটর পক্ষে' মনে মনে বলিয়া, প্রকাশ্যে যশোদা বলিল—"তা' আর জানি না, বৌদিদি, সব জানি; তুমি না সইলে নিত্যি কত ডামা-ডোলই হ'ত। আমরা বাড়ীতে তোমার কত গুণ গাই, বলি অমন সহ্যওয়ালা মানুষ কি আছে! ধর্য্যের পৃথিমী!"

যশোদা ঔষধ দিতে জানিত বলিয়া অনেক সময় শিবানীর অনেক ফাঁড়া কাটিয়া যাইত। সে অবস্থা বুঝিয়া যথাসময়ে যথোপযুক্ত অস্ত্র প্রয়োগ করিত। সেদিনও ঔষধ ধরিল, শিবানী পরিত্রাণ পাইল।

মানুষ আত্মসুখের সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে যত বড় করিয়াই দেখুক, যখন তাহার ভিতরকার সত্যটুকু জাগিয়া উঠে, তখন সে জগতের নিকট আপনার অপরাধের ভারে নত হইয়া পড়ে এবং সেই সত্যটুকু যে কোন্ সময়ে, কোন্ ঘটনায় সাড়া দিয়া উঠে তাহা কেহই অনুসন্ধান করিয়া পায় না।

নবকৃষ্ণের আজ তাহাই হইয়াছিল। সেই মৃত্যুচ্ছায়া-মলিন শিবপ্রসাদের বিবর্ণ মুখপানে চাহিয়া নবকৃষ্ণ যেন নিজের অপরাধের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিতেছিল। সত্যই কি সে অপরাধী, আজ শিব-প্রসাদের মৃত্যুকালিমালিপ্ত মুখখানা যেন তাহাকেই নিমিত্তের ভাগী করিয়া দৃঢ়ভাবে বলিতেছে, তোমার জন্যই আমার এই শোচনীয় অকালমৃত্যু, তুমিই ইহার কারণ। সত্যই কি তাই? কৈ সে এমন কোন অন্যায় কাজ করে নাই, যাহাতে সে দোষী হইতে পারে? হাঁ, দোষ হইয়াছিল বৈকি! যখন তাহার হাতেই সুখ-দুঃখের সমস্ত ভারার্পণ করিয়া দু'টী শিশু নিশ্চিত ছিল, তখন সে নিজের স্বার্থচিন্তায় মগ্ন হইয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করে নাই কি? তখন ত সে অনায়াসে শিশু দু'টীর সুখের জন্য নিজের স্বার্থ বলি দিতে পারিত। বন্ধু-হিতৈষিতার চূড়ান্ত নিদর্শন দেখাইতে পারিত। কিন্তু তাহা ত সে করে নাই।

ঠিক তাহার বিপরীত পথ ধরিয়াই সে চলিয়া আসিয়াছে। সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়াও যদি সে শিবানীকে উপযুক্ত পাত্রে ন্যস্ত করিত, তাহা হইলে তাহার অপরাধের বোঝা এত ভারী হইত না। না, এ কি ভুল করিতেছে সে! এ কি মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা! সে ত নিমিত্ত মাত্র, যাহা ঘটিয়াছে, যাহা ঘটিতেছে এবং যাহা ঘটিবে তাহা ত বিধিলিপি, তবে তাহার দোষ কি?

সেই রাত্রিশেষে নবকৃষ্ণ শিবপ্রসাদের মৃতদেহ সৎকার করিয়া প্রভাতে বাটী ফিরিল।

শিবানী কাঁদিল না। তাহার চক্ষে কেহ একবিন্দু অশ্রু দেখিতে পাইল না। তাহার অন্তরে যে প্রলয়াগ্নি ধূ ধূ জ্বলিতেছিল তাহার একটী স্ফুলিঙ্গ সে বাহির হইতে দিল না। অন্তরের আগুন অন্তরে চাপিয়া ভিতরে ভিতরে নীরবে ধ্বংস হইতে লাগিল। [ক্রমশঃ]

শ্রীউষাপ্রমোদিনী বসু।

বিবেকানন্দের উপদেশ।

প্রকৃত ভক্ত।

তিনি প্রকৃতই ভাগবত, যিনি বলিতে পারেন,—"হে জগদীশ্বর, আমি ধন, জন, পরমাসুন্দরী স্ত্রী অথবা পাণ্ডিত্য কিছুই কামনা করি না। হে ঈশ্বর, জন্মে জন্মে তোমাতে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।"

চাই প্রেম ও সহানুভূতি।

যতদিন না তোমাদের ভিতর সেই সহানুভূতি, সেই প্রেম আসিতেছে, যতদিন না তোমাদের ভিতর সেই হৃদয় আসিতেছে—যাহা সকলের জন্য ভাবে, যতদিন না ভারতে আবার বুদ্ধের হৃদয়বত্তা আসিতেছে, যতদিন না ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী কর্ম্মজীবনে পরিণত হইতেছে, ততদিন আমাদের আশা নাই।

পুরাণে বিশ্বের বিশালতা।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকর্ত্তৃক গ্রহনক্ষত্রাদি পর্য্যবেক্ষণের অত্যুৎকৃষ্ট নানাবিধ যন্ত্রাদির উদ্ভাবনের দ্বারা বিশ্বসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিশেষরূপে প্রসারিত হইয়াছে। আমাদের পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত গ্রহনক্ষত্র পরিদৃশ্যমান হয়, তৎসমস্ত লইয়াই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিরচিত ইহাই আমরা মনে করিয়া থাকি; কিন্তু যন্ত্রাদিযোগে বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা ইহার তুল্য অসংখ্য ভূমণ্ডলই আবিষ্কৃত হইয়াছে। পৃথিবী হইতে দৃষ্ট এক একটী ক্ষুদ্র তারকা আমাদের এক একটী সূর্য্যের সমান প্রকাণ্ড বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে। সেই এক একটী তারকা আমাদের সূর্য্যেরই ন্যায় গ্রহনক্ষত্রাদি লইয়াই বিস্তারশীল। সুতরাং এক একটী ক্ষুদ্রতারকারই পরিমাণ আমাদের সৌরজগতের তুল্য। এইরূপে নভোমণ্ডলে অসংখ্য তারকারূপ অসংখ্য সৌরজগতের বিস্তার কল্পনা করিতেও বুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া আসে। বিশ্বসম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এই সন্ধান বস্তুতঃই বিস্ময়জনক। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের ঋষিগণ পুরাণে আমাদিগকে এইরূপ বিশ্বেরই সন্ধান প্রদান করিয়াছেন। প্রথমে আমরা আমাদের ভূমণ্ডলের সংস্থান সম্বন্ধে বর্ণনাই উদ্ধৃত করিতেছি :—

লোমহর্ষণ উবাচ।

রবিচন্দ্রমসোর্যাবন্ময়ূখৈরবভাস্যতে।
সসমুদ্র সরিচ্ছৈলা তাবতী পৃথিবী স্মৃতা॥
যাবৎ প্রমাণা পৃথিবী বিস্তার পরিমণ্ডলা।
নভস্তাবৎ প্রমাণং হি বিস্তার পরিমণ্ডলম্॥
ভূমের্যোজনলক্ষেতু সৌরং বিপ্রাস্ত মণ্ডলম্।
লক্ষে দিবাকরাচ্চাপি মণ্ডলং শশিনঃ স্থিতম্॥
পূর্ণেশতসহস্রেতু যোজনানাং নিশাকরাৎ।
নক্ষত্রমণ্ডলং কৃৎস্ন মুপরিষ্টাৎ প্রকাশতে॥
দ্বিলক্ষে চোত্তরে বিপ্রা বুধোনক্ষত্রমণ্ডলাৎ।
তাবৎ প্রমাণ ভাগেতু বুধস্যাপ্যুশনা স্থিতঃ॥
অঙ্গারকোঽপি শুক্রস্য তৎপ্রমাণে ব্যবস্থিতঃ।
লক্ষদ্বয়েন ভৌমস্য স্থিতো দেবপুরোহিতঃ॥

সৌরির্বৃহস্পতেরূর্দ্ধং দ্বিলক্ষে সমবস্থিতঃ।
সপ্তর্ষিমণ্ডলং তস্মাল্লক্ষমেকং দ্বিজোত্তমাঃ॥
ঋষিভ্যস্তু সহস্রাণাং শতাদূর্দ্ধং ব্যবস্থিতঃ।
মেঢ়ীভূতঃ সমস্তস্য জ্যোতিশ্চক্রস্য বৈধ্রুবঃ॥
ত্রৈলোক্যমেতৎ কথিতং সংক্ষেপেণ দ্বিজোত্তমাঃ।
ইজ্যাফলস্যভূরেষা ইজ্যাচাত্র প্রতিষ্ঠতা॥"

—ব্রহ্মপুরাণ ২৩শ অধ্যায়।

"লোমহর্ষণ কহিলেন, রবি ও চন্দ্রের ময়ূখমালায় যাবৎপর্য্যন্ত আভাসিত হয়, এই সরিৎসমুদ্রশৈলসমন্বিতা পৃথিবী তাবৎপর্য্যন্তই নির্ণীত। পৃথিবীর বিস্তারপ্রমাণ যত, ঐ আকাশও তত পরিমাণেই বিস্তৃত। হে বিপ্রগণ! পৃথিবীর লক্ষযোজন উর্দ্ধে সৌরমণ্ডল অধিষ্ঠিত। চন্দ্রমণ্ডল দিবাকর হইতেও লক্ষযোজন অন্তরে বিরাজিত। নিশাকর হইতে পূর্ণ শতসহস্র যোজন উপরিভাগে সমগ্র নক্ষত্রমণ্ডল প্রকাশিত। নক্ষত্রমণ্ডলের দুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে বুধগ্রহ বিরাজিত। আবার বুধগ্রহ হইতেও তত পরিমাণ উর্দ্ধে শুক্র, শুক্রের তত প্রমাণে মঙ্গল, মঙ্গলের দুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে বৃহস্পতি, এবং বৃহস্পতির দুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে শনৈশ্চর। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ঐ শনৈশ্চরের এক লক্ষ যোজন উর্দ্ধে সপ্তর্ষিমণ্ডল বিরাজমান। সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে শত সহস্র যোজন উর্দ্ধে সমস্ত জ্যোতিশ্চক্রের কেন্দ্রীভূত ধ্রুবমণ্ডল অবস্থিত। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই ভূমি ইজ্যাফলের আধার, ইজ্যা এখানে অধিষ্ঠিত।"

ইহার পর সপ্তলোকের স্থান এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

ধ্রুবাদূর্দ্ধং মহর্লোকো যত্রতে কল্পবাসিনঃ।
একযোজন কোটীতু মহর্লোকো বিধীয়তে॥
দ্বেকোট্যৌতু জনোলোকো যত্রতে ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
সনন্দনাদ্যাঃ কথিতা বিপ্রাশ্চামল চেতসঃ॥
চতুর্গুণোত্তরং চোর্দ্ধং জনলোকাত্তপঃস্মৃতম্।
বৈরাজা যত্রতে দেবাঃ স্থিতা দেহ বিবর্জ্জিতাঃ॥
ষড়্গুণেন তপোলোকাৎ সত্যলোকো বিরাজতে।
অপুনর্মারকং যত্র সিদ্ধাদি মুনিসেবিতম্॥
পাদগম্যং তু যৎকিঞ্চিদ্বস্তি পৃথিবীময়ম্।
স ভূর্লোকঃ সমাখ্যাতো বিস্তারোঽস্য ময়োদিতঃ॥

ভূমিসূর্য্যান্তরং যচ্চ সিদ্ধাদি মুনিসেবিতম্।
ভুবর্লোকস্তু সোঽপ্যুক্তো দ্বিতীয়ো মুনিসত্তমাঃ॥
ধ্রুবসূর্য্যান্তরং যত্তু নিযুতানি চতুর্দ্দশ।
স্বর্লোকঃ সোঽপি কথিতো লোকসংস্থান চিন্তকৈঃ॥
ত্রৈলোক্য মেতৎ কৃতকং বিপ্রেশ্চ পরিপঠ্যতে।
জনস্তপস্তথা সত্যমিতি চাকৃতকং ত্রয়ম্॥
কৃতাকৃতকো মধ্যে মহর্লোক ইতি স্মৃতঃ।
শূন্যোভবতি কল্পান্তে যোঽন্তং ন চ বিনশ্যতি॥"

—ব্রহ্মপুরাণ ২৩শ অধ্যায়।

"ধ্রুবস্থানের ঊর্দ্ধে মহর্লোক, এই লোকে কল্পবাসিগণের বাস। ঐ মহর্লোকের পরিমাণ এককোটী যোজন। জনলোক দুইকোটী যোজন; এই লোক সনন্দনাদি বিমলচিত্ত ব্রহ্মনন্দনগণের বাসভূমি বলিয়া নির্ণীত। জনলোক হইতে চারিগুণ ঊর্দ্ধে তপোলোক অবস্থিত। এই লোকে বৈরাজনামক দেহহীন দেবগণ বিরাজমান। তপোলোক হইতে ছয়গুণ ঊর্দ্ধে সত্যলোক বিরাজিত। এই লোকে সিদ্ধমুনিগণের বাস। এখানে আসিলে পুনরায় আর মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। যে কিছু পাদগম্য পার্থিব বস্তু আছে, তাহা ভূর্লোক আখ্যায় অভিহিত। এই ভূর্লোকের বিস্তার আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হে দ্বিজগণ! ভূমি ও সূর্য্যের মধ্যভাগে যে সিদ্ধমুনিসেবিত স্থান, তাহার নাম ভুবর্লোক; ধ্রুব ও সূর্য্যের অন্তরালে যে চতুর্দ্দশ নিযুত যোজন স্থান, লোকস্থিতিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতে তাহার নাম স্বর্লোক। বিপ্রগণ, এই ত্রৈলোক্যকে কৃতক এবং জপ, তপ ও সত্য এই লোকত্রয়কে অকৃতক আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকেন। ঐ ত্রৈলোক্য ও জন তপঃ প্রভৃতি লোকত্রয়, ইহার মধ্যভাগে মহর্লোক কৃতাকৃতক নামে কথিত। এইলোক শূন্যময়, কিন্তু কল্পান্তে ইহার নাশ নাই।"

এস্থলে বলা প্রয়োজন যে, আমাদের পৃথিবীও সপ্তলোকেরই অন্তর্ভূত।

পৃথিবীর ঊর্দ্ধাবস্থিত সপ্তলোক এবং অধঃস্থিত সপ্তপাতাল এই উভয় লইয়াই ব্রহ্মাণ্ড গঠিত হইয়াছে যথা:—

"এতে সপ্ত মহালোকা ময়াবঃকথিতা দ্বিজাঃ।
পাতালানি সপ্তৈব ব্রহ্মাণ্ডস্যৈষঃ বিস্তরঃ॥

এতদণ্ডকটাহেন তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তথা।
কপিত্থস্য যথাবীজং সর্ব্বতো বৈসমাবৃতম্॥"

—ব্রহ্মপুরাণ ২৩শ অধ্যায়।

"হে দ্বিজগণ! এই সপ্ত মহালোক্ ও সপ্ত পাতাল, ব্রহ্মাণ্ডের এই বিস্তার আমি আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এই ব্রহ্মাণ্ড তির্য্যক্ ও অধোভাবে কপিত্থবীজের ন্যায় অণ্ডকটাহদ্বারা সর্ব্বতঃ সমাবৃত।"

এই ব্রহ্মাণ্ড আকাশাদির মণ্ডল দ্বারা কিরূপে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে, তাহাও পুরাণে বিবৃত হইয়াছে যথা:—

"দশোত্তরেণ পয়সা দ্বিজাশ্চাণ্ডঞ্চ তদ্বৃতম্।
স চাম্বুপরিবারোঽসৌ বহ্নিনা বেষ্টিতোবহিঃ॥
বহ্নিস্তু বায়ুনা বায়ুর্বিপ্রাস্তু নভসাবৃতঃ।
আকাশোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠা মহতা পরিবেষ্টিতঃ॥
দশোত্তরাণ্যশেষাণি বিপ্রাশ্চৈতানি সপ্তবৈ।
মহত্তেঞ্চ সমাবৃত্য প্রধানং সমবস্থিতম্॥

—ব্রহ্মপুরাণ ২৩শ অধ্যায়।

"এই অণ্ডকটাহ আবার দশগুণাধিক জল দ্বারা, সেই জলবেষ্টন আবার দশগুণাধিক বহ্নি দ্বারা, সেই বহ্নি আবার তদপেক্ষা দশগুণাধিক বায়ু দ্বারা, সেই বায়ু আবার দশগুণাধিক আকাশ দ্বারা এবং সেই আকাশ আবার তদপেক্ষা দশগুণাধিক মহত্তত্ত্ব দ্বারা আবৃত। এই মহত্তত্ত্ব বেষ্টনপূর্ব্বক প্রধান বা প্রকৃতি অবস্থিত।

এই প্রকৃতির রাজ্য অনন্তপ্রদেশে প্রসারিত। সেই অনন্তপ্রকৃতি রাজ্যে আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড সংস্থিত। পুরাণে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডসমন্বিত অনন্তপ্রকৃতিরাজ্য এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে:—

অনন্তস্য নতস্যান্তঃ সংখ্যানঞ্চাপি বিদ্যতে।
তদনন্তমসংখ্যাতং প্রমাণেনাপিবৈযতঃ॥
হেতুভূত মশেষস্য প্রকৃতিসা পরাদ্বিজাঃ।
অণ্ডানান্তু সহস্রাণাং সহস্রাণ্যযুতানিচ॥
ঈদৃশানাং তথাতত্র কোটি কোটি শতানিচ॥

—ব্রহ্মপুরাণ ২৩শ অধ্যায়।

এই প্রকৃতি অনন্ত; ইহার অন্ত কিংবা সংখ্যা হয় না। কেন না, প্রমাণদ্বারা উহা অসংখ্যেয়। হে দ্বিজগণ! ঐ পরমপ্রকৃতি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের হেতুভূত। উল্লিখিতরূপ সহস্র সহস্র শত শত কোটী ব্রহ্মাণ্ড ঐ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত॥"

এই কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টিভূতই বিশ্ব বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অপরিসীম বিশালতার কথা ভাবিতে বুঝি কল্পনাও পরাস্ত হয়॥

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের গল্প।

অন্ধের হস্তিদর্শন।

কতকগুলি অন্ধ লোক কার্য্যগতিকে একটা হাতীর কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল। সেইখান দিয়া একজন পথিক যাইতেছিল, সে বলিল,—'ওহে তোমরা কোথায় যাচ্ছ? একেবারে যে হাতীটার গায়ের উপর পড়বে দেখ্‌ছি!'

অন্ধেরা বলিল,—হাতী! হাতী! হাতী! শুনেছি, সে একটা জানোয়ার।

পথিক বলিল,—'জানোয়ার ত বটেই! কিন্তু কি রকম জানোয়ার তা' কি তোমরা বল্‌তে পার?'

অন্ধেরা বড় দাম্ভিক। তাহারা বলিল,—'বলেন কি মশাই? আমরা না হয় কানাই হয়েছি, চোখেই না হয় দেখ্‌তে পাইনে, তা' ব'লে হাতী কি রকম জানোয়ার তা' তা'র গায়ে হাত দিয়েও বল্‌তে পারব না?'

পথিক একটু হাসিয়া বলিল,—'আচ্ছা ভাই, তোমরা বল।'

তখন অন্ধেরা একে একে হাতীর দেহ স্পর্শ করিতে লাগিল। যে হাতীর পা ছুঁইয়াছিল, সে বলিল, হাতীটা থামের মত। যে হাতীর শুঁড় ছুঁইয়াছিল,

সে বলিল, হাতীটা একটা চোঙ্গার মত। যে হাতীর কান ছুঁইয়াছিল, সে বলিল, হাতীটা একটা কুলোর মত। এই রকম হাতীটার দেহের অন্যান্য অংশে যাহারা হাত দিয়াছিল, তাহারা রকম রকম কথা বলিতে লাগিল।

অন্ধদের হস্তিদর্শনের ব্যাপার দেখিয়া পথিক হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

[এই গল্পটী বলিয়া ঠাকুর ভক্তদিগকে বুঝাইতেছেন,—ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যতটুকু অনুভব করিয়াছে, সে মনে করে তাহাই ঠিক ; অপরের কথা বেঠিক। হাতীর দেহ সম্বন্ধে অন্ধেরা সকলেই যেমন ঠিক কথাই বলিয়াছিল, ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহাদের আংশিক জ্ঞান হয়, তাহারাও তেমনই ঠিক কথাই বলিয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয়, যাহাদের এইরূপ আংশিক জ্ঞান হয়, তাহারা মনে করে তাহাদের জ্ঞানই ঠিক, অপরের জ্ঞান ঠিক নহে। কিন্তু ঈশ্বর বিষয়ে যাহাদের পূর্ণ জ্ঞান হয়, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। চক্ষুষ্মান লোকের হস্তিদর্শনের মত তাহাদের ঈশ্বর-জ্ঞানও সুস্পষ্ট হইয়া থাকে। এই বলিয়া ঠাকুর বলিতেছেন, —"যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তা' হ'লে ঠিক বলা যায়। যে দর্শন করেছে, সে ঠিক জানে, ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার ; আরও তিনি কত কি আছেন, তা' বলা যায় না।"

রুষ-জাপানযুদ্ধের ইতিহাস

৩৫ খানি অত্যুৎকৃষ্ট হাফটোন ছবি ও ম্যাপসহ বহুমূল্য স্বদেশী এণ্টিক কাগজে অতি সুন্দররূপে মুদ্রিত ও প্রকাণ্ড পুস্তক। অন্ন ও মৎস্যভোজী ক্ষুদ্রকায় জাপানীগণ কি অপূর্ব্ব রণকৌশলে ও বিজ্ঞানবলে অর্দ্ধপৃথিবীর অধিপতি ও ইউরোপের সর্ব্বপ্রধান শক্তি রুষদিগকে জলে ও স্থলে প্রতি যুদ্ধে, সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া জগৎকে বিস্মিত, চকিত ও স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হওয়া প্রত্যেক নরনারীর অবশ্য কর্ত্তব্য। এই পুস্তকে সার্পনেল, হাই আক্সেল প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে যে সকল অতি-ভীষণ গোলা আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার দ্বারা পোর্টআর্থার প্রভৃতি মহা দুর্ভেদ্য দুর্গসমূহ কি প্রকারে বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহা মনোমুগ্ধকর ফটো চিত্রের দ্বারা এমন সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে যে, পাঠকগণ যেন রুষ-জাপান-যুদ্ধ প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন বলিয়া বোধ হইবে। অতি সরল সুমিষ্ট ভাষায় লিখিত—অল্প-শিক্ষিতা স্ত্রীলোকেও অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। পড়িতে পড়িতে শরীর রোমাঞ্চিত হইবে। পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় জাপানীগণের অদ্ভুত বীরত্ব ও জন্মভূমির জন্য অকাতরে প্রাণদান;—ইহা যে কত কৌতূহলোদ্দীপক ও লোমহর্ষণ ঘটনায় পূর্ণ, তাহা লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব। একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। উপহার দিবার পক্ষে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। ইহা দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রতি খণ্ড ১৷৷০ টাকা। একত্র দুই খণ্ড লইলে ২৷৷০ টাকা।

মনোমোহন লাইব্রেরী।

২০৩।২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৬ খানি অত্যুৎকৃষ্ট ছবিসহ ৩৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

মণিপুর চিরস্বাধীন দেশ—কি প্রকারে ইংরাজ অধিকারে আসিল—কীর্ত্তিচন্দ্রাদি আর্য্যরাজগণের শাসন-পালন-ব্যবস্থা—নাগা কুকি প্রভৃতি জাতি-জাতিগণের রহস্যপূর্ণ বিবরণ—অমানুষিক হত্যাকাণ্ড, লোমহর্ষণ ব্যাপার, যুদ্ধ, বীরশ্রেষ্ঠ টিকেন্দ্রজিতের বিশেষ বৃত্তান্ত, বিচার, রাজনীতির গূঢ়-রহস্যাদি সুমিষ্ট সরল ভাষায় বিবৃত—ঠিক যেন উপন্যাস পড়িতেছেন বলিয়া বোধ হইবে। তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য ১৲।

সরল হারমোনিয়ম টিউটর

বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠ বাগচী-প্রণীত। হারমোনিয়ম শিক্ষা করিবার এত সরল ও উৎকৃষ্ট পুস্তক এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহার দ্বারা অন্যের সাহায্য বিনা অনায়াসে সকলেই হারমোনিয়ম শিক্ষা ও তৎসহ সঙ্গীতে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। এই পুস্তকের ভাষা এত সরল যে, বালক-বালিকা পর্য্যন্ত অনায়াসে পড়িয়া বুঝিয়া শিখিতে পারিবে। অথচ ইহাতে সঙ্গীতের জটিল বিষয়গুলিও অতি বিশদ-রূপে আলোচিত হইয়াছে। আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি, হারমোনিয়ম ও সঙ্গীত-শিক্ষার্থিগণের পক্ষে ইহার ন্যায় সরল ও উৎকৃষ্ট পুস্তক এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য ১৲ টাকা।

ঘড়ি মেরামত শিক্ষা।

২য় সংস্করণ, সম্পূর্ণ পরিবর্দ্ধিত ও পুনর্লিখিত

বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল ঘোষ প্রণীত। এই পুস্তকের সাহায্যে সকলেই পকেট ও ক্লক উভয় প্রকার ঘড়িই অন্যের সাহায্য বিনা মেরামত করিতে, সম্যক পারদর্শিতা লাভ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। ইহা ঘড়ি মেরামত শিক্ষা করিবার একমাত্র উৎকৃষ্ট পুস্তক। ৬০ খানি চিত্রসহ প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্বর্ণাঙ্কিত উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ২৲ টাকা; মাশুলাদি ৵০ আনা।

মনোমোহন লাইব্রেরী, ২০৩।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

PRINTED AND Published BY S. C. PALIT,
AT KARUNA PRESS,
53, Baranashi Ghosh Street, Calcutta.

'অর্ঘ্যে'র নিয়মাবলী।

'অর্ঘ্যে'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহর ও মফস্বল সর্ব্বত্র বার আনা। ভিঃ পিঃতে লইলে ইহার উপর এক আনা অতিরিক্ত কমিশন লাগে।

'অর্ঘ্যে'র জন্য প্রবন্ধ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দিবার নিয়ম নাই। লেখকেরা নকল রাখিয়া প্রবন্ধ পাঠাইবেন।

টাকা-কড়ি, প্রবন্ধ, বিনিময়ের কাগজ এবং চিঠিপত্র নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নামে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন,

অর্ঘ্য-কার্য্যালয়,

৫৩ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ARGHYA, REG. NO. C 601

১ম বর্ষ] [৬ষ্ঠ সংখ্যা ।

অর্ঘ্য

আশ্বিন, ১৩২৫ | [October, 1918.

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন শ্রীসুরেশচন্দ্র পালিত, বি-এল্

কার্য্যালয়—৫৩ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফুলশয্যায় সুরমা !

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্য-লিপি প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন, বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে 'সুরমা'র বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা 'সুরমা' ব্যবহার করিলে ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে। বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ।৵৹ সাত আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ৸৶৹ তের আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকল প্রকার ক্ষত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি, ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ৷৶৹ এগার আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষম জ্বর এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ।৵৹ সাত আনা।

শ্রীশক্তিপদ সেনগুপ্ত কবিরাজ—আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,

[illegible] নং লোয়ার চিৎপুর রোড টেরিটিবাজার, কলিকাতা।

অর্ঘ্য
৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৪৫।

মুকুন্দরাম রায়।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশে ঘোরতর রাজনৈতিক আন্দোলন সংঘটিত হইয়াছিল। এই সময়ে মোগল ও পাঠানের অন্তর্দ্বন্দ্বনায় এবং মগ ও ফিরিঙ্গী দস্যুর তাণ্ডব নর্ত্তনে সমগ্র বঙ্গভূমি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই চারি শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বাঙ্গালী যে বাহুবলের এবং রণ-পাণ্ডিত্যের নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছিল তাহা বাঙ্গালার ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। তৎকালে বাঙ্গালার ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে যাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীন ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, মোগল বাদসাহ বা তৎপ্রতিনিধিগণকে উপেক্ষা করিয়া বাঙ্গালার স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনী লোক-পরম্পরাগত কিংবদন্তীতে, জেসুইট মিশনরীগণের রোজনামচায় এবং পারস্য ভাষায় লিখিত নানা গ্রন্থে বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। এই ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে যশোহরের প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের কেদার রায়, চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ রায় এবং ভূষণার মুকুন্দ রায়ই প্রধান।

ফতেয়াবাদের অন্তর্গত ভূষণা নামক স্থানে মুকুন্দরাম রায় বাস করিতেন। সাধারণতঃ ঐ স্থান ভূষণা-মামুদপুর বলিয়া পরিচিত। অধুনা মধুমতী নদীর পশ্চিম তীরে মামুদপুর এবং উহার পূর্ব্ব তীরে ভূষণার ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। সম্ভবতঃ গড়ই নদীর গতি-পরিবর্ত্তনের ফলে মধুমতীর উদ্ভব হইয়া ভূষণা ও মামুদপুরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ভূষণা-মামুদপুরের অতীত গৌরব-শ্রী বিলুপ্ত হইয়াছে। মহা সমৃদ্ধিসম্পন্ন ভূষণা এখন বৃটিশের একটী ক্ষুদ্র থানা বক্ষে ধারণ করিয়া পূর্ব্ব-গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতি জনগণের গোচরীভূত করিতেছে।

মুকুন্দরাম রায়ের পূর্ব্বপুরুষগণ কিরূপে কোন সময়ে ফতেয়াবাদ প্রদেশে প্রথম আগমন করেন তাহার কোনও বিশ্বস্ত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

বিক্রমপুরের ও চন্দ্রদ্বীপের রায় রাজগণ ও ফতেয়াবাদের রাজগণ এক বংশ-সম্ভূত বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। প্রতাপাদিত্য ও কন্দর্প-নারায়ণ যেমন যশোহর ও চন্দ্রদ্বীপ সমাজের প্রতিষ্ঠাতা, মুকুন্দরামও তদ্রূপ ফতেয়াবাদ সমাজের স্থাপনকর্ত্তা বলিয়া পরিচিত।

মুকুন্দরাম প্রথমতঃ ভূষণার একজন সামান্য জমিদার বলিয়া পরিচিত ছিলেন। পরে স্বীয় প্রতিভাবলে মুসলমান দেশাধিপতিগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

পাঠানপতি কতলু খাঁ ফতেয়াবাদ আক্রমণ করিলে মুকুন্দরাম ফতেয়াবাদের মোগল শাসনকর্ত্তা মোরাদ খাঁর পক্ষাবলম্বন করিয়া কতলু খাঁর বিপক্ষে দণ্ডায়-মান হন। এই যুদ্ধে মুকুন্দরাম অশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ফলে কতলু খাঁ ফতেয়াবাদ জয়ের আশা বিসর্জ্জন দিয়া উড়িষ্যাভিমুখে পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

হিন্দু বীর তোড়রমল্ল বাঙ্গালার শাসনভার গ্রহণ করিয়া আগমন করিলে তিনি মুকুন্দরামকে মোগলের পক্ষাবলম্বী জানিয়া ফতেয়াবাদের শাসনভার তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে মোগল শাসনকর্ত্তা সায়দ খাঁ মুকুন্দরামকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে একজন মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। মুকুন্দরাম এই আকস্মিক বিপদে পতিত হইয়া চিন্তিত ছিলেন বটে, কিন্তু নবশাসনকর্ত্তার হস্তে ফতেয়াবাদ সমর্পণ করিতে কোনও মতে স্বীকৃত হইলেন না। উভয় পক্ষে এই জন্য ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বাঙ্গালী বীর এই যুদ্ধে অদ্ভুত রণপাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ঘটনার পরেই মুকুন্দরাম আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন এবং স্বীয় শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। দেশের বহু লোক মুকুন্দরামের পতাকাতলে সম্মিলিত হইল। ভূষণা-মামুদপুরে হিন্দুর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইল। এই সময়ে মহারাজ মানসিংহ বাঙ্গালার শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুকুন্দরামের অভ্যুদয়ে তিনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে দমন করিবার জন্য সসৈন্যে ফতেয়াবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

মুকুন্দরামও দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করিতেন না। তিনিও তদীয় সৈন্য-দলসহ মোগল বাহিনীর সম্মুখীন হইলেন। ফতেজঙ্গপুর বা ফতেপুর নামক স্থানে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেদিন বাঙ্গালী বীরগণ মাতৃ-

ভূমি রক্ষা জন্য যে অদ্ভুত বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা সন্দর্শন করিয়া মহারাজ মানসিংহের চিত্তও বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে মহাপ্রাণ মুকুন্দরাম রায় স্বদেশ-রক্ষার জন্য আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। ভূষণা মামুদপুরের জনগণ অদ্যাপি এই মহাপুরুষের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকাহিনী স্মরণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়।

আহুতি।

(১০)

ইদানীং শিবানীর প্রতি নবকৃষ্ণের সহানুভূতি প্রকাশ পাইতে লাগিল; সেটা বুঝিতে মানদার বিলম্ব হইল না। তাহার ফলে সে সর্ব্বদাই কড়া মেজাজে থাকিত। সকল বিষয়ে জোর জবরদস্তি করিয়া চলিত। একটুতে আপনাকে খাটো করিয়া দেখিত। তাহার ব্যবহারে সময়ে সময়ে নবকৃষ্ণ উত্যক্ত হইয়া উঠিত। মানদা ভাবিত, তাহা শিবানীর প্রতি স্নেহাধিক্য বশতঃ হইতেছে। তাহাতে সে আরও জলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইত। কিসে শিবানী নাস্তানাবুদ হইবে, সতত সেই ছুতা খুঁজিয়া বেড়াইত।

শিবানীর দেহ-মন অসাড় হইয়া গিয়াছিল। সে দোষী, সে অপরাধিনী; সুতরাং তাহার অস্তিত্ব না থাকাই মঙ্গল।

একদিন দ্বিপ্রহরে নবকৃষ্ণ স্নান সমাপন করিয়া আসিয়া দেখিল, তখনও রান্না শেষ হয় নাই। ক্ষুধায় তাহার পেট জলিতেছিল। আহার প্রস্তুতের তখনও বিলম্ব দেখিয়া, চটিয়া গিয়া কণ্ঠস্বর চড়াইয়া মানদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"কি হচ্ছিল এতক্ষণ; বেলা উল্টে গেল এখনও রান্না হ'ল না? গতর নাই, কেবল বচন আছে।"

সেদিন শিবানীর অত্যন্ত জ্বর হইয়াছিল। এরূপ জ্বর তাহার মধ্যে মধ্যে হয়। সেটা চিরন্তন ম্যালেরিয়া জ্বর বলিয়া চিকিৎসার আবশ্যকতা বোধ হয় নাই। যে দিন অল্প জ্বর হইত, সে দিন উঠিয়া সংসারেরর কাজ-কর্ম্ম করিত; স্নান-আহার করিত। যেদিন জ্বর প্রবল হইত, সে দিন আর উঠিতে পারিত না। আজ সকাল হইতে সে উঠিতে পারে নাই। সুতরাং সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম সমস্তই মানদাকে করিতে হইতেছিল। সেজন্য মেজাজটা রুক্ষ হইয়াছিল। তাহার উপর নবকৃষ্ণের বাক্যে একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। উনানে হাঁড়ি চাপাইয়া তরকারী সাঁৎলাইতেছিল, দুম করিয়া তাহা মাটীতে নামাইয়া, রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মধুবর্ষিতস্বরে বলিল—

"সুয়োর কিল মধু ঢালা,
দুয়োর বেলা কাঠের চেলা।"

অন্যদিন কি আটটার মধ্যে খাও নাকি? তাই আজ বেলা হ'য়েছে! সুয়ো রাণী উঠে এসে রেঁধে দিক; আমি চল্লাম! নেহাৎ মেয়েটা খেতে পাবে না, তা'ই রাঁধ্‌তে গিছ্‌লাম; নইলে রাঁধবার জন্যে আমার দায় পড়েছে!"

হাত ধুইয়া মানদা মেয়ে কোলে করিয়া সশব্দ পদ-বিক্ষেপে হন্‌ হন্‌ করিয়া নবকৃষ্ণের বাটীর পার্শ্বে পরেশদের বাটীতে চলিয়া গেল। নবকৃষ্ণ গণ্ডে হস্তার্পণ করিয়া স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিল। সেদিন আর অদৃষ্টে অন্ন জুটিল না।

সন্ধ্যার পর জ্বরটা নরম পড়িলে শিবানী উঠিয়া বসিল। নবকৃষ্ণ গৃহেই বসিয়া ছিল; শিবানীকে উঠিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এখন কেমন আছ?"

শিবানী ক্ষীণ-কণ্ঠে উত্তর করিল—"ভাল আছি, দিদি কোথায়? খুকি কৈ।"

নবকৃষ্ণ। চুলোয় গেছে।

শিবানীর প্রাণ উড়িয়া গেল। নবকৃষ্ণের বিরক্তিপূর্ণ শুষ্কমুখের প্রতি চাহিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হ'য়েছে?"

নবকৃষ্ণ। অপরাধের মধ্যে বলেছিলাম এত বেলা হ'ল এখনও রান্না হ'ল না। তাই সে রাগ ক'রে পরেশদের বাড়ী গিয়ে দুপুরবেলা থেকে বসে আছে। মেয়েটার তখন খাওয়া হ'য়ে গিছ্‌লো, তা' নইলে সেটাও উপবাস করতো, হাড় মাস জ্বালিয়ে খেলে, আর পারা যায় না।

শিবানী সব ব্যাপার বুঝিয়া লইল। নিশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে বলিল,—"তুমি আজ সমস্ত দিন উপোস করে আছ; কিছু খেতে পাওনি।"

নবকৃষ্ণ। খাব আর ছাই; এখন মরণ হ'লেই বাঁচি!

শিবানী। দিদির আজ-কাল রাগ বেশী হ'য়েছে, জান ত। জেনে শুনে তোমার কথা কহা ঠিক হয়নি। আর একলা সংসারের সমস্ত কাজ-কর্ম্ম, মেয়ে নিয়ে কচ্ছেন; রাগ হ'তেই পারে।

নবকৃষ্ণ। রাগ হ'তেই পারে কেন? কিসের জন্য রাগ হ'তে পারে? সংসারের কাজ কেনা করে, তুমি কর না। আজ একদিন ওকে কর্‌তে হ'য়েছে বলে, রাগ হ'তেই পারে। যাক্‌ যেখানে গেছে, সেইখানেই থাক্‌; আমি আর তা'কে ডাক্‌ব না; তা'র মুখ দেখব না।

নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া শিবানী বলিয়া উঠিল—"অমন কথা ব'ল না; অধর্ম্ম হবে। যাও, দিদিকে ডেকে নিয়ে এস। তুমি না যাও, আমি যাচ্ছি।"

নবকৃষ্ণ। যা' না ঝাঁটা খেতে সাধ হ'য়েছে কি না। সমস্ত দিন কিছু খাস্‌নি; পেট ভরে ঝাঁটা খেয়ে আয়। দিদি বলে মরে যাস্‌, এই ত সমস্ত-দিন মুখ গুঁজে পড়ে আছিস, একবার খোঁজ নিয়েছে! আবার মেয়েটাকে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছে। আমি যশোদাকে পাঠিয়ে মেয়ে নিয়ে আসছি, সে চুলোয় যাক্‌।

দুর্ব্বল শরীরে উত্তেজনায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে শিবানী বলিল—"আবার বল্‌ছি ও কথা মুখে এন না। দিদি আছে তাই সংসার আছে। আর মেয়ে কার তা'ই আন্‌তে যা'বে; মেয়ে ত দিদির। ফের যদি ও সব কথা শুন্‌তে পাই ত, আমি মাথা খুঁড়ে মর্‌ব।"

শিবানীর আলুথালু বেশ, এলোথেলো ভাবভঙ্গি দেখিয়া নবকৃষ্ণ মনে মনে ভীত বিস্মিত হইলেও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। সে হাসিয়া বলিল—"মাথা খুঁড়ে মলেও সে তোর মুখ চাইবে না; মরিস তুই মর্‌বি; তা'র ঢেঁকি।"

দৃঢ়স্বরে শিবানী বলিল—"সে আমরা বুঝ্‌ব। এখন, তুমি ডাক্‌তে যাবে কি না বল।"

নবকৃষ্ণ। আমি তা' পারব না।

শিবানী আর কিছু না বলিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। মাথা ঘুরিয়া গেল; সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল।

নবকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিল ; বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া বলিল—"তোরা ত কেউ আমার কথা শুন্‌বি না ; আপন মতেই চল্‌বি। খুব লেগেছে, না"।

শিবানী। আমার কিছুই লাগেনি। তুমি যাও, দিদিকে আনগে। "আচ্ছা, যাচ্চি ; তুমি শুয়ে থাক, উঠনা।" এই কথা প্রকাশ্যে বলিয়া মনে মনে ভাবিল ভাই বোনকে নিজের সম্পত্তিটুকু দিয়া গেল নাকি ; মাথা খারাপ হয়নি ত ?

স্বল্পভাষিণী ধৈর্য্যশালিনী শিবানীর আজ স্বভাবের বিপরীত ভাব দেখিয়া নবকৃষ্ণ বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল।

নবকৃষ্ণ মানদাকে ডাকিতে গেল। অনেক সাধ্যসাধনার পর মানদা বাটী ফিরিল।

(১১)

আরও কিছুদিন কাটিয়া গেল।

একদিন প্রাতঃভ্রমণ শেষ করিয়া নবকৃষ্ণ বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, —"আমার শরীরটা বড় খারাপ বোধ হচ্ছে ; বিছানাটা ঠিক করে দাও, শোব"

শিবানী পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গিয়াছিল ; মানদা তরকারী কুটিতেছিল। কল্যাণী উঠানের এক পাশে খেলাঘরের সংসারখানির মধ্যে আপনাকে নিগূঢ়ভাবে, সন্নিবিষ্ট করিয়া সাংসারিক কাজে নিতান্ত ব্যস্ত ছিল।

সে নবকৃষ্ণের সাড়া পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া একমুখ হাসিয়া বলিল—"বাবা, আজ আমার ছেলের বিয়ে ; তোমার নেমন্তন্ন ; তুমি আজ ঘরে খেতে পাবে না। বরযাত্রী হ'য়ে মেয়ের বাড়ী যেতে হ'বে।"

নবকৃষ্ণ। কন্যার মুখচুম্বন করিয়া বলিল—মা, আজ তোমার নেমন্তন্ন রাখ্‌তে পার্‌ব না ত। আজ যে জ্বর হ'য়েছে, মা।"

কল্যাণীর হাসিভরা মুখ মুহূর্ত্তে মলিন হইয়া গেল। আরও কাছে আসিয়া "জ্বর হ'য়েছে কৈ দেখি" এই বলিয়া প্রবীণার মত গায়ে হাত দিয়া গম্ভীরভাবে কহিল, "উঃ তাই ত, গা খুব গরম হ'য়েছে যে ! আমি বিছানা করে দিচ্ছি।"

মানদা তরকারী কোটা ফেলিয়া আসিয়া বলিল—"তুই পার্‌বি না কল্যাণী, আমি বিছানা ক'রে দিচ্ছি। হাঁগা, সকাল বেলা ত কিছু বল্লে না ; বেড়াতে বেড়াতে জ্বর এল।"

মানদা বিছানা পাতিয়া দিল। নবকৃষ্ণ আপাদমস্তক কাপড় ঢাকা দিয়া শয়ন করিল। সে দিন আর উঠিল না।"

ক্রমশঃ জ্বর খুব বৃদ্ধি পাইল। গ্রামস্থ কবিরাজকে আনান হইল; তিনি ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন। সে দিন গেল, তার পরদিন গেল, চিকিৎসায় রোগের কোন উপশম লক্ষিত হইল না; রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

শিবানী আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিল। সাংসারিক কর্ম্ম ছাড়িয়া দিল। দিবারাত্র রোগীর শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া সেবা করিতে লাগিল।

দিন পাঁচ ছয় পরে একদিন মানদা বলিল—"শিবানী, তুই সংসার দেখ্‌গে, আমি এখানে আছি।"

ইচ্ছা না থাকিলেও শিবানী উঠিয়া গেল; মানদা রোগীর সেবায় নিযুক্ত হইল।

শিবানী যথানিয়মে সাংসারিক কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু আজ তা'র প্রতি কার্য্যেই ত্রুটী হইতে লাগিল। মানদা তাহা দেখিয়া বিরক্ত ভাবে বলিল—"তোর কি হয়েছে, লো শিবানী? ভীমরতি ধরেছে নাকি? মরণ আর কি? কাজের ছিরি দেখনা! স্বামী কি তো'র কি একলার, আমার কি কেউ নয়? ক্ষতি কি শুধু তো'র হ'বে; আমার হ'বে না? অত আদিখ্যেতা ভাল লাগে না; না পারিস বল্ না, আমিই করি।"

শিবানী অপ্রতিভ হইয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল—"না, দিদি তুমি ওখানে বস, আমি সব কচ্ছি।"

চিকিৎসায় কোন ফল হইল না। পরিবারবর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ঠিক দশ দিনের দিন নবকৃষ্ণ ইহলীলা সম্বরণ করিল।

পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা কল্যাণী পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিয়া পুত্রকার্য্য সম্পন্ন করিল।

আজ আর মানদার হিংসা-দ্বেষ নাই; রাগ-অভিমান নাই, আছে শুধু নিদারুণ শোকে দগ্ধ হৃদয়ের তপ্ত শ্বাস! ধুলায় লুণ্ঠিত নারীদ্বয় পরস্পর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া রোদন করিল।

সেই দিন স্নান করিয়া আসিয়া শিবানী শয্যা লইল। তাহার ভগ্ন মন প্রাণ লইয়া ক্ষীণ দেহ আর আত্মরক্ষায় সমর্থ হইল না। সে ধীরে ধীরে যে [illegible] আজ একেবারে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া শয্যাশায়ী হইল।

প্রবল জ্বরে তিন দিন অচৈতন্য থাকিয়া যখন তাহার জ্ঞান হইল, তখন শেষ সময় উপস্থিত। সে বুঝিল, তাহার সকল দুঃখের অবসানের সময় আসিয়াছে। শিবানীর চক্ষুর দীপ্তি অপূর্ব্ব ; চোখে মখে যেন কি একটা উজ্জ্বল আলো খেলিয়া বেড়াইতেছে !

মানদা সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল—"শিবানী দিদি আমার, এখন কেমন আছ বোন্ ?"

প্রসন্নতার নির্ম্মল কোমল মৃদু হাস্যে শিবানীর রোগক্লিষ্ট শুষ্ক ওষ্ঠাধর রঞ্জিত হইয়া উঠিল। ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারিত হইল—"ভাল আছি, দিদি। খুকী কৈ ?"

মানদা কল্যাণীকে লইয়া আসিল। মেয়েকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া শিবানী তাহার মুখচুম্বন করিল। কল্যাণী কাঁদিতেছিল। তাহার মাথায় হাত দিয়া সান্ত্বনার স্বরে শিবানী বলিল—"কেঁদ না মা। তিনি আমার থেকে বড়, তিনি আমার থেকে তোমায় অনেক বেশী স্নেহ করেন, তা'র কাছেই আমি তোমায় রেখে যাচ্চি। তিনি তোমার কোন অভাব, কোন দুঃখ জানতে দেবেন না।"

কাঁদিতে কাঁদিতে মানদা বলিল—শিবানী, তুই শেলের উপর শেল মেরে ভাঙ্গা বুক আরও ভেঙ্গে দিয়ে চল্লি বোন। তাঁ'র ত কোন সাধই মেটেনি। তুই তো'র মেয়ে নিয়ে তাঁ'র সাধগুলি পূর্ণ কর, দিদি, আমার বুকের আগুন কিছু নিভুক্। এ বয়সে আর আমাকে শক্তিশেলে বেঁধে মারিসনে। আজ তো'রা দু'জনে পরামর্শ ক'রেই কি আমায় শাস্তি দিয়ে গেলি ! তুই যত দুঃখ পেয়েছিস্ তার রীতিমত শোধ এই রকমেই দিলি !

শিবানী শীর্ণ হাতখানি বাড়াইয়া মানদার নয়ন মুছাইতে গেল, পারিল না ; হাত উঠিল না, পড়িয়া গেল। সে দম লইয়া আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল—"দিদি, আমার ত কোন দিনই কোন কষ্ট হয় নি, তুমি কেন দুঃখ করচ। আর আমার মনে ত কোন দিন কোন সাধ ছিল না, দিদি। সাধ ছিল তাঁর ; তা' যখন পুরাইতে ভগবান দিন দিলেন না, তখন আর আমার থাকা না থাকা দুই সমান। তুমি তাঁ'র সব সাধগুলি পূরণ কর, দিদি, তিনি স্বর্গ থেকে সুখী হবেন।"

শিবানী কিছুক্ষণ দম লইয়া তার পর আবার বলিতে লাগিল—"মিথ্যা জগতে এসেছিলাম, দিদি। কারও কোন কাজে লাগলাম না, কেবল সব নষ্টই করলাম। আমার দাদা—"

বলিতে বলিতে মৃত্যু-কালিমালিপ্ত চোখ দু'টি জলে ডুবিয়া গেল।

মানদা বুঝিল, শিবানীর অসহ্য ভ্রাতৃশোক এইবার সহ্য সীমার মধ্যে আসিয়াছে। যে শোকাগ্নি তাহাকে ধ্বংসের মুখে টানিয়া আনিয়াছে এইবার তাহা চির-নির্ব্বাপিত হইবে।

সামলাইয়া শিবানী আবার আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল,—"আমার জন্তেই দাদা অকালে জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছেন। বাবার বংশলোপ হ'য়েছে। মর্ম্মান্তিক মনস্তাপে দাদা নিজের জীবন আহুতি দিয়ে গিয়েছেন, সে জ্বালা আমার এইবার জুড়াবে, দিদি। আর যে জন্য তিনি আমাকে বিবাহ ক'রে আন্‌লেন, তা র ত কিছুই হ'ল না, কেবল অশান্তির আগুনে জ্ব'লে পুড়েই গেলেন। তুমি আমাকে কত ভালবাস্‌তে দিদি, তা' ত আমি ভাল রকমেই জানতাম। শেষে আমিই তোমাকে জ্বালিয়ে পাগল ক'রে তুলেছিলাম। কোন দিন তোমার উপর আমার রাগ ছিল না; তোমাকে অসুখী করে বড় অপরাধিনী হ'য়েছিলাম। আজ শেষ সময়ে ছোট বোনের সব দোষ মাপ কর, দিদি।"

শিবানী হাত বাড়াইয়া মানদার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল। মানদা শিবানীর মাথাটা কোলের উপর লইয়া মর্ম্মভেদী স্বরে বলিয়া উঠিল,—"শিবানী, তো'র ত কোন দোষ ছিল না। তুই সবার সব দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে মুখ বুজেই যে সব সয়ে এসেছিস্, দিদি।"

তখন শিবানীর প্রাণবায়ু দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া পঞ্চভূতে মিশাইয়া গিয়াছে; তাহার জ্বালাময় জীবনের পরিসমাপ্তি হইয়াছে!

মানদা শোক-দীর্ণ বক্ষ চাপিয়া কক্ষতলে লুটাইয়া কাঁদিয়া উঠিল,—"ওরে চির-অভাগিনী জন্মদুঃখিনী শিবানী! দুঃখ ভোগ করতেই এ জগতে এসেছিলি! একবার আয় বোন, আর তোকে কিছু বলব না! তো'কে যে একদিনও ভাল কথা বলিনি! অনাদর অভিমান নিয়েই চলে গেলি!"

সমাপ্ত।

শ্রীমতী উষাপ্রমোদিনী বসু।

ইংরেজীনবিস বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা ভাষা।

ইংরেজী-নবিস বাঙ্গালীদিগের চৌদ্দ আনা রকম লোক, বাঙ্গালা ভাষাটাকে প্রাণের সহিত অবজ্ঞা করেন; অথচ ইঁহাদের সকলেই যে চলন-সই গোছ ইংরাজী জানেন, তাহাও নহে। "মাই-দুধে"রই সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষা ইঁহারা গিলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা এখন প্রায় হজম করিয়া ফেলিয়াছেন; মাতা নিজেই হজমীকৃত, মাতৃভাষা ত কোন্ ছার! কিন্তু পুণ্যশ্লোকদের পক্ষে সেটা প্রশংসার কথা, নিন্দার নহে। যেহেতু বাঙ্গালা ভাষাটা সাফ্ ভুলিয়া যাওয়াকেই তাঁহারা পরমপুরুষার্থ বলিয়া ঠাওরান।

ইংরেজী-নবিস বাঙ্গালীর ছেলে বাঙ্গালা ভাষায় ইংরেজীর বুকনি দিয়া, কথাবার্ত্তাটা কোন রকমে চালান; কিন্তু বাপের ভাষায় একখানা চারি ছত্র দীর্ঘ চিঠি লিখিতে হইলেই চক্ষু-স্থির। "ক" হইতে "হ" অবধি অসংযুক্ত অক্ষর কয়টার মধ্যেও পাঁচ সাত দশটা অক্ষরের অসঙ্কুলান হইয়া পড়ে!

"আট এনে" ইংরাজী-ওয়ালারা বাঙ্গালাতেও যেমন "বিদ্যালঙ্কার", ইংরেজিতেও তেমনি "ন্যায়রত্ন"! ইঁহারা দুই ঘণ্টা গলদ্‌ঘর্ম্ম ছুটাইয়া বদ বানানে ও নোংরা ব্যাকরণে একখানা "মাইডিয়ারী" ইংরেজী চিঠি লিখিয়া উঠিতে যদি পারেন ত, তৎক্ষণাৎ ধ্রুবলোক পকেটস্থ হইল ভাবিয়া, "কংগ্রেসের ডেলিকেট"-পদের প্রার্থী হন। তার পর যাঁরা হাটে মাঠে বক্তৃতাবাজ, সংবাদপত্রে "প্যারা" ও প্রবন্ধবাজ ইংরেজী-নবিস, তাঁরা বাঙ্গালা ভাষায় বলদ-পঞ্চানন হইলেও ইংরেজীতে অবশ্য এ দেশীয়দিগের মধ্যে "লায়েক"। তাঁহাদের ইংরাজী বানানও ব্যাকরণসম্মত; কিন্তু তবুও বিদেশী বাঙ্গালার ইংরেজী;—সে ভাষা সাহেবদের ইংরাজীর মত সবল ও সজীব হওয়া সম্ভব নহে; তাহা দীনা দুর্ব্বলা, পাণ্ডুকবদনা, "পিচুটীনয়না"। কিন্তু হইলে কি হয়, বলদ পঞ্চানন তাহাতেই বিভোর! এই শ্রেণীর লোকেরা সময়ে সময়ে অসৎ ও সৎ সাহেবদিগের নিকট হইতে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু ইঁহারা আঘাত ও উপদেশ উভয়েরই অতীত। বন্ধুত্বের ইঙ্গিত বুঝেন না, বিদ্রূপের কষাঘাতেও "চেতেন" না। যে স্থলে লজ্জায় অধোবদন হওয়া উচিত, সে স্থলে ইঁহারা অম্লানবদনে বেহায়ারি ও বেয়াদপি জুড়িয়া দেন; সাহেবিয়ানার ভাগের জন্য সাহেবদের সঙ্গে কোমর বাঁধিয়া ঝগড়া করেন; কখনও বা তাঁহাদের কাকুতি-মিনতি করেন! সাহে-

বেরা তথা 'বুথের মত দেন'; কিন্তু 'বেহায়ার বালাই দূর'। আত্ম-সম্ভ্রম-বোধ যাঁহাদের একেবারেই নাই, ঘৃণালজ্জায় তাঁহাদের মাথা হেঁট হইবে কেন? আর সাহেবেরাই বা তাঁহাদের তামাসা দেখিয়া হাসিবেন না কেন? বাঙ্গালীর সভায় বাঙ্গালা ভাষায় কথোপকথন চলিতেছে; বঙ্গজ-পঞ্চানন উঠিয়া দাঁড়াইয়া ইংরেজিতে বলিলেন,—"মহাশয়গণ, আমি কিছু মুস্কিলে পড়িতেছি যে, বাপের ভাষায় আমার বাক্যস্ফুরণ হয় না; বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহারে আমি কখনই অভ্যস্ত নই; অতএব আমাকে মার্জ্জনা করিবেন; আমি ইংরেজিতে আত্ম-অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছি।" তা, এ দৃশ্য দেখিয়াও যদি সাহেবেরা হাত-তালি দিয়া না হাসেন, ত হাসিবেন কিসে? এ যে অতুলনীয় তামাসা।

সম্প্রতি এ সম্বন্ধে আবার একটী উপলক্ষ উঠিয়াছে। কোন ইংরাজিনবিস, কিছুদিন হইল কোনও একটা বিষয়ে 'স্পেক্টেটর' নামা বিলাতি সাপ্তাহিক পত্রে এক পত্র পাঠাইয়াছিলেন। সমীচীন সম্পাদক বাবু সাহেবের পত্রখানি প্রকাশিত করিয়া সমালোচনাছলে ইংরাজীনবিস সাধারণকে একটু সদুপদেশ দিয়াছেন। বলিয়াছেন, "বাপু সকল ইংরেজীর এত নাড়াচাড়া করিয়া কিছুই করিতে পারিবে না; সুমিষ্ট স্বদেশীয় ভাষার শিক্ষা ও সেবা কর; তাহাতেই তোমাদের মঙ্গল হইবে। ইংরেজীর অনুকরণ করিয়া, তোমরা কেবল অধঃ-পাতেই যাইতেছ,—ইংরেজ হইতে পারিতেছ না। তাহা কখনই পারা যায় না। তোমরা বলিতেছ, অনুকরণে তোমাদের ইষ্ট ও উন্নতি হইতেছে; কিন্তু আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, তাহাতে তোমাদের ঘোর অনিষ্ট ও অবনতি হইতেছে। অনুকরণে তোমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি ও চরিত্র-বল দিন দিন দারুণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে।"

পত্র-প্রেরক নিজে স্পেক্টেটরের কথায় কি উত্তর দিয়াছেন বা দিবেন, আমরা জানি না। কিন্তু প্রবীণ স্পেক্টেটরের কথার প্রতিবাদ অন্যান্য পুণ্য-শ্লোকেরা খুবই করিতেছেন; বাক্‌চাতুরীর বেহায়াপনায় তাঁহাদিগকে কে আঁটিবে! কোনও অতিচিন্তক বাঙ্গালী সম্পাদক কহিতেছেন—The idea of perfecting the native mind, by indigenous education is not worth a moment's consideration. অর্থাৎ দেশীয় শিক্ষার দ্বারা এ দেশীয় 'নেটিব'দিগের মনের পূর্ণোন্নতিসাধন করার কল্পনা মুহূর্ত্তেকের জন্যও বিবে-চনার যোগ্য নহে।

তা বটে ত! এমন নহিলে কি আর পুণ্যশ্লোক! বিলাতি আঁস্তাকুড়

বিশিষ্ট বিবেচনার যোগ্য, স্বদেশীয় স্বর্গও মুহূর্ত্তেকের জন্ম বিবেচনার যোগ্য নয়! যেহেতু প্রথমোক্ত পূর্ণোন্নতি, শেষোক্ত ছাই ভস্ম! স্বদেশীয় ভাষার ও সাহিত্যের উন্নতিতে বাঙ্গালীর কোনও উন্নতি হইবে না; তাঁহার ষোল-আনা উন্নতি হইবে টেনিসনের কাব্যে শতকরা যতগুলি. করিয়া স্ক্যান্ন শব্দ আছে, গম্ভীরভাবে তাহার গণনা করিয়া। কিন্তু মহাশয় অতি নিকটেরই একটা দৃষ্টান্ত দেখুন! আপনার ইংরেজী ভাষায় টেনিসন সমালোচনা ইংরেজের নিকট হাস্যাস্পদ, বাক্যপ্রিয় বাঙ্গালীর কাছেও হেয়! অসংখ্য ইংরেজী 'রিবিউ' রাখিয়া, কে আপনার ঐ পিছুটানয়না সমালোচনা স্পর্শ করিবে? আপনার এই সাহিত্যানুরাগ যদি স্বজাতীয় ভাষায় স্ফুরিত হইতে পারিত, তাহা হইলেও বরং উহার কথঞ্চিৎ মূল্য হইত, কারণ স্বজাতীয়তায় কিছু না কিছু সজীবতা থাকেই থাকে। ইয়ুরোপীয় অন্যান্য জাতিরা ইংলণ্ডীয় কবি ও কাব্যের সমালোচন স্ব স্ব দেশীয় ভাষাতেই করিয়া থাকেন। আবশ্যক হইলে ইংরেজেরা নিজেই ইংরেজীতে তাহা অনুবাদ করিয়া লয়েন।

ফের্দ্দানী করার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদুনী গাওয়াও আছে খুব। বাবু কাঁদিয়া কহেন, "হে ইংরেজ! বল, তবে আমরা যাই কোথায়, দাঁড়াই কোথায়? যদি আমরা ইংরেজী ধরণে না চলি, রাজনীতিক লড়াই না করি, সমাজ-সংহারের প্রয়াস না পাই, তোমরা আমাদিগকে বল গণ্ডমূর্খ, আমরা যদি এ সকল করি, তাহা হইলেও বল গাধা। অতএব আমাদের উপায়?" হায় হায়! উপায় কিছুই নাই! স্রোতের শৈবাল স্রোতেই ভাসিবে! বায়ু-বিতাড়িত তৃণ দাঁড়াইবে কোথা?

৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

—

ব্রাহ্মণ ও শূদ্র।

(প্রতিবাদ)

আমরা ১৩২২ সালের জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যার 'অর্ঘ্যে' "ব্রাহ্মণ ও শূদ্র" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম। উক্ত প্রবন্ধে আমাদের এই চাতুর্বর্ণাধিষ্ঠিত সমাজের ব্যক্তিবিশেষ ব্রাহ্মণগণকে আক্রমণ করিয়াছেন। বৈদেশিকগণ যে ব্রাহ্মণকে আক্রমণ পূর্ব্বক অযথা নিন্দাবাদ করেন তাহার কতকগুলি হেতু আছে। প্রথমতঃ বৈদেশিকগণ চাতুবর্ণের মধুময় ফলরসাস্বাদনে বঞ্চিত; অধুনা তাঁহারা পুরুষকারবলে বলী হইয়া ব্যবহারিক বিজ্ঞানে বিশেষ বিজ্ঞ হইলেও আমাদের কর্ম্মভূমি ভারতীয় পরলোক-বিজ্ঞানে নিতান্ত অনভিজ্ঞ বলিয়া জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে একান্ত আস্থাশূন্য। কাজেই আমাদের চাতুবর্ণের মূল ব্রাহ্মণপ্রাধান্য, তাঁহারা (বৈদেশিকগণ) মূর্খকল্পিত এবং স্বার্থপরতামূলক বলিয়াই মনে করেন। এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে আমাদের বলিবার কিছু নাই এবং কতক পরিমাণে তাঁহারা অনুকম্পার্হ। কারণ এ কথা অস্বীকারের উপায় নাই যে, তাঁহারা (বৈদেশিক গণ) যে দর্শনশাস্ত্র অনুশীলন করিয়াছেন তাহা আমাদের দর্শন শাস্ত্রাপেক্ষা অনেক অংশে—(বিশেষতঃ আস্তিকাংশ) ন্যূন। আস্তিক্যবাদ সম্বন্ধে—আত্মদর্শন সম্বন্ধে তাঁহাদের চিন্তা—তাঁহাদের আচার-ব্যবহার, আমাদের নিম্নস্তরের ব্যক্তিবর্গ অপেক্ষাও বহু নিম্নে অবস্থিত। তবে তাঁহারা পৌরুষবলে (কতক অদৃষ্টবলেও বটে) বলী, অপ্রতিহত রাজশক্তি তাঁহাদের আয়ত্ত, পক্ষান্তরে বহু শতাব্দী ধরিয়া পরাধীনতা ভোগ করিয়া আমাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অবসন্ন—এরূপ অবস্থায় তাঁহারা যে আমাদের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের নিন্দা করিবেন তাহাতে বিচিত্র কি? আর প্রোক্ত কারণেই তাঁহারা যাহা বলেন তাহা তাঁহাদের শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের হৃদয়ে তথা গতানুগতিকরূপে সাধারণের হৃদয়েও ঐ ভাব আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাই, শক্তি দুইটী, এক দৈব অপর পৌরুষ এই দুই শক্তিই তুল্য বলসম্পন্ন—দুই অন্য-নিরপেক্ষভাবে ফল প্রদান করিতে পারে। (এ বিষয়ে গত ১৩২৩ সালে অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'অর্চনা' পত্রিকায় আমাদের বিস্তৃত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।) আমরা আরও দেখিতে পাই, লোকসকল শক্তির অধীন; অতএব যখন যে শক্তি

প্রবল হয় তখন জনসমূহ অল্পবিস্তরভাবে তদ্ভাবাপ্রাণিত হয়। যাঁহাদের হৃদয় শিক্ষা ও সঙ্গগুণে—পক্ষান্তরে জাতীয় শিক্ষা ও সঙ্গের অভাবে বৈদেশিক ভাবপ্রবণ হইয়াছে তাঁহাদের হৃদয়েই তাঁহাদের প্রদত্ত যুক্তিতর্ক উপাদেয় ও নিজস্ব অনুপাদেয় ও ভ্রমপূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই তুল্য যুক্তিবলেই আমরা দেখিতে পাই—"পঞ্চদশভূর্জ্জিঃ সুকৃতে স্থিরীকৃতে কৃতেনুনাকেন তপঃ প্রপেদিরে। ভুবং বদে কাশ্চিৎ কনিষ্ঠরাশ্চথম্ যথাবধর্ম্মোঽপি কৃশত্বপবিতাম্। "নকিশাস্থু যযুত্তম্য রাজনোরক্ষিতুর্যশঃ। ব্যাবৃত্তাসৎপরবেভ্যঃ শ্রুতৌতত্ত্বব্রতা স্থিতা।" ঐ ভাবে লোকহৃদয়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য, আধিপত্য বিস্তার করে। আমরা এই আধিপত্য-বিস্তার-বলেই আমাদের সমাজস্থ কতকগুলি ব্যক্তিকে স্বধর্ম্মবিচ্যুত, স্বধর্ম্মদ্বেষী, স্বধর্ম্মে তথা ধর্ম্মমাত্রে অনাস্থাপরায়ণ দেখি এবং ইহারই প্রভাবে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধসকলকে অগ্রাহ্য করা (যথা মদ্যপানাদি করা) একটা সভ্যতার অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মনু, যাজ্ঞবল্ক, অত্রি, উশনা, মহাভারত প্রভৃতির মধ্যে স্বার্থপর ব্রাহ্মণ জাতির অস্তিত্ব দর্শন করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত করিতেছেন। দুষ্টবুদ্ধি পূর্ব্বক ছল ধরা যায় না পৃথিবীতে এইরূপ ব্যাপারই নাই। নাস্তিকমতাবলম্বী চার্ব্বাক শিষ্যগণ, বৌদ্ধগণ এবং অন্যান্য বিধর্ম্মিগণ লেখক মহাশয়ের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে লেখকেরই ন্যায় দোষো-দ্ঘাটনে ব্যগ্র হইয়া বলিয়াছিলেন—

"ত্রয়োবেদস্য কর্ত্তারঃ ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ।"

ত্রিদণ্ডং ভস্মধারণম্। বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকৈতৎ প্রকীর্ত্তিতম্।"

অর্থাৎ ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও রাক্ষসে বেদ প্রণয়ন করিয়াছে। ত্রিদণ্ড ভস্মধারণ প্রভৃতি বুদ্ধি ও পৌরুষহীন ব্রাহ্মণগণের জীবিকা ইত্যাদি। কিন্তু আস্তিক্য শাস্ত্র-শস্ত্রদ্বারা তাহারা এককালে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। অধুনা ঐ নাস্তিক্য মতই নামান্তর ধারণ করিয়া সমাজ-শরীরে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে। নাস্তিক্যমত-নিরাস শাস্ত্রেই এ বিষয়ের প্রকৃত উত্তর উক্ত আছে। কাজেই নূতন করিয়া এ বিষয়ে প্রতিবাদ নিরর্থক; এবং এই জন্যই বোধ হয় উপেক্ষা করিয়া কোনও মনস্বী প্রতিবাদে অগ্রসর হন নাই। আমাদের প্রথমতঃ ঐ ভাব আসিয়া ছিল। কিন্তু কতিপয় স্থিরশের ভদ্রব্যক্তি ও বিশিষ্ট ছাত্রবর্গের ঐকান্তিক আগ্রহাতিশয় দর্শনে প্রতিবাদে অগ্রসর হইলাম।

"ব্রাহ্মণ ও শূদ্র" শীর্ষক প্রবন্ধলেখক মহাশয় প্রথমেই লিখিয়াছেন, "আর্য্য-দিগের ইতিহাস যে সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে সে সময় হইতে আর্য্য ও

অনার্য্য দুই জাতি দেখা যায়।" ইতিহাস—কোন্ ইতিহাস তিনি দেখিয়াছেন? নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিলে আমরা সেই ইতিহাসখানি খুঁজিয়া দেখিবার সুযোগ পাইতাম। আমরা যতদূর জানি তাহাতে আমাদের ইতিহাসগ্রন্থ আর পাওয়া যায় না। কালের আবর্ত্তনে বেদসংহিতার বহু শাখার ন্যায় ঐ ইতিহাস গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা শাস্ত্রে ইতিহাসের লক্ষণ এরূপ এরূপ দেখিতে পাই,—"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতং। পূর্ব্ববৃত্ত কথা যুক্তং ইতিহাসং প্রচক্ষতে॥"

একস্থলে তিনি ঋগ্‌বেদকে জগতের আদি ইতিহাস বলিয়াছেন। ইহার তুল্য অজ্ঞতা আর কি হইতে পারে? আরও এই উক্তিদ্বারা বেদসকলের পৌর্ব্বাপর্য্য জ্ঞান হয়। এক স্থলে (শ্রাবণ সংখ্যার অর্ঘ্যে) শ্রুতিকে অপৌরুষেয় বলিয়াছেন। কিন্তু এই অপৌরুষের শব্দের অর্থজ্ঞান নিশ্চয়ই তাঁহার নাই। তাহা না হইলে অর্থাৎ অপৌরুষের মানে অলৌকিক—অর্থাৎ স্বয়ম্ভু এই জ্ঞান তাঁহার থাকিলে তিনি বেদসকলের মধ্যে এই বেদটী পরে এইরূপ বাক্য বলিতেই পারিতেন না। এইরূপে প্রথমেই উন্মত্ত প্রলাপের মত পূর্ব্বাপর অসংলগ্ন বাক্য বিন্যাস করিয়া বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যাক্ অধুনাতন কেহ কেহ পুরাণসকলকেও ইতিহাস বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। কিন্তু আমরা পুরাণ ও ইতিহাস প্রভৃতিকে পৃথক্ পৃথক গ্রন্থ বলিয়াই জানি। যথা "ইতিহাস পুরাণাভ্যাং ষষ্ঠঞ্চ সপ্তমং নয়েৎ।" অর্থাৎ দিবার ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাগ ইতিহাস ও পুরাণে আলোচনাদ্বারা যাপন করিবে। ইহাতে ইতিহাস ও পুরাণ যে, পৃথক গ্রন্থ তাহা জানিতে পারি। তবে যদি পাশ্চাত্য দেশীয় মনস্বীগণের কপোল-কল্পিত ইতিহাসের কথা বলেন, তাহা হইলে আমরা বলি, ঐ সকল বাক্য লেখক মহাশয় যেমন বেদ অপেক্ষাও প্রমাণ বলিয়া মনে করেন, দুঃখের বিষয় আমাদের সকলে তাহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই জানিয়া থাকেন। এই লেখক মহাশয়ের শ্রীমুখোচ্চারিত বাক্য দেখিলেই তাহা প্রতিপন্ন হইবে। কারণ ইনি যাহা দেখিয়াছেন তাহা পাশ্চাত্য বিদ্বানগণের চর্ব্বিত চর্ব্বণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

[ক্রমশঃ]

শ্রীপ্রভাকর কাব্যস্মৃতিমীমাংসাতীর্থ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের গল্প।

প্রকৃত জ্ঞান।

কোনও স্থানে একটী মঠ ছিল। সেই মঠের সাধুরা নিত্য ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়া থাকেন। এক দিন এক জন সাধু ভিক্ষা করিতে করিতে একটু দূরে গিয়া পড়িয়াছিলেন। সেইখান হইতে ফিরিয়া আসিবার পথে দেখিতে পাইলেন,—একজন জমীদার তাহার এক প্রজাকে অত্যন্ত প্রহার করিতেছে। ইহা দেখিয়া সাধুর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি জমীদারের কাছে গিয়া বলিলেন,—'লোকটীকে আর মার্‌বেন না।'

জমীদার তখন রাগে উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছে। সে বলিল,—'কে বাপু তুমি? আমার প্রজা—দোষ করেছে, আমি বেটাকে এখনি মেরে ফেল্‌ব।'

এই বলিয়া জমীদার প্রহারের বেগ আরও বাড়াইয়া তুলিল। লোকটী ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল।

সাধু তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি আসিয়া মাঝে পড়িয়া জমীদারের হাত হইতে লোকটীকে ছাড়াইয়া দিতে গেলেন। যেমন যাওয়া, জমীদার লোকটীকে ছাড়িয়া দিয়া সাধুর উপর পড়িল এবং তাহার যত রাগ ছিল সমস্তই সাধুটীর উপর ঝাড়িয়া ফেলিল। জমীদারের প্রহারের চোটে তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

এদিকে লোকের মুখে মুখে মঠে খবর গেল যে, মঠের এক জন সাধুকে এক জন জমীদার এমন প্রহার করিয়াছে যে, তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছেন।

এই খবর পাইয়াই মঠের অন্যান্য সাধুরা সেই দিকে ছুটিলেন। তাঁহারা ঘটনাস্থলে আসিয়া দেখিলেন,—খবর সত্য; সাধুটী প্রহারের চোটে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন।

তখনই তাঁহারা সকলে ধরাধরি করিয়া সাধুটীকে মঠে আনিয়া ফেলিলেন।

সাধুটীর অবস্থা দেখিয়া মঠের সাধুদের মুখ শুকাইয়া গেল। তাঁহারা কেহ আহত সাধুকে বাতাস করিতে লাগিলেন, কেহ তাঁহার মুখে ঠাণ্ডা জল ছিটাইতে লাগিলেন। কিন্তু সাধুর আর জ্ঞান হয় না। তখন একজন প্রবীণ সাধু বলিলেন,—'ওহে তোমরা ওঁর মুখে একটু দুধ দিয়ে দেখ দেখি।'

মুখে একটু একটু দুধ দিতে দিতে সাধুটীর চৈতন্য হইল। তিনি চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন।

তখন অনেকের সন্দেহ হইল—ইঁহার সত্যই জ্ঞান হইয়াছে কি না; লোক চিনিতে পারেন কি না। তাই সন্দেহ দুর করিবার জন্য এক জন সাধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সাধু মহারাজ! আপনাকে দুধ খাওয়াচ্ছে কে বল্‌তে পারেন?'

সাধুটী ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,—'যিনি আমাকে মেরেছিলেন, তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন।'

[এই গল্পটী বলিয়া ঠাকুর উপদেশ দিতেছেন,—"ঈশ্বরকে জান্‌তে না পারলে এরূপ অবস্থা হয় না। যাদের চৈতন্য হয়েছে তা'রা পাপ-পুণ্যের পার। তা'রা দেখে ঈশ্বরই সব কর্‌ছেন।"]

বিসর্জ্জন।

বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিতে আরম্ভ হইয়াছে। আজ যেন সকলেরই মুখে একটা বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। এ কয়দিন যেমন সকলেরই মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সকলেরই গৃহে একটা আনন্দ-উল্লাস দেখা দিয়াছিল, আজ আর সে ভাব নাই। আজ যে বিজয়া!

রায়পুরের শিরোমণি মহাশয়ের বাড়ী নিস্তব্ধ। বাড়ীতে যেন বহুকাল হইতে জনপ্রাণী নাই। মাকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য চন্দ্রভাগা নদীতীরে আজ সকলেই যাইতেছে, আজ আর বৃদ্ধ যুবকের কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু কৈ, সে ঘাটেও ত শিরোমণি মহাশয় নাই।

মানুষ অনেক সময়ে নিজেই জানে না সে কি করিতেছে। প্রবৃত্তির তাড়নায় সে চলে। তখন ভাল-মন্দ বিচার করিবার শক্তি তাহার থাকে না।

যেদিন বোধনের বাজনা বাজিয়া উঠিল, ছেলেরা আগমনীর গান গায়িতে আরম্ভ করিল, শিরোমণি মহাশয় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার চোখ জলে ভরিয়া আসিল। তিনি শুধু একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আনন্দময়ী! তোর মনেও এই ছিল মা!" পরে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তিনি কত কথাই ভাবিতে লাগিলেন। আজ পাড়ায় ঘোষালদের বাড়ী কোলাহলময়, ওপাড়ার রায়েদের বাড়ীতে লোক আর ধরে না, মুখুয্যেদের বাড়ীতে তিনটি ঢাক বসিয়াছে, শুধু তাঁহারই বাড়ী নিস্তব্ধ! কোন সাড়াশব্দ নাই, কোন লোকসমাগম হয় নাই,—অথচ একদিন এই বাড়ীতে লোক ধরিত না, আজ আনন্দে সকলেই পূজা বাড়ীতে গিয়াছে, কিন্তু শিরোমণি মহাশয়ের বাড়ীতে—হা ভগবান্!

রায়পুরের শিরোমণি মহাশয়দের বাড়ীতে যে কোন সময় হইতে মায়ের শুভাগমন হইতেছে তাহা গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা কেহই জানিত না। সে বাড়ীতে প্রথম বোধন বসিয়াছিল বোধ হয় দুই শত বৎসরেরও পূর্ব্বে। সেই সময় হইতে ঐ বাড়ীতে চিরকাল মা দশভূজা আসিয়াছেন, কোন বারেই বাদ পড়ে নাই। শিরোমণি মহাশয় নিজে যখন বালক ছিলেন, তখন তাঁহার বাড়ীতে কত ঘটাই না হইত। আর আজ?—

তাঁহার বাড়ীতে আর কেহ ছিল না, ছিল কেবল তাহার স্ত্রী, একমাত্র পুত্র ও বৃদ্ধা পিসিমাতা। বৃদ্ধা মারা যাইলে পর তাঁহার স্ত্রীই এতকাল মায়ের পূজার আয়োজন করিতেছিলেন, পরে যখন তিনি প্রায় বৃদ্ধ তখন দুরন্ত ম্যালেরিয়া শিরোমণি মহাশয়কে এই পৃথিবীতে একেলা ছাড়িয়া তাঁহার স্ত্রী-পুত্রকে টানিয়া লয়। সে আজ সতর বৎসরের কথা!

এই সতর বৎসর তাঁহার কি ভাবেই না দিন কাটিয়াছে! অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। জমি জমা যাহা ছিল তাহা এখন আর তাঁহার নাই। বাকী খাজনায় সব হাতছাড়া হইয়া পড়িয়াছে। উপার্জ্জন হইত শিষ্যবাড়ী হইতে। কিন্তু এখন আর সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। বঙ্গদেশ আর সে বঙ্গদেশ নাই। গুরুভক্তি, ব্রাহ্মণসেবা এখন অতীতের জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন ভদ্র ব্যক্তি দরিদ্র নরনারায়ণের সেবা করিয়া আর নিজেকে ধন্য মনে করেন না। এখন বিলাস সকলের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। এখন পূজার সময় মা দুর্গাকে ঘরে না আনিয়া ঐ সময় দেশভ্রমণ করাই রীতি। দেশভ্রমণের আমোদ-আহ্লাদে ছুটি কাটানই এখনকার পূজা!

কিন্তু এত দরিদ্র হইয়াও শিরোমণি মহাশয় বৎসরান্তে মাকে একবার নিজ গৃহে আনিয়াছেন। নিজের বসত বাড়ীর একদিক পড়িয়া গিয়াছে, সেদিক জঙ্গলপূর্ণ, দিবাকালেই বাড়ীতে শৃগাল নির্ভীকভাবে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, উপরের ঘরের ছাদ ফাটিয়া গিয়াছে বর্ষায় ঘরে জল পড়ে, কোন্ দিকে দৃক্‌পাত নাই, তবু বৎসরান্তে মায়ের হাসি মুখ তিনি একবার দেখিয়াছেন। যখন তিনি মঙ্গলঘটের সম্মুখে বসিয়া পূজায় বসিতেন, তখন তাঁহার মনে হইত বাস্তবিকই তিনি সেই জগজ্জননার আদরের ছেলে। একবার মায়ের দিকে তাকাইতেন আর সেই সৌম্য, ধীর, স্থির, গম্ভীর বদনমণ্ডল কি এক অপরূপ জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।

নিজের খাদ্য ছিল একবেলা হবিষ্যান্ন, অন্য বেলায় যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ। আর যাহা পাইতেন, প্রাণ ভরিয়া তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। বছর পরে মাকে যে আনিতে হইবে!

গত বৎসর যখন তাঁহার সেই পৈতৃক সিন্দুক খুলিয়া দেখিলেন যে, মাত্র সাতাইশটি টাকা আছে, তখন তিনি একদিন প্রাতঃকালে পূজা-অর্চ্চনাদি শেষ করিয়া গ্রামের বৃদ্ধ রাইচরণের বাড়ী যাইয়া ডাকিলেন, "রাইচর—ণ, ও রাইচরণ, বাড়ী আছ হে?"

"কে? এই যে দা' ঠাকুর। পেন্নাম হই। সকালে, এজ্ঞে কি মনে করে? এই কাউকে দিয়ে, এজ্ঞে, একবার খবরটা পাঠালেই আপনার পায়ের ধূলোটা এই নিয়ে আসতাম।" এই বলিয়া বৃদ্ধ রাই শিরোমণি মহাশয়ের পদধূলি লইয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইয়া রহিল।

"তা আমি বাবা এসেছি এক বিশেষ কাজে"—এই বলিয়া শিরোমণি মহাশয় যখন একটু ইতস্ততঃ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন যে, মাত্র সাতাইশটি টাকা আছে, মাকে আর আনা সম্ভব হইবে না, তখন রাইচরণ অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "এই কথা দা' ঠাকুর? তা চিন্তে কি? ও টাকায় খুব হবে?"

"খু—ব হবে? বল কিহে? এই দেখনা তোমার—" "ছিঃ! ছিঃ! দা' ঠাকুর, ও কি কথা বলেন? আমরা ত আপনাদের খায়েই মানুষ। মাকে বছর বছর আনা ত' আমাদের কত্তব্যো দা' ঠাকুর। চিরকাল ত আপনাদের খায়েই আসছি। আর এবার যদি আমি পেত্তিমা না গড়লুম, তাহালে যে আমি অকেতজ্ঞ হব।" বৃদ্ধ শিরোমণি মহাশয় এই কথা শুনিয়া প্রথমে একটু

আশ্চর্য্য হইলেন, পরে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া আরও দুই একটি পরামর্শ করিয়া ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিলেন।

গত বৎসরও এই রকমে মায়ের পূজা হইয়াছিল। কিন্তু এ বৎসর? শিরোমণি মহাশয় অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু টাকার যোগাড় হইল না। বৃদ্ধ চিরদরিদ্র। কে তাঁহাকে টাকা ধার দিবে? তিনি ত বাড়ীতে দশটা চাকর রাখেন নাই, বাড়ীতে ত গাড়ী ঘোড়া নাই, মধ্যে মধ্যে হাকিম বাহাদুরেরা আসিয়া তাঁহার বাড়ীতে পদধূলি দিয়া তাঁহার ত পূর্ব্বপুরুষকে উদ্ধার করে না, তবে তিনি টাকা কোথা হইতে পাইবেন? এখন যে সকলেই সুসভ্য! হায় সে বৃদ্ধ রাইচরণও নাই! মাস কয়েক পূর্ব্বে জগৎ হইতে সে চিরবিদায় লইয়াছে। সেকালের লোকের মধ্যে আছেন কেবল 'গ্রামের শিরোমণি মহাশয়।'

এ কয়দিন শিরোমণি মহাশয়ের কি ভাবেই না দিন কাটিয়াছে! একবার চণ্ডীমণ্ডপ, একবার ঘর এই করিয়াছেন। আর কেবল বলিয়াছেন, "তোর মনে এই ছিল মা! কি পাপ করেছি মা? বংশের আমিই যে কলঙ্ক হ'য়ে দাঁড়ালাম। আমা হ'তেই বংশ নির্ব্বংশ, আর আমা হ'তেই তুই আসা বন্ধ করলি মা? তারা শিবসুন্দরী, মা—গো" বৃদ্ধ কেবল এই বলিয়াছেন আর চোখের জল ফেলিয়াছেন। আজ যখন বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিয়া উঠিল, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। একেবারে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। পরমুহূর্ত্তেই আশ্চর্য্য একেবারে চুপ। কোন হাসিকান্না ভাব নাই, একেবারে গম্ভীর। চণ্ডীমণ্ডপে আলো দিয়া শিরোমণি মহাশয় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। একবার দালানের ভিতর তাকাইলেন, আবার তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া লইলেন। ওঃ! একেবারে খালি, কিছু নাই। একেবারে শূন্য। আর আজ তাঁহার বুকের ভিতরটা? সেখানেও একটা হাহাকার, একটা বিরাট শূন্যতা ছুটাছুটি করিতেছে।

সন্ধ্যার এক প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। চারিদিক হইতে বিসর্জ্জনের বিষাদমাখা ঢাকের আওয়াজ কাণে আসিতেছে। এমন সময় আবার একবার জোরে ঢাকের আওয়াজ হইল। গ্রামের সব প্রতিমাই এখন নদীগর্ভে। কেবলমাত্র ঘোষালদের বাড়ী হইতে তখনও দেবী যান নাই। এইবার তিনিও চলিলেন। শিরোমণি মহাশয়ের কি যেন কি। মনে হইল, পরে তিনিও উঠিয়া ঘাটের দিকে গেলেন।

ঘাটে বহু লোক। খুব ভিড় হইয়াছে। ঘোষাল মহাশয়েরা চিরকালই খুব ধুমধামের সহিত বিসর্জ্জন দেন। প্রতিমা ঘাটে নামান হইয়াছে এমন সময় শিরোমণি মহাশয় আসিয়া একটু দূরে অন্ধকারে নদীর তীরে বসিলেন। একবার প্রতিমার দিকে তাকাইলেন, মাকে দেখিতে পাইলেন না, বড় ভিড়।

পরে যখন প্রতিমাকে নৌকায় উঠান হইল শিরোমণি মহাশয় একবার মায়ের দিকে তাকাইলেন। মনে হইল যেন মা তাঁহার দিকে তাকাইয়া হাস্যমুখে তাঁহাকেই ডাকিতেছেন। যেন বাস্তবিকই তিনি তাঁহাকে সঙ্গে যাইতে বলিতেছেন। শিরোমণি মহাশয় দাঁড়াইয়া উঠিলেন। নৌকা চলিতেছে শিরোমণি মহাশয়ও জলে নামিতেছেন। আরও—আরও—।

শিরোমণি মহাশয়ের এখন গলা পর্য্যন্ত জল। তাঁহার দৃষ্টি এখন সেই প্রতিমার দিকে। বাধা নাই, ভ্রুক্ষেপ নাই, তিনি মার দিকে তাকাইয়া মার কাছে যাইতেছেন।

যে নৌকা দুইটির উপর মায়ের প্রতিমা ছিল, সেই নৌকা দুটি যখন পরস্পর পৃথক হইতে লাগিল, আর 'মা' বৎসরের মত যেমন চলিয়া গেলেন, ঠিক সেই সময়ে সেই আঘাটার দিক হইতে "মা, আমায়ও নিয়ে চল্ মা" এই কথাগুলি সকলে শুনিতে পাইল। সকলেই সেই দিকে তাকাইলেন কেহই কিছু দেখিতে পাইলেন না। কেবল যেন একটা অন্ধকার জমাট হইয়া সেই খানে জলের উপর গা এলাইয়া দিয়াছে। সকলে সেই দিকে আলো লইয়া গেল। কেহই কিছু দেখিল না, দেখিল শুধু নদীর জল যেন একটু অসম্ভব রকমের আলোড়িত হইতেছে, আর কিছুই নহে। শিরোমণি মহাশয় মায়ের ডাক শুনিতে গিয়াছেন।

শ্রীশিশিরকুমার রায়।

আবাহন।

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য
ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারদাত্রী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

* * *

অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্তঘোরে
বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহ ভাজাম্।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারনৌকা
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

দেবী আসিতেছেন। অনাথ-দীন-বিপন্নের রক্ষয়িত্রী সর্ব্বদুর্গতিনাশিনী দুর্গা বাঙ্গালায় আসিতেছেন।

আজ বিপন্নের কাতর আর্ত্তনাদে গগন-পবন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বাঙ্গালী বিপদ-সাগরে ভাসিতেছে। ভীষণ দুর্ম্মূল্যতার দাপটে, বন্যার প্রকোপে, বাঙ্গালার নরনারী প্রপীড়িত। এ দুর্দ্দিনে কাহার শরণ লইব মা? তুমি আসিতেছ, ভয়ার্ত্ত ভীত বিপদসাগরে নিমজ্জিত আমরা—এ সঙ্কটকালে তুমিই আমাদিগকে রক্ষা কর।

বন্যায় বাঙ্গালার বহু প্রাণী নিরাশ্রয় হইয়াছে। উত্তর-বঙ্গের কিয়দংশ বন্যায় ডুবিয়াছে; দীনের কুটীররাজি ভাসিয়া গিয়াছে। অনাহারে অর্দ্ধাহারে বৃক্ষতলে রাজপথে শিশুসন্তানকে বুকে লইয়া ছিন্নবাসে তাহারা কালযাপন করিতেছে। আনন্দময়ী! তোমার আগমনে আজ বাঙ্গালায় আনন্দের কোলাহল নাই। দুঃখ-ব্যথার পাষাণ চাপে বাঙ্গালার অধিকাংশ নরনারী নিষ্পেষিত হইতেছে।

দুর্গতিনাশিনি! তুমি আসিয়া আমাদের সকল দুর্গতি দূর করিয়া দাও মা! যদি আসিতেছ, বাঙ্গালার নন্দদুলালগণের হৃদয়ে সহানুভূতির উদ্রেক করিয়া দাও মা! সমবেদনার উৎস উৎসারিত করিয়া তাহাদিগকে লোক-সেবায় উদ্বুদ্ধ কর মা! সেবাধর্ম্মের পুষ্পাঞ্জলিতে বাঙ্গালায় আবার তোমার পূজা সার্থক হউক।

তোমার পূজা ত ভোগসর্ব্বস্ব নহে। ত্যাগের নীলোৎপলে যে তোমার পূজা সার্থক হয়। ভোগকে সম্পূর্ণরূপে না ভুলিলে, স্বার্থ ও বিলাস-ব্যসনকে দূরে পরিহার না করিলে তোমার পূজা হয় না। ভোগ-তন্ত্রের পথ হইতে আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তকে ত্যাগের পথে, লোক-সেবার পথে লইয়া চল। আমাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া তোমার পূজা তুমিই সার্থক করিয়া লও মা!

তুমি বাঙ্গালীর দেশ-মাতৃকা। কোটী কোটী বঙ্গসন্তানের জননী। আমরা অর্থসম্পদে কাঙ্গাল বটে; কিন্তু সহৃদয়তায় এখনও কাঙ্গাল হই নাই। আমরা বুঝি, ব্যষ্টি হইতেই সমষ্টির উদ্ভব। বিন্দুর মধ্যেই সিন্ধু উথলায়। আমরা বুঝি তিল তিল করিয়া 'বিদুরের ক্ষুদ' সঞ্চিত হইলে কোটি কোটি নর-নারীর সেবাযোগ্য বিরাট অন্নস্তূপ গঠিত হইতে পারে। আমরা বুঝি, একের পক্ষে যাহা বোঝা, দশের পক্ষে তাহা 'শাকের আটী' মাত্র।

আজ বন্যা-বিপন্ন নর-নারীর সেবায় ও বস্ত্র-হীনকে বস্ত্র-দানে সেই সমষ্টি-শক্তির পরিচয় দিয়া বাঙ্গালী তোমার দেশ-মাতৃকায় আবাহন কর, করুণারূপিনী জননীর পূজা সার্থক কর। যাহার যেমন সামর্থ্য তদনুরূপ দান করিয়া তোমার সেবাভাণ্ডার পূর্ণ কর।

তুমি ভোগ-বিলাসে মত্ত হইয়া আত্মদেহের তুষ্টি পুষ্টি করিবে, আর তোমার বিপন্ন ভ্রাতৃবৃন্দ একমুষ্টি অন্নের জন্য হাহাকার করিবে—জননী এ বিসদৃশ ব্যাপার ত দেখিতে পারিবেন না। যেখানে একজন সন্তানও অভুক্ত থাকিবে, সেখানে মাতার পূজা হয় না, হইতে পারে না।

তাই বলিতেছি, বিপন্ন নরনারীর সেবা করিয়া এবারকার মহাপূজা আমাদিগকে সার্থক করিতে হইবে। এ ত আমার একেলার পূজা নহে, এ যে জাতির পূজা; কোটী কোটী বাঙ্গালীর মাতৃপূজা। জাতিকে ভুলিয়া, সমাজকে ভুলিয়া এ পূজা হইতে পারে না। বিশেষতঃ জাতির যাহারা মেরুদণ্ড, বিপদের আঘাতে তাহারা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের সেবা না হইলে, তাহাদের দুর্গতি ঘুচাইতে না পারিলে বাঙ্গালায় দুর্গতিনাশিনী দুর্গার পূজা বিফল হইবে।

আগমনী।

এলো গিরিরাজ, রাণি! উমারে লইয়ে গো।
কি কর কি কর গৃহে, দেখ না আসিয়ে গো॥
লম্বোদর কোলে করি, আগে আগে ধায় গিরি,
ষড়ানন অঙ্গুলি ধরিয়ে।
তার পাছে উমা ধায়, তোমার মুখ চেয়ে গো!

সখীর বচন শুনি, ধায় যেন চকোরিণী,
শশিরে ষোড়শী নিরখিয়ে।
তেমতি ধাইল রাণী, উনমত্তা হৈয়ে গো!

আঙ্গিনার বাহিরে আসি, হেরি গৌরী মুখশশী,
কোলে নিল বরণ করিয়ে।
পুলকে কমলাকান্ত গিরিপুরে আনন্দ দেখিয়ে॥

৺কমলাকান্ত।

আমেরিকায় আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক ক্ষমতায়
প্রস্তুত।

মেহ, প্রমেহ, প্রদর, বাধক, অজীর্ণ, অম্ল, পুরুষত্বহানি, ধাতুদৌর্ব্বল্য, বহুমূত্র, অর্শ, বাত, হিষ্টীরিয়া প্রভৃতি ব্যাধি মন্ত্রের ন্যায় আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা, মাশুলাদি।৵০ আনা।

বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত অলৌকিক
শক্তিসম্পন্ন সালসা।

সাধারণতঃ ইহা রক্তপরিষ্কারক, বিশুদ্ধ রক্ত-উৎপাদক, পারদ এবং উপদংশ বিনাশক, বলকারক, আয়ুবর্দ্ধক সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ ও রক্তদুষ্টজনিত বাত প্রভৃতি নানাপ্রকার জটিল রোগ এবং পুরাতন মেহ, প্রমেহ, প্রদর প্রভৃতি দূর করিতে ইহা অদ্বি-তীয়। সুস্থ শরীরে ইহা ব্যবহার করিলে শরীরের স্ফূর্ত্তি এবং মুখের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে মূল্য প্রতি শিশি ১॥০ টাকা, মাশুলাদি।৵০ আনা।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি ডি হাজরা,
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

PRINTED AND Published By S. C. PALIT,
At KARUNA PRESS,
58, Baranashi Ghosh Street, Calcutta.

'অর্ঘ্যে'র নিয়মাবলী।

'অর্ঘ্যে'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহর ও মফস্বল সর্ব্বত্র বার আনা। ভিঃ পিঃতে লইলে ইহার উপর এক আনা অতিরিক্ত কমিশন লাগে।

'অর্ঘ্যে'র জন্য প্রবন্ধ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দিবার নিয়ম নাই। লেখকেরা নকল রাখিয়া প্রবন্ধ পাঠাইবেন।

টাকা-কড়ি, প্রবন্ধ, বিনিময়ের কাগজ এবং চিঠিপত্র নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নামে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন,
অর্ঘ্য-কার্য্যালয়,
৫৩ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ARGHYA, REG. NO. C 691.

৯ম বর্ষ] [৭ম সংখ্যা।

কার্ত্তিক, ১৩২৫] [November, 1918.

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন শ্রীসুরেশচন্দ্র পালিত, বি-এল্

কার্য্যালয়—৫৩ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্য-লিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন, বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে 'সুরমা'র বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা 'সুরমা' ব্যবহার করিলে ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গঘ্রাণ হইতে পারে। বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ।৵৹ সাত আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ৸৵৹ তের আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকল প্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি, ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দুরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপ-কারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ৷৵৹ এগার আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেরই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষম জ্বর এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ।৵৹ সাত আনা।

শ্রীশক্তিপদ সেনগুপ্ত কবিরাজ—আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড টেরিটীবাজার, কলিকাতা।

অর্ঘ্য

১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩৫৫।

৺ বিদ্যাসাগর।

মানুষ নয়নের সাধ মিটাইয়া সাগর-দর্শন সমাপ্ত করিতে পারে না ; কারণ সাগর অনন্ত এবং অসীম, মানবচক্ষু ক্ষুদ্র এবং সীমাবদ্ধ। সাগরদর্শন মনুষ্যের পক্ষে একদেশ-দর্শন হয়, সুতরাং মানুষের মুখে এবং ভাষায় সাগরের পরিচয় একদেশনিবদ্ধ পরিচয় হইয়াই পড়ে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সত্যই আধুনিক বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালীর পক্ষে সাগর-সম অনন্ত এবং অসীম ছিলেন। তাঁহাকে আধুনিক বাঙ্গালী এখনও চিনিতে এবং বুঝিতে পারে নাই। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, যেমন অভ্রভেদী পর্ব্বতচূড়ার তলদেশে যাইয়া ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া দেখিলে গিরিরাজের মহিমা বুঝা যায় না—পর্ব্বতচূড়া দেখিতে হইলে দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে হয়, যে চূড়া যত উচ্চ হইবে সে চূড়া দেখিতে তত কিছু হটিয়া—তত দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে—তেমনি বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পনর কুড়ি বৎসর পরে বাঙ্গালার মনীষী বাঙ্গালী বিদ্যাসাগরকে চিনিতে জানিতে বুঝিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আধুনিক বাঙ্গালার বাঙ্গালী এখনও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে চিনিবার চেষ্টা করিতেছে না ; বরং বলিব, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এখনকার বাঙ্গালী ভুলিয়া যাইতেছে। এখন বিদ্যাসাগর নামে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে ; তাই বিদ্যাসাগরের স্মৃতিসভায় এখন আর তেমন আকাঙ্ক্ষা, তেমন আগ্রহ, তেমন উৎসাহ-উদ্যম দেখা যায় না।

বিদ্যাসাগর সত্যই সাগর ছিলেন—বাঙ্গালীর মানবতার সাগর ছিলেন। তাঁহাকে চিনিতে ও চিনাইতে হইলে, বাঙ্গালার যাঁহারা সে সাগর দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা জোট বাঁধিয়া বিদ্যাসাগরের পরিচয় দিবার আয়োজন করিলে, তবে যদি কিছুদিন পরে বিদ্যাসাগরকে চিনিবার সামর্থ্য আমরা লাভ করিতে পারি। লর্ড রোজবেরী একবার বলিয়াছিলেন যে, গ্লাডষ্টোনের জীবনকথা লিখিতে হইলে ইংলণ্ডের সকল পক্ষের প্রাজ্ঞ ও প্রাচীন, উদ্যমশীল ও নবীন

সকল শ্রেণীর রাজনীতিক নায়কগণের একটা লিমিটেড কোম্পানী গড়িয়া একটা সভ্ভূয় সমুত্থানের সূচনা করিয়া লেখা আরম্ভ করিতে হইবে। বিদ্যাসাগর জীবনপক্ষেও সেই কথা খাটে। কিন্তু আবার বলিব, তেমন সকল দিক দিয়া বিদ্যাসাগরকে চিনিবার চেষ্টা এখনকার বাঙ্গালী করিতেছে না।

আমি বিদ্যাসাগরকে আধুনিক বাঙ্গালার আদিপুরুষ বলিয়া মনে করি। তেমন বিরাট বিশাল মানবতার নিদর্শন বর্ত্তমান যুগে আর আমরা পাই নাই। বিদ্যাসাগর বর্ত্তমান বাঙ্গালার আদিপুরুষ—ভূমা পুরুষ। তাঁহার বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ হইতে বিধবা-বিবাহের আলোচনা-পুস্তক পর্য্যন্ত সকল বহি বাঙ্গালার মনীষাকে এক নূতন প্রবাহে প্রবাহিত করিয়াছে; তিনি তরুণ বাঙ্গালাকে গড়িয়া তুলিয়াছেন; আধুনিক বাঙ্গালার বনীয়াদ গাড়িয়া গাঁথিয়া দিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগর আধুনিক বাঙ্গালা গদ্যের একজন স্রষ্টা, সস্তায় উচ্চ ইংরেজী শিক্ষাপ্রচারের একজন প্রবর্ত্তক, সমাজ-সংস্কারক এবং দয়ার অবতার ছিলেন। এই তিন হিসাবে তাহাকে বিচার করা হইয়াছে; এই তিন দিক দিয়া তাঁহার চরিতকথা লেখা হইয়াছে। কিন্তু তিনি যে একজন আদর্শ বাঙ্গালী ছিলেন, একজন প্রকৃত জাতিপ্রীতি-সম্পন্ন জাতিগতবৈশিষ্ট্যের সাধক পুরুষ ছিলেন—তিনি যে বাঙ্গালার শেষ বাঙ্গালী, শেষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, শেষ ব্যাখ্যাতা ও অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহার মনে প্রাণে চিত্তে বুদ্ধিতে বাঙ্গালীত্ব, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বৈশিষ্ট্য জড়ান-মাখান ছিল, এটুকু আমরা বুঝিতে ভুলিয়াছি, বুঝি বা সে শক্তি হারাইয়াছি। আমার মনে হয়, এখন বিদ্যাসাগরকে বাঙ্গালীর হিসাবে, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গুণসমেত অধ্যাপক হিসাবে চিনিবার সময় হইয়াছে। দেশাত্মবোধের উন্মেষের কালে বাঙ্গালীর বিদ্যাসাগরকে চিনিয়া রাখিবার সময় আসিয়াছে।

একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"আপনি মহামহোপাধ্যায় উপাধি গ্রহণ করিলেন না কেন?" উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,—"বলিস্ কি রে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমি, আমি কি উপাধির খাতিরে জামাজোড়া পরিতে পারি? যা কোনও পুরুষে কেহ কখনও পারে নাই, তাহা কি আমি ক্ষণেকের জন্যও পরিতে পারি? জাতি যাইবে যে!" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে জাতি যাইবার কথাটা শুনিয়া আমি বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াছিলাম। তখন তিনি গম্ভীর হইয়া বলিয়াছিলেন, "জাতি কিসে যায় জানিস্? জাতিটা কি, তাহা জানিস্? যাহার দ্বারা আমার বাহ্যিক আকার

প্রকার, আচার-পদ্ধতি, নয়নের দৃষ্টি ও দ্যুতি নষ্ট হয়, তাহাতেই আমার জাতি যায়। আমার এমন পোষাক-পরিচ্ছদ হইবে যাহা দেখিলেই লোকে আমায় চিনিতে পারিবে যে, আমি বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। আমাকে বাপের বেটা হইয়া থাকিতে হইবে, বংশের ধারা—আমার সম্প্রদায়গত বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। আমি ধোলাই করা জামাজোড়া পরিলে, ঘোড়তোলা জুতা পায় দিলে আমার জাতি যায়, আমার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের—অধ্যাপক ব্রাহ্মণের বিশিষ্টতা নষ্ট হয়, আমি এই বুড়া বয়সে সে কাজ করিতে পারিব না।”

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে এই কয়টী কথা শুনিয়া আমার চমক ভাঙ্গিয়াছিল। সেই অবধি জাতিতত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি, জাতি কিসে থাকে, কিসে যায় তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার প্রয়াস পাইতেছি। আমার আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, আমার দৃষ্টিতে অতি সুন্দর, অতি মনোহর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অত্যুৎকৃষ্ট প্রতীয়মান হওয়া চাই। এই শ্রদ্ধাবুদ্ধি যতদিন থাকিবে, ততদিন প্রাণপণ করিয়া আমি আমার আহারগত এবং পরিচ্ছদগত বিশিষ্টতা এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবই। যেদিন এই শ্রদ্ধাবুদ্ধি নষ্ট হইবে, সেই দিন ধুতী-চাদর, গাড়ু-গামছা, চটি ছাড়িয়া অনুচিকীর্ষার বশে, সুবিধাবাদের মোহে ইংরেজের বা ইয়োরোপের সর্ব্বস্ব অবলম্বন করিব। ইংরেজের জাতি বজায় আছে, তাই এই অতি ঘোর গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস করিয়াও তাহারা শীতপ্রধান ইংলণ্ডের পোষাক-পরিচ্ছদ এবং জীবনরক্ষার পদ্ধতি অটুট এবং অব্যাহত রাখিয়া চলিতেছে। এই হিসাবে রসরাজ অমৃতলাল বসুর কথামত বিদ্যাসাগর ইংরেজ ছিলেন। তিনি ইংরেজের মতন নিজের পরিচ্ছদ কিছুতেই পরিহার করেন নাই। তিনি যে সাজে, যে পরিচয়ে বাঙ্গালার লোক-লোচনের গোচর হইয়াছিলেন, সেই সাজে, সেই পরিচয়ে চিতাশয্যায় আরোহণ করিয়াছিলেন। সেই বাঙ্গালীত্বের খাতিরে, সেই জাতীয়তার মহিমায় মুগ্ধ হইয়া রাজদত্ত উপাধিও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

সমাজসংস্কারকার্য্যে তিনি খাঁটি বাঙ্গালার শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ধারা পরিবর্ত্তন করেন নাই। জীমূতবাহন হইতে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার পর্য্যন্ত সকল অধ্যাপক-সংস্কারক ঋষিবাক্য এবং শাস্ত্রপ্রমাণকে শিরোধার্য্য করিয়া স্ব স্ব মতানুযায়ী ব্যাখ্যার আরোপ করিয়া ঈপ্সিত সিদ্ধান্ত লাভ করিতেন। জীমূতবাহন দায়ভাগ রচনা করিয়াছিলেন। ঐ পন্থা অবলম্বন করিয়া মীমাংসা-শাস্ত্রের বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রঘুনন্দনও ঐ পদ্ধতি অনুসারে তাঁহার

স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরও সেই সনাতন বাঁধা রাজপথ ছাড়েন নাই; বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসমাজের রীতি পরিহার করেন নাই। বিধবা বিবাহ চালাইবার সময়ে তিনি ঋষিবাক্যকে প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া বিচার করিয়াছিলেন, বহুবিবাহ বন্ধ করিবার সময়ে শাস্ত্রপদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। আজকালকার খোস্‌মেজাজী বাবু সংস্কারকদিগের মতন তিনি কেবল খেয়ালের উপর নির্ভর করিয়া কোনও কথা কহেন নাই। তাঁহার সমাজ-সংস্কার-চেষ্টার ইহাই বিশিষ্টতা। তিনি বাঙ্গালায় হিন্দু সমাজকে সংস্কৃত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন বটে, পরন্তু উহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গলাইয়া ইয়োরোপের ছাঁচে ঢালিতে চাহেন নাই। বিদ্যাসাগর খাঁটী বাঙ্গালী, খাঁটী বাঙ্গালার পুরুষসিংহ ছিলেন বলিয়া বাঙ্গালীত্বের পারম্পর্য্য নষ্ট করিতে কখনই উদ্যত হন নাই। কাজেই বলিতে হয়, ন্যাশনালিজমের হিসাবে বিদ্যাসাগর বর্ত্তমান বাঙ্গালার আদর্শ পুরুষ ছিলেন।

বিদ্যাসাগর বর্ত্তমান বাঙ্গালার শেষ বাঙ্গালী। তাঁহার জাতি যায় নাই, তিনি স্বেচ্ছায় বা অজ্ঞানে বিলাসের মোহে বা অর্থলোভে স্বীয় ব্রাহ্মণ্য-বিশিষ্টতায় জলাঞ্জলি দেন নাই। তাই তাঁহার চটি এবং চাদর তিনি লাটপ্রাসাদ পর্য্যন্ত চালাইয়াছিলেন। যখন সে চটি এবং চাদর লাট দরবারে অচল হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন তিনি দরবারে যাওয়া, লাট-বেলাটের সহিত সাক্ষাৎ করা বন্ধ রাখিয়াছিলেন। ইহাকেই বলি প্রকৃত জাতি-প্রীতি। তিনি সত্যই স্বজাতিকে ভালবাসিতেন, তাই স্বজাতির চটি-চাদর কোনও লোভে পড়িয়াও ছাড়িতে পারেন নাই। তাঁহার অর্থের অভাব ছিল না, তিনি অনায়াসে সাহেবী পোষাক বা বাবুয়ানী পরিচ্ছদ খরিদ করিতে বা তৈয়ার করাইয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু সে পরিচ্ছদ ত তাঁহার নহে, তাঁহার জাতির, তাঁহার বংশের, তাঁহার দেশের নহে; তাই তিনি তাহা অবলম্বন করিতে পারেন নাই। তিনি হিন্দুসমাজের সংস্কার-প্রয়োজন বুঝিয়াছিলেন; পরন্তু যে পদ্ধতি অনুসারে অনাদিকাল হইতে তাঁহার হিন্দুসমাজ সংস্কৃত হইয়াছিল, তিনি সেই সনাতন পুরাতন পদ্ধতি পরিহার করিতে পারেন নাই। অতএব বলিতে হয়, তিনিই বাঙ্গালার দেশাত্মবোধ-সমুদ্ধ আদি পুরুষ। আমার বলিয়া দেশ, সমাজ এবং জাতিকে আঁকড়াইয়া জড়াইয়া ধরিতে যে জানে এবং পারে, সেই বিদ্যাসাগরের অনুরূপ হইবে, তাঁহার অবলম্বিত পন্থা পরিহার করিতে পারিবে না। যে প্রকৃত দেশহিতৈষী, জাতিহিতৈষী, তাহাকে বিদ্যাসাগরের অনুরূপ হইতেই হইবে।

হইবে। অতএব আইস, আজ তাঁহার স্বর্গারোহণের বাসরে আমরা সকলেই করজোড়ে বাঙ্গালার শেষ অধ্যাপক, প্রথম ও উত্তম পুরুষ, কর্ম্মময়-জীবন, দেশ-সেবক, জাতিরক্ষক বিদ্যাসাগরকে বার বার প্রণাম করি। গুরু তিনি, পথ-প্রদর্শক তিনি, দেশের সমাজের ধারক ও বাহক তিনি—তাঁহাকে নমস্কার।*

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের গল্প।

যেমন ভাব তেমন লাভ।

দুই বন্ধু পথে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। এক জায়গায় ভাগবত পাঠ হইতেছিল। একজন বন্ধু বলিল,—'ভাই এস, খানিকটা ভাগবত শুনা যা'ক।' তাহারা দুইজনেই সেখানে গেল। একজন বসিয়া শুনিতে লাগিল; আর একজন দাঁড়াইয়া রহিল এবং একটুখানি শুনিয়াই চলিয়া গেল। সেখান হইতে সে একেবারে বেশ্যালয়ে উপস্থিত হইল।

বেশ্যার বাড়ীতে স্ফূর্ত্তি করিতে করিতে তাহার কেবল বন্ধুর কথাই মনে আসিতে লাগিল। সে তখন মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিয়া বলিল,—'বন্ধু আমার হরি-কথা শুন্‌ছে, আর আমি কোন্ নরকে পড়ে রয়েছি।'

এদিকে যে ভাগবত-কথা শুনিতেছিল, সে মনে মনে বলিতে লাগিল,—'আরে রাম রাম! আমি কেবল বুড়া কথকের বক্‌বকানি শুনছি; আর বন্ধু আমার কেমন আমোদ-আহ্লাদ কর্‌ছে। আমার মত বোকা আর কেউ নেই।'

এই দুই জনের যখন মৃত্যু হইল, তখন যে ভাগবত শুনিয়াছিল তাহাকে যমদূতে লইয়া গেল এবং যে বেশ্যালয়ে গিয়াছিল, তাহাকে বিষ্ণুদূতেরা আসিয়া বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল।

---

* ১৩ই শ্রাবণ ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউট হলে বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সভায় লেখক যে বক্তৃতা করেন, এই প্রবন্ধ তাহারই মর্ম্ম-অবলম্বনে লিখিত।

[এই গল্পটী বলিয়া ঠাকুর উপদেশ দিতেছেন ঃ—"ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে তা তিনি দেখেন না। তাই কথায় আছে—ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন।"]

বদ্ধ জীব।

এক পাল ছাগল একটা বনের ধারে চরিয়া বেড়াইত। একদিন এক বাঘিনী আসিয়া সেই ছাগলের পালে পড়িল। বাঘিনী অন্তঃসত্ত্বা ছিল। সে একটা ছাগলকে ধরিয়া যেমন লাফ দিতে গেল, অমনই প্রসব হইয়া একটা ছানা বাহির হইয়া পড়িল। বাঘিনী মরিয়া গেল; কিন্তু তাহার ছানাটা ছাগলের সঙ্গে মানুষ হইতে লাগিল। ছাগলের সঙ্গে থাকিয়া বাঘের বাচ্ছাও ঘাস খাইতে এবং ভ্যা ভ্যা করিয়া ডাকিতে শিখিল। তাহার আকৃতি কেবল বাঘের মত রহিল, কিন্তু প্রকৃতি একেবারে ছাগলের মত হইয়া গেল।

ক্রমে দিন যায়। বাঘের ছানাটা একটু একটু করিয়া বড় হইয়া উঠিল। একদিন আবার ঐ ছাগলের পালে আর একটা বাঘ আসিয়া পড়িল। সে ত ঘাসখেকো বাঘটাকে দেখিয়াই অবাক্। তাহার ছাগল ধরা ঘুরিয়া গেল। সে দৌড়িয়া বাঘের ছানাটাকে ধরিতে গেল। সেটা ভ্যা ভ্যা করিতে করিতে পলাইতে লাগিল। নূতন বাঘটা কিন্তু এক লাফে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং টানিয়া হিঁচড়িয়া তাহাকে জলের কাছে লইয়া গেল। সেখানে উহার ঘাড়টা নীচু করিয়া ধরিয়া বলিল, 'এই দেখ্, জলে তোর মুখ দেখ্। ঠিক আমার মত মুখ।'

বাঘের ছানাটা মনে মনে ভাবিল, সত্যই ত বটে; আমি ত তবে বাঘ। এই ভাবিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

তার পর নূতন বাঘটা উহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল,—"আরে তুই ভাবছিস কি? এখন এই নে ধর, খানিকটা মাংস খা।"

বাঘের ছানাটা ত প্রথমে খাইতেই চায় না। শেষে নূতন বাঘটার বিশেষ জেদাজেদিতে মাংস দুই একবার চাটিল। টাট্‌কা মাংস, উহার গায়ে তখনও রক্ত লাগিয়াছিল। বাঘের বাচ্ছা—পুরুষানুক্রমে রক্তের আস্বাদে মজিয়া রহিয়াছে, রক্তের আস্বাদ পাইতেই মাংস চিবাইতে আরম্ভ করিল। আহ্লাদে সে আবার ভ্যা ভ্যা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু মুখ বন্ধ হইয়া আসিল।

তখন নূতন বাঘটা বলিল,—'এইবার বুঝ্‌লি ত তুই কে? তুই বাঘের

বাচ্ছা। আমিও যা, তুইও তা। এখন ছাগলের পাল ছেড়ে আমার সঙ্গে বনে চলে আয়।'

[এই কথা বলিয়া ঠাকুর উপদেশ দিতেছেন—কোনও কোনও লোক মনে করে, আমার বুঝি জ্ঞান-বুদ্ধি হইবে না, আমি বুঝি বদ্ধ জীব। কিন্তু এরূপ মনে করা ভুল। গুরুর কৃপা হইলে কিছু ভয় নাই। তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি,—ইহা তিনিই বুঝাইয়া দেন।]

ব্রাহ্মণ ও শূদ্র।

(প্রতিবাদ)

(২)

তিনি লিখিয়াছেন, আর্য্যদিগের আদিনিবাসভূমি ভারতবর্ষের বাহিরে উত্তরদিকে তুর্কিস্থানের অংশবিশেষ। ইহার দার্ঢ্যজন্য জম্বুনদীর উল্লেখ করিয়া অপভ্রংশ আমু (দরিয়া) নদীর বিদ্যমানতা দেখাইয়াছেন এবং এই জম্বুনদী হইতেই জম্বুদ্বীপ এই কথার উৎপত্তি হইয়াছে ইহা বিজ্ঞতার সহিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আর যায় কোথা, যখন এত মিলিয়া গেল, জম্বুনদী পর্য্যন্ত বাদ পড়িল না তখন উহাই আর্য্যদিগের আদিনিবাসভূমি! আরও বলিয়াছেন, উহার নাম প্রাচীন হিন্দুসাহিত্যে পাওয়া যায় উত্তর কুরু। লেখক মহাশয় আবার উহাকেই অর্থাৎ উত্তর কুরুকেই তুর্কিস্থানের অংশবিশেষ বলিয়াছেন। ইহার তুল্য আর হাস্যাস্পদ কি হইতে পারে? উত্তর কুরু কোথায়, তাহা লেখক কেন, ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আদৌ ধারণাই নাই। আমরা আজকাল প্রায়ই পৃথিবীর সংস্থান সম্বন্ধে এইরূপ ভ্রমপূর্ণ উক্তি শুনিতে পাই।* আমরা এই বিষয় একটু প্রস্ফুট করিতে প্রয়াস

---

* এমন কি বিজ্ঞবর লোকমান্য শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়ও বৈদিক স্থান-নির্ণয়বিষয়ে স্বরচিত গ্রন্থে সম্পূর্ণ ভ্রমসঙ্কুল মতই প্রকাশ করিয়াছেন।

পাইব। বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে স্পষ্ট ভাবেই এই বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং পাতঞ্জল যোগসূত্রের "ভুবজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ" (৩।২৫) এই সূত্রের ব্যাসভাষ্যে ইহার সবিশেষ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঐ ভাষ্যে পৃথিবীর সংস্থান এইরূপ বিবৃত হইয়াছে যথা—মধ্যে সুমেরু পর্ব্বত ও ইলাবৃত বর্ষ। তাহার চতুর্দ্দিকে—উত্তর দিক হইতে পূর্ব্বক্রমে কুমুদ, মন্দার, মেরুমন্দার ও সুপার্শ্ব নামক চারি পর্ব্বত। তাহার চতুর্দ্দিকে—উত্তর হইতে পূর্ব্বক্রমে ন্যগ্রোধ পাদপ, চূতপাদপ, জম্বুপাদপ, কদম্ব পাদপ। (আমাদের ভারতের দিকে জম্বুপাদপ পাছে এই জন্য ইহার নাম জম্বুদ্বীপ। জম্বু নামক নদ বিশেষের অস্তিত্ব জন্য জম্বুদ্বীপ নহে; ইহা বিশেষভাবে জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। জম্বুদ্বীপ নামটী শাস্ত্রীয়; শাস্ত্রেই ঐ নামের কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে; উহাকে নিজের মতে যথেচ্ছ ব্যবহার করিলে অনভিজ্ঞের নিকট "বাহবা" লাভ হয় বটে, কিন্তু বিশেষজ্ঞের নিকট একান্ত উপহাসাস্পদই হইতে হয়) তাহার চতুর্দ্দিকে আবার ঐরূপ ক্রমে নীল পর্ব্বত, মাল্যবান পর্ব্বত, নিষধ পর্ব্বত, গন্ধমাদন পর্ব্বত। তাহার পর দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ নিষধ পর্ব্বতের দক্ষিণে হরিবর্ষ, তাহার দক্ষিণে হেমকূট পর্ব্বত, তাহার দক্ষিণে কিম্পুরুষ বর্ষ, তাহার দক্ষিণে হিমালয় পর্ব্বত, তাহার দক্ষিণে ভারতবর্ষ। উত্তর ভাগে অর্থাৎ নীল পর্ব্বতের উত্তরে রমনক (রম্যক) বর্ষ, তাহার উত্তরে শ্বেত পর্ব্বত, তাহার উত্তরে হিরণ্ময় বর্ষ, তাহার উত্তরে শৃঙ্গবান পর্ব্বত, তাহার উত্তরে উত্তর কুরু। পূর্ব্বে অর্থাৎ মাল্যবান পর্ব্বতের পূর্ব্বে ভদ্রাশ্ববর্ষ। পশ্চিমে অর্থাৎ গন্ধমাদন পর্ব্বতের পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ। এই সমস্ত মিলিয়া ইহার নাম জম্বুদ্বীপ, ইহা লবণ সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত। এইরূপ শাকদ্বীপ, কুশদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপ সকল ইক্ষুর রস ও সুরা প্রভৃতি সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহাই হইল পৃথিবী। এক্ষণে একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে পাঠকবর্গ দেখিবেন, উত্তর কুরু কোথায় আর ভারতবর্ষ কোথায়। উত্তর কুরু হইল জম্বুদ্বীপের সর্ব্বোত্তর সীমায়, আর ভারতবর্ষ হইল জম্বুদ্বীপের সর্ব্বদক্ষিণসীমায়। অতএব উত্তর কুরু তুর্কিস্থানের অংশবিশেষ কি করিয়া হইল, তাহা ত আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। যাহা হউক, তুর্কিস্থানের অংশবিশেষকে উত্তরকুরু প্রতিপন্ন করা কম সাহস বা অজ্ঞতার কথা নহে (তবে যদি এইরূপ পার্থিব সংস্থাপন, ব্রাহ্মণগণের স্বার্থপরতার জন্য হইয়া থাকে তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা।) আমরা উপরে যে বিষয় বর্ণন করিলাম তাহার সংস্থান এইরূপ—

উত্তর।

উত্তর কুরু
শৃঙ্গবান্ পর্ব্বত
হিরণ্ময় বর্ষ
শ্বেত পর্ব্বত
রমনক বর্ষ
নীল পর্ব্বত

ন্যগ্রোধ পাদপ
কুমুদ পর্ব্বত

পশ্চিম। কেতুমাল বর্ষ — গন্ধমাদন পর্ব্বত — কদম্ব পাদপ — সুপার্শ্ব পর্ব্বত — সুমেরু ইলাবৃত বর্ষ — মন্দার পর্ব্বত — চূতপাদপ — মাল্যবান পর্ব্বত — ভদ্রাশ্ব বর্ষ পূর্ব্ব।

মেরুমন্দার পর্ব্বত
জম্বু পাদপ

নিষধ পর্ব্বত
হরিবর্ষ
হেমকূট পর্ব্বত
কিম্পুরুষ বর্ষ
হিমালয় পর্ব্বত
ভারতবর্ষ

দক্ষিণ।

এই যে সংস্থান দেখান হইল, ইহাকে আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক, মনঃকল্পিত বলা সঙ্গত নহে। কারণ যোগশাস্ত্র বলিতেছেন,—যোগবলে বলীয়ান্ হইলেই উহা প্রত্যক্ষ হয়। ইহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে। মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্ব্বের অন্তর্গত অনুগীতা পর্ব্বের অন্তর্গত একোনবিংশতিতম অধ্যায়ে ভগবান্ ব্যাসদেব স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, ছয়মাস কাল প্রতিনিয়ত যোগসাধন করিলে যোগের ফললাভ হইয়া থাকে। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে বলিয়াছেন, "তপস্বিভ্যোঽধিকোযোগী জ্ঞানিভ্যোঽপিমতোঽধিকঃ। কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জ্জুন॥" অতএব এই যোগশাস্ত্র যাহা বলেন তাহা মিথ্যা হইতে পারে না। তোমরা স্থূল দৃষ্টিতে পৌরুষবলে যাহা আবিষ্কার করিতে পার না, তাহাই যে অলীক একথা ভারতবর্ষে বসিয়া বলা চলে না। আমরা বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই, যুবনাশ্ব-পুত্র মান্ধাতার রাজত্ব সমগ্র জম্বুদ্বীপে ত ছিলই, তদ্ব্যতীত সমুদয় পৃথিবীই তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইয়া-

ছিল যথা—"যাবৎ সূর্য্য উদেতিস্ম যাবচ্চ প্রতিতিষ্ঠিতি। তদেতৎযৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে।" অর্থাৎ সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত প্রদেশ মাত্রেই মান্ধাতার ক্ষেত্র অর্থাৎ রাজত্ব ছিল। দ্বাপরে অর্জ্জুন উত্তর কুরু জয় করিয়া প্রভূত স্বর্ণ ধন আহরণ করিয়া আনিয়া ভারতের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

এইরূপ একটা মস্ত ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কারের পর লেখক মহাশয় আবার কতকগুলি কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি কল্পনায় আর্য্যদিগকে গৃহবিবাদাদির ফলে দলে দলে বিভক্ত করিয়া, কোনও দলকে পশ্চিমাভিমুখে পাঠাইয়া গ্রীক ও রোমানগণের আদিপুরুষ সংগঠন করিয়া লইয়াছেন। তবে যেখানে কোনও অনার্য্য জাতির অস্তিত্ব দেখিতে পান নাই সেই স্থানটা বোধ হয় শূন্যই ছিল; তাই গ্রীক ও রোমানগণের আদিপুরুষগণকে ভারতীয় আর্য্যদিগের ন্যায় অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধবিগ্রহাদি করিতে হয় নাই; নির্ব্বিবাদেই উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। আর যাঁহারা ভারতবর্ষে আসিলেন তাঁহারাই গোলে পড়িয়া গেলেন; তাঁহাদিগকে অসভ্য আদিম নিবাসীদিগের সহিত বহু যুদ্ধবিগ্রহাদি করিতে হইল। জাতিবিভাগ করিতে হইল। আর গ্রীক ও রোমানের আদিপুরুষেরা জাতিবিভাগ না করিয়াই কার্য্যের সুশৃঙ্খলা করিয়া লইলেন। বোধ হয়, যাঁহারা গ্রীসে ও রোমে গিয়াছিলেন তাঁহারা অতিশয় সরল ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সমান রহিলেন আর যাঁহারা ভারতের দিকে আসিয়াছিলেন তাঁহারা (লেখক মহাশয় বলিয়াছেনই ত) অতি কুটিল ও স্বার্থপর ছিলেন। নৈবেদ্যের মণ্ডার মত কৌশলে সর্ব্বোপরি বিরাজমান থাকিয়া গেলেন। যাউক রহস্য, আমরা বলি এরূপ প্রলাপ উক্তির মূল কি? ভারতেই আদিম অধিবাসী ছিল—অন্য দেশে ছিল না (যদি ছিল তাহারা কি হইল?) তাহার প্রমাণ কি? * লেখক মহাশয়ের উর্ব্বর মস্তিষ্কে দেবাসুরের সংগ্রাম, রাম-রাবণের যুদ্ধ ঐ অনার্য্যদিগের সহিত সংঘর্ষেরই নামান্তর। এখন প্রত্যক্ষ শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া যাঁহারা কল্পনাপ্রসূত প্রমাণের বলবত্তা স্বীকার করেন তাঁহাদিগকে আমরা আর কি বলিব! তবে তিনি যে বেদ হইতে দুই একটী মন্ত্র উঠাইয়া এই বিষয় সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস করিয়াছেন, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। ঐ সকল মন্ত্রের তাৎপর্য্য

---

* পাশ্চাত্য জাতিগণ আমেরিকা আবিষ্কারকালে সেখানে কতকগুলি অসভ্য অধিবাসী দেখিয়াছিলেন; কাজেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও তাঁহারা বোধ হয় ঐরূপ কল্পনার সুযোগ পান।

গ্রহণ তিনি আদৌ করিতে পারেন নাই (এবং গ্রহণের অধিকারও তাঁহার নাই) তাহা আমরা দেখাইব। প্রথমে তিনি দুইটী জাতির অস্তিত্ব দেখিতে পাইয়াছেন, আর্য্য ও অনার্য্য। তাহার পর একস্থানে তিনি আর্য্য শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ যাহা জাহির করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অদ্ভুত ব্যাকরণ-জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া হাস্য সম্বরণ করা অসম্ভব। সর্ব্বশাস্ত্রের মূল ব্যাকরণশাস্ত্রেই যাঁহার এরূপ জ্ঞান, তখন বেদাদি শাস্ত্রে ঐ জ্ঞানের কিরূপ পরিণতি হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি বলিয়াছেন "আর্য্য অর্থে যাঁহারা কৃষিকর্ম্ম করিয়া থাকেন।" এরূপ অর্থের মূল কোথায় জানেন? কোনও অভিধানে ইহার মূল পাইবেন না, মূল পাইবেন ব্যাকরণের একটী সূত্রে। সূত্রটী হইল এই—"ঋহলোণ্যঃ"। মহারাজ জুমর নন্দী এই সূত্রের বৃত্তি এইরূপ করিয়াছেন যথা—"ঋদন্তাদ্ধলন্তাচ্চধাতোরুত্তরেণ্যোভবতি।" অর্থাৎ ঋদন্ত ও হলন্ত ধাতুর উত্তর ণ্য (প্রত্যয়) হয়। উদাহরণ ঋদন্ত—কার্য্যং, আর্য্যং। হলন্ত—পক্যং, মার্গ্যং। ইহাই হইল ব্যাকরণশাস্ত্রে আর্য্যপদসিদ্ধির সূত্র। এখন প্রবন্ধলেখক মহাশয়ের মত ব্যক্তিরা "ঋহলোণ্যঃ" এই সূত্রের এক অদ্ভুত নূতন ভাষ্য করিয়া আর্য্যপদ সিদ্ধ করেন। তাঁহারা বলেন—হলকার্য্য বুঝাইলে ঋদন্ত ধাতুর উত্তর ণ্য হয়। ঐ যে সূত্রে হল শব্দটী রহিয়াছে উহা দেখিয়াই হলচালনা ও কৃষিকার্য্য বুঝিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, সূত্রের অর্থ ঐরূপ একেবারেই নয়, বৃত্তিবিরুদ্ধ। ব্যাকরণশাস্ত্রে একেবারে অনভিজ্ঞ না হইলে আর ওরূপ অর্থ মুখ দিয়া বাহির হয় না। লেখক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, এই হলচালনা বিদ্যাটি তাঁহার নিজের অথবা পার করা? অব্যাহত লেখনীচালনা করিবার পূর্ব্বে বাটীর পুরোহিত বা পূজারি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইলে আর এরূপ উপহাসাস্পদ হইতে হইত না। বাস্তবিক আর্য্য শব্দের অর্থ যে ওরূপ নহে তাহা আমরা সমুদয় কোষগ্রন্থ হইতে বুঝিতে পারি—ঋ ধাতুর উত্তর ণ্য প্রত্যয় করিয়া আর্য্য শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ঋ ধাতুর অর্থ—গতি, প্রাপ্তি। কাজেই ঋ ধাতুর দ্বারাও লেখক মহাশয়ের কথিত অর্থ হইতে পারে না। শাস্ত্রে আর্য্য শব্দের অর্থ এরূপ—"কর্ত্তব্যমাচরণ কামমকর্ত্তব্যমনাচরণ। তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে যঃ স আর্য্য ইতি স্মৃতঃ।" অর্থাৎ যিনি কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন ও অকর্ত্তব্য কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকেন এবং প্রকৃত অর্থাৎ সদাচারে রত থাকেন তিনি আর্য্যপদবাচ্য। আর্য্য শব্দের এইরূপ স্পষ্ট অর্থনির্দ্দেশ থাকিলেও কি করিয়া যে তাঁহারা আর্য্য শব্দের

অর্থ কৃষক বুঝেন তাহা তাঁহারাই জানেন। হায় রে! যাঁহাদের তপস্যার জন্য অরণ্যবাসই শ্লাঘ্য এবং অকৃষ্টপচ্য নীবার অর্থাৎ তৃণধান্যই যাঁহাদিগের আহার্য্য, স্বভাবজাত ইঙ্গুদি তৈল ও ঘৃতই যাঁহাদিগের স্নেহপদার্থ (কৃষিজাত তিল সর্ষপজ তৈল নহে), তাঁহারা নিজের। হিংসাপ্রায় কৃষিকার্য্যের জন্য স্বহস্তে হলচালনা করিতেন এবং ঐ কার্য্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া (আচার ও তপস্যাদির জন্য নহে) আর্য্য এই আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে! আমরা মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রে দেখিতে পাই কৃষিকার্য্য হিংসামূলক; এজন্য ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করিবার বিধি আছে এবং আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও কুলীন সদ্গোপ এবং অন্যান্য ভদ্র জাতিগণ স্বহস্তে হলচালনা করেন না। মনু-সংহিতায় আছে—"বৈশ্যবৃত্ত্যাপি জীবংস্তু ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োঽপিবা। হিংসাপ্রায়ং পরাধীনাং কৃষিং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ। কৃষিং সাধ্বিতিমন্যন্তে সাবৃত্তিসদ্বিগর্হিতা। ভূমিং ভূমিশয়াংশ্চৈব হন্তিকাষ্ঠময়োমুখং॥" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ বৃত্তির অভাবে যদি বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করেন তবে হিংসাপ্রায় ও পরাধীন কৃষিকার্য্য যত্নের দ্বারা বর্জ্জন করিবেন। কেহ কেহ কৃষিকে ভাল বলিয়া থাকেন; কিন্তু ঐ কৃষিকার্য্য সাধুদিগের কর্তৃক নিন্দনীয়, যেহেতু অয়োমুখ কাষ্ঠ (অর্থাৎ ফালযুক্ত লাঙ্গল) ভূমি ও ভূমিস্থিত প্রাণিগণকে বিনাশ করিয়া থাকে।

তাহার পর আর একটী ঐতিহাসিক তথ্য তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আর্য্যেরা যখন প্রথম এদেশে আসিয়াছিলেন তখন সত্যযুগ; তখন জাতিবিভাগ হয় নাই। যাঁহাদিগকে শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইত তাঁহাদিগকেই আবার স্বহস্তে হলচালনা করিতে হইত। তাঁহারাই আবার দর্শপৌর্ণমাসাদি যজ্ঞে ব্রতী হইতেন। এইজন্য তাঁহারা আপোষে ত্রিধা বিভক্ত হইলেন। একজাতি হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন জাতির উৎপত্তি হইল। তাহার পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়াদি জাতি ছিল না অর্থাৎ তাহা যুবনাশ্ব, মান্ধাতা হৈহয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজত্বেরও পূর্ব্বকার কথা। তাহা কত দিনের কথা জানেন? তাহা ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার কথা।

এখন দেখা যাউক ঐ প্রকার সিদ্ধান্ত কতদূর বিশ্বাসযোগ্য? কেহ মনে না করেন যে, সত্য ত্রেতা দ্বাপর প্রভৃতি যুগের একটা হিসাব নাই। আমাদের গণিতশাস্ত্রে দণ্ড পল হিসাবে এ সকলের সংখ্যা করা আছে। ভূসৃষ্টির প্রথম

হইতে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি প্রভৃতির উৎপত্তি স্থিতি ও ধ্বংসের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে।

আমরা যে কল্পে জন্মিয়াছি তাহার নাম শ্বেতবরাহকল্প। তাহার পরিমাণ —৪৩২,০০,০০,০০০। ঐ পরিমাণের ১৯৭,২০,৪৯,০১৮ বৎসর গত হইয়াছে। এই পৃথিবী ১৯৫,৫৮,৮৫,০১৮ বৎসর হইল সৃষ্টা হইয়াছেন। ভূসৃষ্টির পর সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ গত হইয়া কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। সত্য যুগের পরিমাণ ১৭,২৮,০০০; ঐ যুগে বৈবস্বত, ইক্ষাকু, বলি, পৃথু, মান্ধাতা, পুরোরবা, ধুন্ধুমার, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজগণ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাহার পর ত্রেতা যুগ, তাহার পরিমাণ ১২৯৬০০০; এই যুগে ককুৎস্থ, ত্রিশঙ্কু, শতঞ্জীব, হরিশ্চন্দ্র, রোহিতাশ্ব, মৃত্যুঞ্জয়, উচ্চাঙ্গদ, মরুত্ত, অনরণ্য, সগর, অংশুমান, দিলীপ, ভগীরথ, অশ্বঞ্জয়, খট্টাঙ্গ, দীর্ঘবাহু, রঘু, অজ, দশরথ, শ্রীরাম, লব ও কুশ প্রভৃতি সূর্য্যবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিয়াছেন। দ্বাপর যুগের পরিমাণ ৮,৬৪,০০০; এই যুগে শাম্ব, বিরাট, হংসধ্বজ, ময়ূরধ্বজ, রুক্মাঙ্গন, শান্তনু, দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠির, বিষকৃসেন, শিশুপাল, জরাসন্ধ, উগ্রসেন, কংস প্রভৃতি রাজগণ রাজত্ব করিয়াছেন। তাহার পর এই বর্ত্তমান কলিযুগ ইহার পরিমাণ ৪,৩২,০০০; তাহার ৫০১৮ অব্দ গত হইয়াছে। ইহাই শাস্ত্রসম্মত হিসাব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাকর কাব্যস্মৃতিমীমাংসাতীর্থ।

আসল উদ্বাহ-তত্ত্ব।

ব্যাপার বিদ্রূপকর খুবই ; কিন্তু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর চলে না। ভদ্রঘরের বৈবাহিক বিড়ম্বনা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কোটাও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

এখন আর হাসি আসে না। হাসি আসিত কতক কাল পূর্ব্বে। তখন পাড়ার এক-আধটা বিবাহে এক-আধটু এদিক-ওদিক দেখিলে লোকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি ও চোক-ঠারাঠারি করিত ; সুতীক্ষ্ণ শ্লেষের সাংঘাতিক মৃদু হাসি হাসিত। সে হাসি বিপথগামী বরকর্ত্তার ও কন্যাকর্ত্তার কলিজায় শক্তিশেল হানিত ; আবশ্যকমতে বর-কন্যারও মর্ম্ম বিদ্ধ করিত।

কিন্তু এখন আর সে সময় নাই। এখন প্রায় সর্ব্বত্রই একই সুরে গান ; একই তালে নৃত্য ; একই রূপ রোগ ; একই রকম কুপথ্য। ব্রাহ্মণের বিবাহেও বণিকের ব্যবস্থা ;—বেশ্যার ঠাট। বৈবাহিক ব্রহ্মচর্য্য, সাহেব বিবির বিলা-সেরও বিংশ যোজন উচ্চে উত্থিত। সর্ব্বত্রই সমান ফর্দ্দ ;—টাকা-আনা-পাই ; —কড়া-ক্রান্তিটীর পর্য্যন্ত কসা-মাজা। পাশের পরিমাণে কৌলীন্য-মর্য্যাদা ;— কুলীনের সে কৌলীন্য কসাইয়ের কারবার !

গহনার সংখ্যা, বরসজ্জার সরঞ্জাম, সোনা রূপার পরিমাণ, বস্ত্রের বহর. বাসনের ঝাঁকা, পোষাক-পরিচ্ছদের মোট, কাটকাটরার ক্যাবিনেট, সার-বন্দী এসেন্সের শিশি, সাবানের বাক্স ও হারমনিয়ম পেয়ানো দেখিয়া বোধ হয় বরের বাপ বৈবাহিক মহাশয় একাধারে একখানি নয়—আটখানি দোকান খুলিবেন—যথা (১) স্যকরার দোকান, (২) ক্যাবিনেটের দোকান, (৩) কাঁসারির দোকান (৪) কাপড়ের দোকান, (৫) মিউজিকের দোকান, (৬) টেলরের দোকান (৭) এসেন্স ও সাবানের দোকান (৮) খেলনার দোকান। এই আটখানি এক ক্ষেত্রে একত্রে খুলা, পাত্রের ও পাত্রের পিতার পরামর্শসিদ্ধ হইয়াছে। ফারমের নাম—

"মাদার এণ্ড সন কোম্পানী"

"ম্যারেজ ডাওয়ারি সপ্"

বিবাহের বাজার করিতে যাইয়া সতত স্মৃতিপথে উদয় হয়—বাঙ্গালী কুলবধূর ব্যবহার্য্য বস্তু কিনিতেছি, না বিলাতী বিলাসিনীর বিলাস-দ্রব্য ক্রয় করি-তেছি ?

বংশজ, শ্রোত্রীয়, কুলীন, অকুলীন, পাত্র মাত্রেই পাশের ও পণের মাত্রায় "পরপাঁও"; লক্কা পায়রা হইতে রাজহংস—অতএব রাজার আসবাব চাই। আর পাত্রমাত্রেই বিলাসের মাত্রায় "লক্ষহীরা।" রাণীর ঠাট চাই; পদ্মীর বেটা পুষ্প-বিলাস "আচার্য্যি ঠাকুরের" বেটার গায়ে বাইজীর পেসওয়াজ! ইহা বঙ্গীয় বিবাহে এখনকার অনিবার্য্য ব্যবস্থা; ইহা আভ্যুদয়িক কুশণ্ডিকা; সম্প্রদান ও সাত পাকের একমাত্র মন্ত্র, ইহা স্ত্রী-আচারের বিশিষ্ট ব্যবহার; ইহা বাঙ্গালীর বাসর ঘরের গুরুভার রক্ষণের অতিমাত্র ব্যবহার্য্য বনিয়াদ! এ মন্ত্র, এ ব্যবহার,—বিবাহের ও বাসরের এ বনিয়াদ, মনু, পরাশর, পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না; রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও নাড়াইতে পারেন না। মনু পরাশর "প্রক্ষিপ্ত";—রঘুনন্দন ঠাকুরের উদ্বাহ-তত্ত্ব ভুল এবং "অবসলিট"। উপরোক্ত আটখানি দোকানই আসল এবং নির্ভুল উদ্বাহ-তত্ত্ব! বল্লাল সেন-প্রদত্ত কৌলীন্য কথার কথা; দেবীবর ঘটকের 'মেলবন্ধন' তাহার গোষ্ঠীর মুণ্ডু। কুলের কর্ত্তা কলিকাতা ইউনিভার্সিটী; মেলের কর্ত্তা একজামিনার; কুলাচার্য্য রেজিষ্ট্রার; কুলচি ও কৌলীন্যের কারিকা, তাহার ক্যালেণ্ডার; কুলের নিদর্শন তস্য স্বাক্ষরযুক্ত সার্টফিকেট।

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুল লক্ষণম্।

কুলীনের এই নবগুণের নির্ঘণ্টন এবং ফুলে, খড়দহ, সর্ব্বানন্দী, বল্লভী আদি ছত্রিশ মেলের থাক বন্ধন হয়, রেজিষ্টারের আফিসে; তাহার প্রচার হয় গভর্ণমেণ্ট গেজেটে। যথাক্রমে এম-এ, বি-এ, ও এফ-এ—ফুলে, খড়দহ, সর্ব্বানন্দী; এনট্রান্স—বল্লভী। ফাষ্ট, সেকেণ্ড, থার্ড ডিবিসন—প্রধান চার মেলের জলুস জাহির করে। এনট্রান্সের নিম্নে যাঁহারা তাহারা ছত্রিশ মেলের "ছোট কুলীন" অর্থাৎ বত্রিশ মেলের বেপেশো ও আদ পেশো বাবু।

কুলীনের নব-লক্ষণও এখন উল্টাইয়া গিয়াছে। সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হয় নাই;—কেবল স্বরূপের "আকুঞ্চন প্রসারণ" হইয়াছে। এখন "আচার" অর্থে অভক্ষ্য ভোজন ও একজামিনে অনর গ্রহণ; "বিনয়"—বেহায়াপনা ও বে-আদপি; "বিদ্যা"—অষ্টরম্ভা যথা—ইংলিস, মেথামেটিক্স, হিষ্ট্রী, ফিলজফী, ফিসিকেল সায়ান্স, সংস্কৃিড়িমিড়ি, জিমিনাসটিক, হায়ার ট্রেনিং ইতি অষ্ট; "কুলীনের প্রতিষ্ঠা" এখন পাস,—পূর্ণ প্রতিষ্ঠা এম-এ, মধ্যপ্রতিষ্ঠা বি-এ ও নিম্ন প্রতিষ্ঠা—এফ-এ; "তীর্থদর্শনম" গ্রেট ইষ্টারণ হোটেলে; "নিষ্ঠা"—

নোংরামি; "বৃত্তি"—বাবুগিরি; "তপ"—উমেদারি; "দান"—বক্তৃতা।

ইহা উদ্বাহ-তত্ত্ব; ইহাই হায় হিন্দুত্ব! ইহাই বঙ্গদেশের উন্নতি, বাবু-বিদ্যার বিরাট গতি!

৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

শক্তিমানের প্রতি।

দরিদ্র দুর্ব্বল বলে কর যদি হেলা
কিবা আসে যায়,
আপনারে লয়ে তুমি থাক সারা বেলা
আপন ইচ্ছায়।
তোমার ও বলবুদ্ধি থাক তব কাছে
—দম্ভ-অভিমান,
করুণার তরে তব কে ছুটিবে পাছে
হ'তে অপমান?
ঐশ্বর্য্যের তেজ দর্প গর্ব্ব অহঙ্কার
তোমাকেই সাজে,
দুঃখী বলে চাইনা ক কণাটুকু তা'র
এতটুকু কাজে।
বিত্ত মোর দরিদ্রতা—অতি গরবের
মান্য করি তা'রে,
দৈন্যকেই করিয়াছি ব্রত জীবনের
মহা সমাদরে।
মনে রেখো তুমি শুধু, চিরদিন তব
রবে না এমন,
টুটে যাবে ধন মান গরিমা বিভব
নিশার স্বপন!
দ্বারে তব আজি যেই দরিদ্র ভিখারী,
কভু দ্বারে তা'র
পার তুমি দাঁড়াইতে করজোড় করি
তরে করুণার।
অশ্রুসিক্ত ব্যথাক্লিষ্ট করুণ চাহনি
দেখে যা দেখ না,
বুকভরা লক্ষ লক্ষ নির্ম্মম কাহিনী
শুনে যা শোন না;—
একদিন হয় ত বা সেই আঁখি জলে
দেবের আসন
টলাবে ডুবাবে বিশ্ব অসীম অতলে
কে জানে কখন?
বিদগ্ধ পঞ্জরভরা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস,
দেবতার প্রাণে
একদা করিতে পারে করুণা বিকাশ,
কবে কে তা জানে?
কোথা তবে যাবে তব ধন মান বল
গর্ব্ব অহঙ্কার
বিনিময়ে এক বিন্দু তুচ্ছ অশ্রুজল
কৃপা হ'লে তাঁ'র।
দরিদ্রের দীর্ঘশ্বাস নহে উপেক্ষার
নহে অকারণ,
শক্তিতে পার কি কভু এতটুকু তার
রোধিতে কখন?
বশীভূত করিতে সে মৃগশিশুটীরে
লৌহশক্তিবলে,
পারিবে কি কোন দিন শত চেষ্টা করে
প্রেম নাহি দিলে?
ফোটাতে পার কি কলি সহস্র চেষ্টায়
না হ'লে মলয়,
শক্তিতে কখন কেহ পে'রেছ কি তা'য়
সোহাগে যা হয়?

শ্রীঅবনীকুমার দে।

হ'ল না। *

নাম শুনিয়া আপনারা চমকিয়া উঠিবেন না; অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। আর মনে মনে জপ করুন, "সবুরে মেওয়া ফলে।"

আমার এ 'হ'ল না', অনুতপ্ত সাধকের 'গেল না গেল না বিষয়-বাসনা, হ'ল না হ'ল না তারা-উপাসনা'র হ'ল নাও নহে, আর হতাশ-প্রেমিকার 'নিমেষের তরে সরমে বাধিল, বলি বলি বলা হ'ল না'র হ'ল নাও নহে। আমার 'হ'ল না' 'আস্ক'র 'ওহোর্ র শুধু র'এর মত শুধু 'হ'ল না'; যথা, 'রাম-রাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব', অথবা শাদা কথায় 'তোমারই তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে।' তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমার কিছু হ'ল না।

বাল্যকালে পিতৃদেবের তাড়নায় পাঠশালায় গেলাম। কিন্তু সেখানে গিয়া ভাগ্যবান্ ছাত্রদের সাধারণতঃ যাহা হইয়া থাকে, আমার তাহার কিছুই হইল না। না পারিলাম ভাল করিয়া তামাক সাজিয়া প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য (অর্থাৎ মুখরন্ধ্রের নিঃশ্বাস এবং প্রশ্বাস) উভয়বিধ উপায়েই কলিকার নিম্নদেশ দিয়া ধূম বাহির করতঃ গুরুমহাশয়ের মনোরঞ্জন করিতে, না শিখিলাম কলহ-কালে দুষ্টা বাগদেবীকে রসনাগ্রে স্থাপন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের তর্পণ করিতে। গুরুমহাশয় যখন গঞ্জিকাদেবীর মহিমায় চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া "হারামের হাড় বেটারা সব, বেরো আমার পাঠশাল থেকে," এই বলিয়া নিরীহ (?) ছাত্রবৃন্দকে শাসাইতেন, তখন আমার মনে হইত, ইহারা সব (অর্থাৎ শির-পড়ুয়ারা) এমন বোকা যে, গুরুমহাশয় ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিতেছেন, তথাপি ইহারা বসিয়া রহিয়াছে, আমি হইলে এতক্ষণ কোন কালে পাত্তাড়ী গুটাইয়া লইয়া চম্পট দিতাম। কিন্তু হায়! হত-ভাগ্যের অদৃষ্টে সে সুখ ঘটিল না। শির-পড়ুয়ার পদে উন্নীত হইবার পূর্ব্বেই একদিন শুনিলাম যে পাঠশালাটি উঠিয়া গেল। অগত্যা আমার (দারুণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও) স্কুলে প্রোমোশন হইল।

স্কুলে আমার দুর্গতির কথা শুনিলে শিয়াল কুকুরও কাঁদিয়া ফেলিবে; আপনারা ত কাঁদিবেনই, যেহেতু আপনারা সকলেই হৃদয়বান্ মনুষ্য। কিন্তু আজিকার এই সান্ধ্য-সম্মিলনে আপনারা হাসিবার জন্যই আসিয়াছেন, কাঁদি-বার জন্য আসেন নাই; অতএব আমার দুর্গতির কথা শুনিয়াই আর আপনা-

---

* রজনীকান্ত গুপ্ত স্মৃতি-পাঠাগারে সান্ধ্য অধিবেশনে পঠিত। ১০ই কার্ত্তিক, ১৩২৫।

দিগকে কাঁদাইতে ইচ্ছা করি না। (তবে যদি আপনাদের মধ্যে এরূপ ভাবুক এবং সমবেদনাশীল কেহ থাকেন, যিনি আমার দুর্গতির বিবরণ না শুনিয়াও শুধু উল্লেখমাত্র শুনিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিবেন,—যেমন গোল্ড স্মিথের She Stoops to Conquer প্রহসনে ভৃত্য ডিগরী (Diggory) প্রভুর মুখে 'Old Grouse in the Gunroom'এর গল্প শুনিবার ভয়েই (!) হিঃ হিঃ করিয়া হাসিয়া উঠিত ('কা কথা বাণসন্ধানে জ্যাশব্দেনৈব দূরতঃ' ইত্যাদি স্মর্ত্তব্য), অথবা যেমন ভক্তচূড়ামণি বৈষ্ণব বার দুই তিন "এই মাটিতে—" বলিয়াই দশাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—তাহা হইলে আমি নাচার।) তবে যখন কথাটার অবতারণা করিয়াছি, তখন একেবারে চুপ করিয়া যাওয়াও ভাল দেখায় না। অতএব ঠারে-ঠোরে একটু আধটু বলিয়াই ক্ষান্ত হইব।

স্কুলে প্রবেশ করিয়া আমার জীবন কি ভাবে কাটিতে লাগিল, তাহা যাঁহারা বিলাতে স্কুলের ছেলেদের ব্যবহারিক রসিকতার (practical jokes and pranks) কথা অবগত আছেন, তাঁহারাই কতকটা অনুমান করিতে পারিবেন। অবশ্য আমাকে কোনও দিন কেহ কম্বলে বসাইয়া "এক—দুই—তিন' বলিয়া ছাদের কড়ির দিকে উৎক্ষিপ্ত করে নাই বটে (ড্রাইডেনের 'in epsom blankets tost' স্মর্ত্তব্য), কিন্তু পাছে কোন দিন ভ্রমক্রমে পড়া তৈয়ারী করিয়া স্কুলে গিয়া সহপাঠিদের কর্ণমর্দ্দন করিবার নিমিত্ত শিক্ষক মহাশয় কর্ত্তৃক আদিষ্ট হই, এই ভয়ে আমার সহপাঠিগণ (তাঁহারা সকলেই আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন) পূর্ব্ব হইতেই আমাকে নরম ও গরম উভয়বিধ মন্ত্রে জপাইয়া তালিম করিতেন। (কেন না, Prevention in better than cnre)। অর্থাৎ কখনও বা খেজুর গাছ হইতে রস পাড়িয়া খাওয়াইতেন, কখনও বা হাতে ধরিয়া জলে সাঁতার দিতে, ছিপে মাছ ধরিতে অথবা বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিতে শিখাইতেন, আবার কখনও বা (তাঁহাদের পরামর্শমত চলিতে না পারিলে) সুমিষ্ট রামচিমটি দিতেন অথবা ভূপৃষ্ঠে নাসিকা ঘর্ষণ করাইতেন। তখন মাঝে মাঝে মনে হইত, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ম্লেচ্ছভাষা শিক্ষা করিতে আসিয়াছি, ইহা কি তাহারই প্রায়শ্চিত্ত? কিন্তু হায়! এত নিগ্রহানুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াও যখন তাঁহারা আমাকে সর্ব্ববিষয়েই তাঁহাদের যোগ্য (square) চেলা করিয়া তুলিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা হতাশ হইয়া বলিলেন, "নাঃ, ছোঁড়াটার কিছু হল না; ভগবানের কাছে গিয়ে কি জবাব দেবে, তা'ত ভেবে পাই না।" আমিও বুঝিলাম, "নাঃ, আমার কিছু হ'ল

না।" আরও ভাবিলাম, আমার বরাত, আর তাঁহাদের হাতযশ, এ দুইটাই খারাপ। ('দিবাকরের কিরণ স্ফটিকমণিতে যেরূপ প্রতিফলিত হয়, মৃৎপিণ্ডে কি সেরূপ প্রতিফলিত হইতে পারে?' ইত্যাদি স্মর্ত্তব্য।)

যাহা হউক, যখন সর্ব্বগুণাকর সহপাঠিগণের শিষ্যত্বপদেরও অনুপযোগী বিবেচিত হইয়া ভগ্নপ্রাণে ভারাক্রান্তহৃদয়ে নবজীবনলাভের নূতন পন্থার আবিষ্কারে ব্যাপৃত ছিলাম, তখন হঠাৎ কুক্ষণে একদিন শুনিলাম, আমি মাতৃকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পিতৃকুলের (তথা মাতৃকুলেরও) মুখ উজ্জ্বল করিয়াছি। (দুষ্ট লোকে বলিতে লাগিল, মাতৃকুলেশন তাই তরিয়া গেল, সেকালের প্রবেশিকা হইলে বাছাধনকে আর পাশ করিতে হইত না!) এ সংবাদ ঠিক বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতই আমার উপর আসিয়া পড়িল। হায়! সে কি ভীষণ দিন! কোথায় অধিবাস না কোথায় বনবাস!

পিতৃদেব বলিলেন, মা সরস্বতীর কৃপায় ছেলের যখন একটা পাশ হইয়াছে, তখন তাহাকে কালেজে পড়ানর দরকার। বাড়ীর এবং পাড়ার সকলেই সেই মতে মত দিল। আমার কলেজে পড়া হইবে শুনিয়া স্নেহময়ী জননী আমার সমস্ত দিন ধরিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন। সেদিন তাঁহার মাতৃহৃদয় সন্তানগর্ব্বে কতই না স্ফীত হইয়াছিল! কিন্তু তাঁহার অধম সন্তান নির্ব্বাসনদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কিরূপ কষ্টে দিনযাপন করিতে লাগিল, তাহা যদি তিনি একবার ভাবিয়া দেখিতেন!

ক্রমে দিন ফুরাইয়া আসিল। যথাসময়ে কলিকাতায় আসিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইলাম, এবং ছাত্রাবাসে আশ্রয় লইলাম। নূতন জায়গায় আসিয়া প্রথম প্রথম দিন কয়েক একটু কষ্ট, একটু অসুবিধা হইয়াছিল বটে, কিন্তু একমাস অতীত হইতে না হইতেই আমার সকল সঙ্কোচ, সব নিরানন্দ সূর্য্যোদয়ে অন্ধকাররাশির ন্যায়, অথবা বায়ুপ্রবাহে মেঘরাশির ন্যায় কোথায় তিরোহিত হইয়া গেল। দেখিলাম সে এক নূতন স্বর্গরাজ্য। সেখানে পিতার তাড়নায় নিত্য কোশাকুশি লইয়া ত্রিসন্ধ্যা করিতে হয় না, খাওয়া-দাওয়ার বাছ-বিচার করিতে হয় না, শৌচকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ভাল করিয়া হাত পা ধুইতে ও গাড়ু মাজিতে হয় না, বয়ঃকনিষ্ঠ হইয়াও বয়োজ্যেষ্ঠের নিকট মাথা নোয়াইতে বা রসনা সংযত করিতে হয় না, কোন বিষয়েই কোন প্রকার সঙ্কোচ করিতে হয় না; এক কথায়, 'সেথা নাইক মৃত্যু, নাইক জরা'। সর্ব্বদাই যেন একটা নবজীবনের স্রোতঃ 'ঊষার হিল্লোলে নাচিয়া নাচিয়া' ছুটিয়া চলিয়াছে। আমি

সেই হিল্লোলস্পর্শে মুগ্ধ হইলাম; সেই 'নূতন প্রাণতা'র স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলাম। তেল মাখা ছাড়িয়া দিয়া সাবান মাখিতে আরম্ভ করিলাম; আধ আনা—সাড়ে পনের আনা করিয়া চুল কাটিলাম; চোখে চশমা আঁটিলাম; ছাতাটা এক দরিদ্র সহপাঠীকে দান করিয়া একগাছি ছড়ি কিনিলাম; কৌটা কৌটা নস্য ও বাক্স বাক্স সিগারেট আমদানি করিলাম; হার্ম্মোনিয়ম কিনিয়া গলা সাধিতে লাগিলাম; সোনার জলে বাঁধান খাতা কিনিয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলাম; গড়ের মাঠে ও ইডেন কাননে সান্ধ্যভ্রমণ করিতে এবং ফুট বল খেলা দেখিতে লাগিলাম; রাত্রিতে আহারের পর সকলে একত্র বসিয়া রবিবাবু ও ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বিবেকানন্দ ও কেশব সেন, সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র, ইহাদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট; ললিতবাবু ভাল পড়ান কি জানকীবাবু ভাল পড়ান, ইত্যাদি কত বিষয়ের চর্চ্চা করিতে লাগিলাম; বেলগেছিয়ায় ও ঘুঘুডাঙ্গায় গার্ডেন পার্টিতে যাইতে লাগিলাম; চায়ের দোকানে দোকানে ঢুকিয়া চা-কেক খাইতে ও বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলাম; * মনটাকে সতেজ ও প্রফুল্ল রাখিবার জন্য ঘন ঘন থিয়েটার ও বায়স্কোপ দেখিতে লাগিলাম এবং পরমেশ্বরের সৃষ্টি-বিশেষের সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণের নিমিত্ত মেসের ছাদে উঠিয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্রের বহুল প্রয়োগ আরম্ভ করিলাম।

কিন্তু হায়! এত কাণ্ড করিয়াও আমার কিছুই হইল না—আমি যে তিমিরে সে তিমিরেই রহিয়া গেলাম। সত্যই বটে, 'Man proposes, God disposes.' মনে মনে কত আশা করিয়াছিলাম; হয় একটা মস্ত কবি আর না হয় একজন বড় গায়ক হইব; আর আমার কবিতা পাঠ করিয়া অথবা সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া 'অনাকাশে কোঽয়ং গলিতহরিণঃ শীতকিরণং' গোছের কোন এক অপরূপ সুন্দরী মুগ্ধ হইয়া আপনা ভুলিয়া একদিন শুভমুহূর্ত্তে ছোট্ট একখানি রঙ্গীন খামে মোড়া সুবাসিত রঙ্গীন কাগজে বাঁকা বাঁকা অক্ষরে তাহার ফুটন্ত হৃদয়কুসুম আমার চরণতলে ডালি দিবে। এই আশায় উৎসাহিত হইয়া আর সব প্রায় ছাড়িয়া দিয়া কবিতা এবং গান লইয়াই পড়িলাম। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।'

---

* এ চায়ের দোকানগুলি কি মদ্যপায়ী শ্রমজীবিগণকে 'জীবনের পথে' আনিবার জন্য ললিতকুমারের ন্যায় মহাপ্রাণ মহাত্মাদিগের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত?—ইতি টিপ্পনীকার।

আপনারা বোধ হয় সকলেই জানেন যে, কোন কোন ফল অকালে পক্ক হয় (চলিত কথায় যাহাকে বলে 'এঁচোড়ে পাকা') অথচ সময়ে পাকিলে যেমন মিষ্ট হইত তেমন না হইয়া একটু বিস্বাদ হয়। আমারও ঠিক তাহাই হইল। ললিতকলা-সাধনের পথে অল্প দূর অগ্রসর হইয়াই দেখিলাম, যদিও আমার কবি বা গায়ক হইবার তখনও অনেক বিলম্ব আছে; তথাপি ভগবান পুষ্পধন্বা আমাকে ছাড়িয়া কথা কহিতেছেন না। বসন্তের স্নিগ্ধ মলয়সমীর-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারিলাম আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন কি একটা ওলট-পালট হইয়া গেল! ঘন ঘন রোমাঞ্চ হইতে লাগিল! বুকের ভিতর ঢেঁকি পাড়িতে লাগিল! আমি আর যেন সে আমি রহিলাম না। (সকলে বলিল, ওটা বয়সের দোষ।) তখন শুক্‌নো ডালে ফুল ফুটিল! মরা গাঙ্গে বান ডাকিল! যেন শ্যামের বাঁশরী-রবে যমুনা উজান বহিল! আমার হৃদয় আমাকে ছাড়াইয়া উথলিয়া উঠিতে লাগিল! তাহাকে ধরিয়া রাখা দায় হইল। সদাই যেন প্রাণের ভিতর কি একটা অভাব অনুভব করিতে লাগিলাম। মনে করিলাম, এ আবার কি এক নূতন জ্বালা!

আমাকে নিশ্চিতই কোন এক কঠিন রোগে আক্রমণ করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া আমারই সপ্রকোষ্ঠবাসী ('room-mate') জনৈক আয়ুর্ব্বেদাধ্যায়ীর সহিত পরামর্শ করিলাম। তিনি কিয়ৎক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করিয়া শরীরস্থ বায়ু-পিত্ত-কফের সমাবেশ সম্বন্ধে কতকগুলি সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করতঃ পরিশেষে বলিলেন যে, আমার এ রোগ বোধ হয় শারীরিক নহে, মানসিক; এ বয়সে লক্ষ্মীছাড়া হইয়া থাকিলে এরূপই হইবার কথা। যাহাদের জীবনের কোন একটা স্থির লক্ষ্য নাই, তাহারা কখনও সুখী হইতে পারে না; ভার-কেন্দ্র (Centre of gravity) ঠিক না থাকিলে মানুষকে পতন হইতে রক্ষা করিবে কে? ইত্যাদি দার্শনিক তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিয়া পরিশেষে পরামর্শ দিলেন যে, আমার জীবনে অচিরেই একজন সঙ্গিনীর প্রয়োজন, যে আমার জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া আমাকে সুখের পথ, আনন্দের পথ দেখাইয়া দিবে। আমিও দেখিলাম, এ যুক্তি মন্দ নয়। এতদিন কবিতা লিখিতে-ছিলাম বটে, কিন্তু তাহা গজভুক্তকপিত্থবৎ শূন্যগর্ভ; চক্ষুর সম্মুখে কোনও নির্দ্দিষ্ট আদর্শ না থাকাতে আশে পাশে ঘুরিয়াই বেড়াইতেছিলাম (beating about the bush)। কিন্তু কোন এক সুন্দরীকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পাইলে আমার সব ঠিক হইবে, তাহাকেই প্রেম-সৌন্দর্য্যের জীবন্ত আদর্শ করিয়া

কবিতা লিখিয়া ধন্য হইব। তখন ছিন্ন তার যোড়া লাগিবে ; বেসুরা বীণায় সাধা সুর বাহির হইবে ; জীবন সার্থক হইবে। অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন কি ?

সম্মুখেই গুড্‌ফ্রাইডের ছুটী ছিল। ছুটীতে বাড়ী গিয়া প্রকারান্তরে কথাটা গর্ভধারিণীর কাণে তুলিয়া দিলাম। যথাসময়ে উহা পিতৃদেবের কর্ণেও উঠিল। কিন্তু হায়! নিষ্ঠুর পিতা আমার যে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, তাহাতে আমার হাড় হিম হইয়া গেল, শরীরের রক্ত জল হইয়া গেল। পিতা বলিলেন, বি-এ পাশ না করিলে আমার বিবাহ দিবেন না। যদি সেই মুহূর্ত্তে কক্ষমধ্যে বজ্রপতন হইত, তাহা হইলেও বোধ হয় আমি অধিকতর চমকিত হইতাম না।

ছুটী ফুরাইল ; আমিও ক্ষুণ্নমনে, শূন্যপ্রাণে নিজের পিতৃহীনত্ব কামনা করিতে করিতে কলিকাতায় আসিলাম। বিবাহের লোভে একটু আধটু পড়াশুনা আরম্ভ করিলাম। যোগে যাগে ইণ্টারমিডিয়েটটা পাশ করিলাম। (দুষ্ট লোকে এবারও টিপ্পনী কাটিতে ছাড়িল না যে, ইণ্টারমিডিয়েটে কিছুই নাই, সেকালের এফ-এ হইলে আমি কিছুতেই পাশ করিতে পারিতাম না।)

পরীক্ষা দিয়া দিনকতক কবিতার এবং সৌন্দর্য্যের চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলাম ; কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির হইলে আবার বি-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হইতে হইল। এবার কিন্তু পাঠ্যবিষয়-নির্ব্বাচনে বড় গোলযোগে পড়িতে হইল। গণিত ও বিজ্ঞানে কোন কালে মাথা ছিল না—ইণ্টারমিডিয়েট হইতেই এগুলি ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। ইতিহাস লইলে অনেক পড়িতে হইবে, তাহাতে কবিতা লেখার অবসর পাওয়া যাইবে না ; সুতরাং ইতিহাস লইলাম না। আর পিতৃদেব বলিয়াছিলেন যে, ইউরোপের দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিলে লোকে নাস্তিক হইয়া যায়। ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়া নাস্তিক হইব কি প্রকারে ? অতএব ফিলসফিও লওয়া হইল না। অগত্যা সংস্কৃত এবং অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি লইলাম। কিন্তু এ দুইটি বিষয়ের কোনটিই পড়িয়া সুখ পাইলাম না।

সংস্কৃত ভাষায় শ্রেষ্ঠ কাব্য 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব' ও 'মেঘদূত'। কিন্তু এই তিনখানি কাব্যই পাঠ করিতে গিয়া বিষম ধাক্কা খাইলাম। 'রঘুবংশে'র প্রথম শ্লোকেই কবি বাক্ (অর্থাৎ বাগ্মিতা), অর্থ এবং প্রতিপত্তি—এই ত্রিবর্গলাভের জন্য পার্ব্বতী পরমেশ্বরের বন্দনা করিয়াছেন। শ্লোকটি পাঠ করিয়া আমি হতাশ হইলাম। আমি এ তিনটির কিছুই চাই না ; আমি চাই প্রেম ও

সৌন্দর্য্য। সুতরাং 'রঘুবংশ' পাঠ পরিত্যাগ করিতে হইল। 'কুমারসম্ভবে'র প্রথমেই অনন্তরত্নপ্রভব হিমালয়ের বর্ণনা। যাহার অলৌকিক মহিমার নিকট ভক্তিতে মস্তক অবনত হইয়া পড়ে, তাহার বর্ণনায় যে গ্রন্থের আরম্ভ, তাহাতে প্রেম-সৌন্দর্য্যের আশা করা বাতুলতা মাত্র; ইহা বুঝিয়া 'কুমারসম্ভব'-পাঠও পরিত্যাগ করিলাম। হিমালয়-বর্ণনার পরিবর্ত্তে যদি কৃত্রিম অথচ নয়নরঞ্জন উদ্যানের মধ্যস্থিত কৃত্রিম উৎসে শোভিত কৃত্রিম শৈলের বর্ণনা থাকিত, তাহা হইলে বরং চেষ্টা করিয়া দেখা যাইত। 'মেঘদূতে'র প্রথম শ্লোকেই দারুণ মর্ম্মভেদী বিরহের কথা। আমি চাই মিলন; অতএব 'মেঘদূত'-পাঠেও আমার প্রবৃত্তি হইল না।

সংস্কৃত নাটকের মধ্যে 'শকুন্তলা' এবং 'উত্তররামচরিত' শ্রেষ্ঠ। কিন্তু উক্ত নাটকদ্বয়ের কোনখানিই আমার পাঠোপযোগী নহে। কেন না, প্রথম-খানির প্রতিপাদ্য বিষয় দুর্ব্বাসার ভীষণ অভিশাপ এবং দ্বিতীয়খানির বর্ণনীয় বিষয় সীতার বনবাস। উভয়ত্রই বিরহের পূর্ণ প্রভাব বিরাজমান। অতএব এ দুইখানির কথা না তোলাই ভাল।

সংস্কৃত পড়া ত এইখানেই শেষ হইল। মনে করিলাম, পাঠ্যপুস্তক নাই বা পড়িলাম। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপায় সংস্কৃত হইতে ইংরেজীতে তর্জ্জমা করিয়াই পাশের নম্বর রাখিব। রাষ্ট্রনীতি ভাল করিয়া পড়িতে পারিলাম না; —ভয় হইল, পাছে উহার প্রভাবে রাজনীতিক আন্দোলনে মাতিয়া 'অন্তরীণ' হইয়া জীবনের সকল আশায় জলাঞ্জলি দিতে হয়।

বলা বাহুল্য, সেবার পরীক্ষায় ফেল করিলাম। পিতৃদেবের তাড়নায় আর একবার চেষ্টা করিতে হইল। সেবার পরীক্ষা দিলে হয় ত তর্জ্জমার জোরে পাশ করিতে পারিতাম; কিন্তু সেবার পরীক্ষা দেওয়াই হইল না। পরীক্ষার প্রথম দিনটাই ত্র্যহস্পর্শ ছিল। ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়া ত্র্যহস্পর্শের দিন পরীক্ষা মন্দিরে শুভযাত্রা কি করিয়া করি? তখন বেকুব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অজস্র অভিসম্পাতরাশি বর্ষণ করিয়া হার্ম্মোনিয়াম লইয়া গান ধরিলাম—

'সাধ না মিটিল		আশা না পূরিল,
সকলি ফুরা'য়ে যায় মা।'

দুই দুইবার চেষ্টা করিয়াও গ্র্যাজুয়েট হইতে পারিলাম না; অথচ পিতার নিকট হইতে মাসে মাসে পুঁটি মাছের মত সাদা ধবধবে টাকাগুলি আদায় করিতেছি; ইহাতে পিতা সাতিশয় বিরক্ত হইয়া আমার খরচ বন্ধ করিয়া দিলেন। আমিও মা সরস্বতীর নিকট জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

কিন্তু হায়! আমার একুল ওকুল দু'কুলই গেল। আমি গ্র্যাজুয়েটও হইতে পারিলাম না; কবিও হইতে পারিলাম না। গ্র্যাজুয়েট হওয়ার চেয়ে কবি হওয়া সহজ ইহা বুঝিয়া আমি সেই পথই অবলম্বন করিয়াছিলাম। কিন্তু পিতা আমার সে সাধে বাদ সাধিলেন! কবি হইতে পারিলে হয় ত একদিন

আমার মানস-প্রতিমা সাকারা হইয়া আমার কবিতার ফাঁদে ধরা দিত; কিন্তু এখন আর সে আশা নাই। অ-কবি অ-গায়ক অকালকুষ্মাণ্ড নট্-কিচ্ছু অণ্ডার-গ্র্যাজুয়েটকে কোন্ ভাগ্যহীনা সুন্দরী ললনা ভালবাসিয়া তাহার কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করিবে? (এ ক্ষেত্রে সত্য কথাটা বলিয়া রাখাই ভাল, শ্রীমানের চেহারাটাও তাদৃশ খাপসুরত গোছের ছিল না।)

আমার পিতাই যত অনর্থের মূল; সুতরাং তাঁহার উপর অভিমান ও রাগ করিয়া, তাঁহার সহিত আমার আর কোনও সম্পর্ক নাই—এই মর্ম্মে তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিলাম। (সাধু ভাষায় তাহাকে ত্যজ্য পিতা করিলাম।) তাহার পর দুর্গা নাম স্মরণ করিরা ভাগ্য পরীক্ষা করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম।

মানুষের যখন আর কিছু থাকে না, তখনও আশা থাকে। সেই আশা এই বিষাদের দিনেও আমার ভঙ্গোন্মুখ হৃদয়কে ধরিয়া রাখিল। যদিও বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, জীবন আমার কিছুই হইল না, তথাপি কান্ত কবির সেই আশার বাণী—"কেহ নাই যার তুমি আছ তার"—ঘন ঘন আমার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতে লাগিল। আমি আর একটা নূতন কিছু করিবার চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হইলাম।

অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম, আমার মত হতভাগ্যের সম্মুখে কেবল একমাত্র পথ খোলা আছে—তাহা সাহিত্য-সাধনা। আমি দিব্য-দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলাম, এ জগতে আমার আর কেহ না থাকিলেও সে আছে। কবি হইবার সাধ সকলের পূর্ণ হয় না। আমারও কবিতার উৎস শুকাইয়া গিয়াছিল। অতএব সাহিত্যচর্চ্চাই সমীচীন মনে করিয়া সেই পথই অবলম্বন করিয়াছি। স্কুল-মাষ্টারিকে লোকে যেমন 'Paradise of the incapable' বলে, সাহিত্যের নন্দনকাননকেও সেইরূপ Paradise of the unfortunate বলিয়া মনে হইল। এখানে সকলেরই সমান অধিকার। এখানে উচ্চ ও নীচ, সুন্দর ও কুৎসিত, কুলীন ও অকুলীন, পণ্ডিত ও মূর্খ, সকলেই সমান উৎসাহে অগ্রসর হইতে পারে. কাহারও 'প্রবেশ নিষেধ' নাই; সকলেই সমান ফললাভ করিতে পারে, কাহাকেও হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হয় না। এমন সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব (universal brotherhood) আর কোথাও আছে কি?

তাই আমি জীবনের সেই মহা অধঃপতন, মহা পরিবর্ত্তনের দিনে এই পথকেই সার ভাবিয়া অবলম্বন করিয়াছি। আর এখানে যদি আমার ন্যায় হতভাগ্য ভগ্নহৃদয় কেহ থাকেন, যাঁহাকে "আমার কিছু হ'ল না" বলিয়া আক্ষেপ করিতে হইতেছে, তাহার প্রতি আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, তিনি যেন অবিলম্বে সাহিত্য-চর্চ্চার নন্দন-কাননে প্রবেশ করিয়া সব শোক-দুঃখ, সব জ্বালাযন্ত্রণা ভুলিবার চেষ্টা করেন। এত মধু মধুচক্রে নাই, এত সুধা ক্ষীরোদ-সাগরেও নাই।

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ।

PRINTED AND Published BY S. C. PALIT,
At KARUNA PRESS,
53, Baranashi Ghosh Street, Calcutta.

'অর্ঘ্যে'র নিয়মাবলী।

'অর্ঘ্যে'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহর ও মফস্বল সর্ব্বত্র বার আনা। ভিঃ পিঃতে লইলে ইহার উপর এক আনা অতিরিক্ত কমিশন লাগে।

'অর্ঘ্যে'র জন্য প্রবন্ধ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দিবার নিয়ম নাই। লেখকেরা নকল রাখিয়া প্রবন্ধ পাঠাইবেন।

টাকা-কড়ি, প্রবন্ধ, বিনিময়ের কাগজ এবং চিঠিপত্র নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নামে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন,

অর্ঘ্য-কার্য্যালয়,

৫৩ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অগ্রহায়ণ ১৩২৫] [December, 1918.

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন শ্রীসুরেশচন্দ্র পালিত, বি-এল্

কার্য্যালয়—৫৩ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমেরিকায় আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক ক্ষমতায় প্রস্তুত।

মেহ, প্রমেহ প্রদর, বাধক, অজীর্ণ, অম্ল, পুরুষত্বহানি, ধাতুদৌর্ব্বল্য, বহুমূত্র, অর্শ, বাত, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি ব্যাধি মন্ত্রের ন্যায় আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা, মাশুলাদি ।৵০ আনা।

বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সালসা।

সাধারণতঃ ইহা রক্তপরিষ্কারক, বিশুদ্ধ রক্ত-উৎপাদক, পারদ এবং উপদংশ বিনাশক, বলকারক, আয়ুর্বর্দ্ধক সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ ও রক্তদুষ্টজনিত বাত প্রভৃতি নানাপ্রকার জটিল রোগ এবং পুরাতন মেহ, প্রমেহ, প্রদর প্রভৃতি দূর করিতে ইহা অদ্বিতীয়। সুস্থ শরীরে ইহা ব্যবহার করিলে শরীরের স্ফূর্ত্তি এবং মুখের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ১৷০ টাকা, মাশুলাদি ।৵০ আনা।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি ডি হাজরা,

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

অর্ঘ্য,

১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

কুমারব্রত।

(১)

বৃদ্ধ উমাপতি মুখুয্যে সেকালের লোক। নানা বিষয়ে তাঁহার মতের সহিত আজকালকার নব্য সমাজের মার্জ্জিত রুচির খাপ খায় না। উপরি রোজগারের তিনি অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। ঢেউ গণিয়া, আকাশে ফাঁদ পাতিয়া, দস্তুরি আদায় করিয়া, হাজা মজা সুকতি ঘাটতি প্রভৃতি নানা উপায়ে কিরূপে উপরি রোজগার করিতে হয় তাহা তিনি উত্তমরূপ অবগত ছিলেন। তাঁহার পৌত্র সতীপতি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তির অধিকারী হইলে তিনি তাহাকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভায়া, কালেজের পড়ায় মাসে কুড়ি টাকা জলপানি ছাড়া উপরি লাভ কত আছে?" ইহার উত্তরে সতীপতি হাসিতে লাগিল। উমাপতি মুখুজ্যে মনে করিলেন যে, উপরির কথা সে প্রকাশ করিতে চাহে না। শেষে যখন সতীপতি দেখিল যে, ঠাকুরদাদা নেহাত না-ছোড় হইয়াছেন, তখন সে বলিল যে কালেজের পড়ায় জলপানি ছাড়া কোন উপরি নাই। বৃদ্ধ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "সে কি? উপরি ছাড়া কোন মাসিক বন্দবস্ত ত হয় না। কর্ত্তাদের আমলে আট দশ টাকা মাহিনায় জমিদারের নায়েব গোমস্তারা উপরি রোজগার হইতে দোল-দুর্গোৎসব করিত। উপরি রোজগার বাঙ্গালীর পৈত্রিক ব্যবস্থা! সরকার বাহাদুর দেখছি এখন অনেক কার্য্যেই উপরির রাস্তা বন্ধ করছেন। মুনসেফদিগের যখন মাসিক দুই শত টাকা মাহিনা ধার্য্য হইয়াছিল তখন শুনা যায় দেওয়ানি আদালতের দেয়ালে বড় বড় অক্ষরে এই মর্ম্মে ইস্তাহার জারি হয়,—

"যেহেতু সরকার বাহাদুর মনসফদিগের মাসিক ২০০৲ তঙ্কা মাসহরা ধার্য্য করিয়াছেন সেহেতু অদ্য পক্ষ হইতে অতঃপর ঘুষ লওয়া হইবে না।"

সতীপতি বলিল, উপরির দিন চলিয়া গিয়াছে। উমাপতি মুখুয্যে এবার

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, বি-এ পাশ কর, তার পর দেখবে আজকাল কুলীনের ছেলে উদ্বাহ কার্য্যে কত বেশি উপরি রোজগার করে।" কথাটা সতীপতির ভাল লাগিল না সে স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

উমাপতি মুখুয্যের পিতা রমাপতি মুখুয্যে বিবাহে উপরি লাভের অত্যন্ত সুবিধা দেখিয়া ছেলে ও নাতিদের নামের শেষে "পতি"—এই শব্দ জুড়িয়া দিয়া বিখ্যাত "পতি বংশের" স্থাপনা করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার ভাবনা হইল যে, উপরি লাভে বংশ যত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে বাঙ্গালা ভাষায় পত্যন্ত শব্দ তত কমিয়া যাইবে। সেই জন্য তিনি বাঙ্গালা ভাষার জন্মদাতাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া একখানা প্রকাণ্ড নামের তালিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সেই তালিকায় বার, সন, উপ, অপ প্রভৃতি উপসর্গের যোগে অনেকগুলি পত্যন্ত নামবাচক শব্দ এবং বাচস্পতি, বৃহস্পতি, সমাজপতি, যূথপতি, দিথাপতি প্রভৃতি অনেকগুলি উদ্ভট নাম সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল।

(২)

সতীপতি এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল বটে, কিন্তু জলপানি পাইল না। উমাপতি মুখুয্যে তাহাতে বিশেষ দুঃখিত হইলেন না। তিনি সতীপতিকে বলিলেন, "ভয়., এইবার "বিয়ে" পাশ,—বি-এ নয় "বিয়ে"। আহা! বিশ্ববিদ্যালয় কি চমৎকার সৃষ্টি করিয়াছেন,—একাধারে উপাধি, বিবাহ ও উপরি!" সতীপতি পিতামহের কথা শুনিয়া মনে মনে অত্যন্ত চটিয়া গেল। সে কলিকাতায় বি-এ পড়িতে আসিয়া বিবাহের বিরুদ্ধে খবরের কাগজে প্রবন্ধ ও পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল। বাঙ্গালী সমাজে বিবাহ যে একটা ভয়ানক স্বার্থপর ধর্ম্মহীন ব্যাপার তাহা সাব্যস্ত করিবার জন্য সে রীতিমত চেষ্টা করিতে লাগিল। ফলে এই হইল যে, সতীপতি বি-এ পাশ হইল না। পিতা ও পিতামহকে পত্র লিখিল যে, সে বিবাহ করিবে না। কেবল তাহাই নহে, সতীপতি এই নাম বদলাইয়া সে কুমারব্রত নাম ধারণ করিল। চিরকুমার ব্রত অবলম্বন করিয়া সমাজকে শিক্ষা দিবে ইহাই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য হইল। কুমারব্রতের বন্ধুগণের মধ্যে অনেকে বিবাহ করিবে না বলিয়া কাগজে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া স্বাক্ষর করিল। যখন স্বনামপ্রসিদ্ধ কুমারের দল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন তাহারা এক সভা করিয়া তাহাদের স্বার্থশূন্য উদ্দেশ্য ঘোষণা করিতে স্থির করিল। বলা বাহুল্য, কুমারব্রত প্রেসিডেণ্ট হইবে, ইহা পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল। সভায় সকলে উপস্থিত হইয়া বলিল যে, সভার

কার্য্য বাঙ্গালা ভাষায় হইবে। এক জন উঠিয়া বলিল, "আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত প্রস্তাব করিতেছি যে, শ্রীমান্ কুমারব্রত অদ্যকার সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করুন।"

কুমারব্রত প্রেসিডেণ্ট হইতে রাজি ছিল, কিন্তু "সভাপতি" এই শব্দের প্রতিবাদ করিয়া বলিল যে, সে "সভাপত" হইতে পারে কিন্তু "সভা—ঐটা" কিছুতেই হইবে না। অপর একজন বলিল যে, ইহাতে ভাষা-বিভ্রাট ঘটিবে কুমারব্রত বলিল, "কেন? ধনপতি, গণপতি প্রভৃতি শব্দের পরিবর্ত্তে হিন্দুস্থানীরা যখন ধনপত্, গণপত্ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে তখন ইহাতে কি আপত্তি হইতে পারে? অন্য একজন উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "আপত্তি আছে বৈকি, যখন মহিলা প্রেসিডেণ্ট সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন, তখন সভাপতির নামে এত বড় একটা পরিবর্ত্তন এক কথায় হইতে পারে না।" একজন কুমার আপত্তিকারীকে সমর্থন করিয়া বলিল, "হাঁ, ঠিক ত, মহিলা প্রেসিডেণ্ট ত সভাপত্নী নামে অভিহিত হন না।" কুমারব্রত "পতি" শব্দের একান্ত বিরোধী হওয়াতে সভা আর বসিল না, বাক্‌বিতণ্ডায় কুমারগণের সভা ভাঙ্গিয়া গেল; কুমারব্রত বাসায় ফিরিয়া আসিল। এই সভার ব্যাপারটা তাহার অভিভাবকগণের কাণে উঠিল। ইহার দুই সপ্তাহ পরে কোন আত্মীয়ের পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে কুমারব্রত স্বগ্রামে উপস্থিত হইল।

(৩)

উমাপতি মুখুয্যে বাটীর সকলকে পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, কেহ যেন সতীপতিকে বিবাহের বা নাম পরিবর্ত্তন ইত্যাদি কথা লইয়া কোন রকমে বিরক্ত না করে, কারণ তাহা হইলে সে একেবারে বিগড়াইয়া যাইবে। বাটীর পুরুষেরা উমাপতি মুখুয্যের উপদেশমত কার্য্য করিল; কিন্তু মেয়ে মহলে এই হুকুম জারি হওয়া অসম্ভব হইল। নিমন্ত্রিতা অনেকগুলি স্ত্রীলোক সদর মহলে জমা হইয়াছিলেন। সতীপতি ওরফে কুমারব্রত সদর মহলে কোনরূপ বিরক্তিকর কিছু না দেখিয়া উদ্বেগশূন্য হৃদয়ে বাটির ভিতর গেল। সেখানে কে একজন তাহাকে ডাকিয়া মেয়েদের ঘরে লইয়া গেল। সতীপতির দাদার শ্যালিকা তাহাকে দেখিয়া আর একজন স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"পতি বংশে সতী বুঝি ওই রে?"

কুমারব্রতের নাক মুখ লাল হইয়া উঠিল। একজন বয়স্কা স্ত্রীলোক বলিলেন,

"পতিবংশের উল্লেখ করিয়া কেন ওঁর মনে কষ্ট দাও? তোমারা বুঝি জান না আজ ওঁর যশ কতদূর ছড়াইয়া পড়িয়াছে?" সতীপতির মুখে যেন ঈষৎ গর্ব্বের হাসিরেখা দেখা দিল। একটি অনন্য রূপবতী ঘোমটা একটু সরাইয়া পূর্ব্বোক্তা বয়স্কা স্ত্রীলোকের কথার উত্তরে বলিলেন,

"তবে ভারতের পতিহীনা সতী বুঝি ওই রে?—

কুমারব্রতের মাথায় যেন বজ্রপাত হইল। একজন স্ত্রীলোক ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার তাঁর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর আর কোন খবর রাখেন কি?" একটি ইংরাজি শিক্ষিতা সুন্দরী যুবতী আর একটি শিক্ষিতা মহিলাকে গা টিপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা ভাই, হিন্দুদের মধ্যে কি ডাইভোর্স হয়?" কুমারব্রত সেখানে আর তিষ্ঠিতে পারিল না। এক জন একটা কথা বলে আর দশ জন হাসি আরম্ভ করে, এমন অবস্থায় কাহার সাধ্য সেখানে তিষ্ঠিতে পারে? কুমারব্রত খিড়কীর দরজা দিয়া পলাইয়া ষ্টেশনে আসিয়া টিকিট কিনিয়া কলিকাতার বাসায় উপস্থিত হইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। একবার মনে করিল, "দূর হোক্ আর বাড়াবাড়ি করিয়া কাজ নাই। যা হবার হয়েছে, কুমারব্রত নাম কাটাইয়া আবার সতীপতি হই।" তাহার বন্ধুরা কিন্তু তাহাকে চিরকৌমার্য্য প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিল। সে আবার নাচিয়া উঠিল। এবার বাস্তবিক তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিল।

কলিকাতা সভা-সমিতির সহর। এখানকার বাঙ্গালা খবরের কাগজে সভা ও সভাপতির উল্লেখ আছেই আছে। সুতরাং কুমারব্রতের বাঙ্গালা খবরের কাগজ পড়া বন্ধ হইল। একদিন সে রাগ করিয়া একখানা বাঙ্গালা অভিধান লইয়া পতিশব্দগুলি কালি দিয়া মুছিয়া দিল। ক্রমে তাহার পতি-শব্দের প্রতি বিরাগ এত বৃদ্ধি পাইল যে, সে পিতা ও ভ্রাতাগণের সহিত পত্রাদির আদান-প্রদান বন্ধ করিল। তাহার পিতামহকে শেষ পত্রে স্পষ্টই বলিল যে, যদি তাঁহারা ঐ শব্দটা তাঁহাদের নাম হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন তবে তাঁহাদিগকে পত্র লিখিবে। জ্ঞাতিবর্গ কুমারব্রতকে রাগাইবার জন্য "কুমার-ব্রত ওরফে সতীপতি মুখোপাধ্যায়" এই নামে উড়ো চিঠি পাঠাইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, এই সকল বেনামী চিঠিতে 'পতি'শব্দ লইয়া নানারূপ বিরক্তিকর কথা লেখা থাকিত। কুমারব্রত জ্বালাতন হইয়া শেষে এক বন্ধুর আশ্রয় গ্রহণ করিল। সে তাহাকে দিনকতক দেওঘরে তাহার বাংলায় গিয়া মাথা ঠাণ্ডা করিতে বলিল।

(৪)

কুমারব্রত দেওঘরে গিয়া যেন নূতন জীবন লাভ করিল। এখনকার বাংলোগুলির নামে পতিত্বের পরিবর্ত্তে পত্নীত্বের প্রভাব প্রকাশ পাওয়াতে তাহার মন অনেকটা নরম হইল। স্ত্রীজাতির প্রতি তাহার শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কুমারব্রতের বন্ধু তাহার পত্রাদি পাঠ করিয়া মনে করিল যে, কিছুদিন পরে কুমারব্রত বিষম পতিবিকার রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। মাসখানেক পরে কুমারব্রত তাহার বন্ধুর নিকট হইতে একখানা পোষ্ট কার্ড পাইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। তাহাতে লেখা ছিল,

"প্রিয় কুমারব্রত,

আমার ভগ্নী—রতি—দিনকতক দেওঘরে থাকিতে চায়। তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে তাহা হইলে সে আগামী শনিবার রওনা হইবে।
ইতি　　　　　　　　　　　　　　তোমারই নরেন"

নরেনের পত্র পাইয়া কুমারব্রতের বিস্মিত হইবার কারণ ছিল। নরেনের এক ভগ্নীর সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব পূর্ব্বে হইয়াছিল, কিন্তু উমাপতি মুখুয্যে দশহাজার টাকা চাহিলে ও তাহার পর কুমারব্রত বিবাহ করিবে না এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে সেই বিবাহের কথা ভাঙ্গিয়া যায়। এক্ষণে কুমারব্রত নরেনের পত্র পাঠ করিয়া মনে করিল যে বোধ হয় তাহার পিতা কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া এই পত্র লেখাইয়াছেন। যদি বিবাহ করিতে হয় তাহা হইলে কোন পণ না লইয়া নরেনের ভগ্নীকে বিবাহ করিব, বিবাহের পূর্ব্বে রতিদেবীর সহিত একটু কোর্টসিপের অভিনয় মন্দ হইবে না, তবে সকল কথা স্পষ্ট জানা দরকার, এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া কুমারব্রত নরেনকে পত্র লিখিল। নরেন তাহার উত্তরে লিখিল,—

"প্রিয় কুমারব্রত,

তোমার মতিগতি যে ফিরিয়াছে ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। হেঁয়ালীর ভাষায় লিখিত পত্র পাঠ করিয়া বিস্মিত হইয়াছ। পূর্ব্ব পত্রখানি স্পষ্ট লিখিলে একরূপ হইবে,—

"আমার ভগ্নীপতি রতিপতি দিনকতক দেওঘরে থাকিতে চায়। তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে তাহা হইলে সে আগামী শনিবার রওনা হইবে।" পাছে তোমার মনে কষ্ট হয় সেইজন্য পূর্ব্বপত্রে "পতি" শব্দটি উহ্য রাখিয়াছিলাম।　　　　　　তোমারই নরেন"

কুমারব্রত নরেনের পত্র পাইয়া নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিল। সে অভিমানে মর্ম্মাহত হইল। সে মনে করিল যে, নরেনের অতিথি হইয়া দেওঘরে থাকা উচিত নয় আর সেই সঙ্গে আবার চিরকৌমার্য্য ব্রতের প্রতিজ্ঞা তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। কুমারব্রত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া স্থির করিল যে, দিনকতক বাঙ্গালা দেশ ছাড়িয়া সে অন্য কোথাও যাইবে। তাহার আর একজন বন্ধু সেই সময়ে ওয়ালটেয়ারে যাইতেছিলেন। সেই বন্ধু কুমারব্রতকে সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল।

(৫)

কুমারব্রত ওয়ালটেয়ার যাত্রা করিয়া রেলপথে বেশ স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইল। সে ভাবিল যে, এবার পতির উৎপাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। তাহার বন্ধু পূর্ব্বে এতদূর রেলপথে ভ্রমণ করে নাই। কুমারব্রত তাহাকে মুরুব্বিয়ানা করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "আমি যখন তোমার সঙ্গে আছি তখন তোমার কোন ভয় নাই।"

গাড়ি ষ্টেশনে পৌঁছিলে কুলিরা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। কুমারব্রত একজন কুলিকে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করিল, "অমুক হোটেল জান?" দুই তিন জন ইংরাজিতে "হাঁ জানি" বলিয়া উত্তর দিল ও ট্রাঙ্ক ব্যাগ বিছানা টানিয়া লইয়া মাথায় করিল। কুমারব্রত একখানা পকেট বুক বাহির করিয়া তাহাতে কুলিদের নাম ও ঠিকানা লিখিতে আরম্ভ করিল। "তোমার নাম কি?" "মহাশয়, মুতুস্বামী।" কুমারব্রত "স্বামী" শব্দ শুনিয়া মুখ সিটকাইয়া "আঃ" করিয়া উঠিল। দ্বিতীয় কুলির নাম রামস্বামী। তৃতীয় কুলি যখন বলিল যে তাহার নাম রঙ্গস্বামী, তখন কুমারব্রত আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না। সে পকেট্ বুক বন্ধ করিয়া তাহার বন্ধুকে বাঙ্গালা ভাষায় বলিল, "দেখ যদুগোপাল, এ বেটারা আমার সঙ্গে "স্বামী" শব্দটা লইয়া দেখছি রঙ্গ করিতেছে।" যদুগোপাল বলিল, "তা কেন হয় তোমার ব্রতের কথা এখান পর্য্যন্ত আসিয়াছে। লোকে কুমারের দলকে হারাইয়া দিবার জন্য "স্বামী" উপাধি ধারণ করিয়াছে। এখন তোমাদের উচিত যেন তেন প্রকারেণ কুমারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।"

দুই চারি দিন পরে কুমারব্রত বুঝিতে পারিল যে, মাদ্রাজ প্রদেশটা স্বামী-ময়ম্। স্বামীদিগের সহবাসে তাহার ব্রত ভঙ্গ হইবার উপক্রম হইল। এক দিন সে যদুগোপালকে বলিল যে মাদ্রাজিদের ব্যাকরণ জ্ঞান নাই। তাহাদের

মধ্যে অনেকের কুমারস্বামী নাম শুনা যায়। যে কুমার সে স্বামী হয় কি করিয়া? আর যে স্বামী সেই বা কুমার হয় কি করিয়া? ইহার উত্তরে যদুগোপাল বলিল, "যখন তুমি দেশে যাইয়া বিবাহ করিবে তখন বুঝিতে পারিবে।"

যদুগোপাল মনে মনে বুঝিয়াছিল যে, কুমারব্রতের কুমারত্ব আর টিকে না। কুমারব্রতের অভিভাবকগণ গোপনে যদুগোপালকে ওয়ালটেয়ারে চিঠি লিখিতেন। যখন তাঁহারা শুনিলেন যে, সে মাদ্রাজি কুমারীগণের সহিত সর্ব্বদা গল্প করিয়া বেশ আনন্দে দিন কাটাইতেছে তখন তাঁহারা বুঝিলেন যে, তাহার বিবাহের ফুল ফুটিবার সময় হইয়াছে। কুমারব্রতের পিতা যদুগোপালকে পত্র লিখিলেন যে, নরেনের ছোট ভগ্নীর সহিত তাহার বিবাহের কথা ঠিক হইয়াছে; পণ লওয়া হইবে না। কুমার দেশে ফিরিয়া আসিয়া বি-এ ফেল হইয়াও "বিয়ে" পাশ করিল। অনেকে মনে করিয়াছিল যে কুমারব্রত বিবাহের সময় কুমারস্বামী নাম গ্রহণ করিবে কিন্তু তাহা করে নাই। "লুকাইয়া দশ-মূর্ত্তি সতী হইলেন সতী।" উমাপতি মুখুয্যে পণশূন্য বিবাহে মনক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। যাহা হউক কুমারব্রত যে পতিবংশের নাম লোপ করিল না, ইহাতে তিনি কথঞ্চিৎ সুখী হইলেন। বৃদ্ধ বলিলেন, শাস্ত্রের কখন অপলাপ হয় না, "সত্যাঃ পতিরেকোগতিরন্যথা।" সতীপতির বিবাহের পর কুমারের দলটা ভাঙ্গিয়া গেল। যদুগোপালের মতে সতীপতির বিবাহে বেশ একটু রোমান্স আছে। কুমারগণ যদি সতীপতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিত তাহা হইলে অতি সহজে বাঙ্গালী জাতির এক ঘেয়ে জীবন-পালায় রোমাণ্টিক ঘটনা-ময় এক নূতন যুগের অবতারণা করিতে পারিত।

অযোধ্যায়।

এই কি অযোধ্যা সেই শ্রীরামের লীলাস্থল,
অথবা সে নাম লয়ে করিছে শুধুই ছল ?
কোথা সেই রাজপুরী, কোথা তার কলরব ?
অতীতে সকলি গেছে—আছে শুধু জনরব।
কোথা সেই দান ধ্যান সদাব্রত সদাচার
ন্যায়নিষ্ঠা আত্মত্যাগ সে বিক্রম কোথা তার ?
কোথা সেই রাজা প্রজা সুবিচার প্রিয়কর্ম্ম
পিতৃভক্তি ভ্রাতৃপ্রেম—কর্ত্তব্যপালন ধর্ম্ম ?
কোথা সব মহামুনি জিতেন্দ্রিয় তাপসিক
প্রজাহীন রামরাজ্য অন্ধকার চারিদিক।
অই যে পথেরি মাঝে ম্রিয়মান ধূলিকণা
অতীতের প্রত্নতত্ত্ব যেন তা'রা কত চেনা !
যেন তা'রা জনে জনে সহস্র বৎসর ধরে'
বিরহে পড়িয়া পথে পূর্ব্বস্মৃতি ব্যক্ত করে !
অই যে বিশাল উচ্চ জরা-জীর্ণ-ভগ্নস্তূপ
মহাকাল অশ্বত্থের জন্মস্থান অপরূপ।
অযোধ্যার পুরা ভক্ত অতিবৃদ্ধ মহাকায়
ধ্যানরত মহাযোগী জটাজুট সারা গায় ;
বুঝি সেও গাত্রে মাখি বিষাদের অশ্রুধারা
বিরাট গম্ভীর স্তব্ধ মহাশোকে বাক্যহারা !
তবু যে উহারি বুকে স্মৃতিচিহ্ন অযোধ্যার
এখনো জড়ানো আছে মুছাবার সাধ্য কার ?

শ্রীঅবনীকুমার দে।

শ্রীচৈতন্যদেবের তীর্থপর্য্যটন।

(গোবিন্দদাসের করচা)

গোবিন্দদাস নামধারী এগার জন কবি বৈষ্ণব কাব্যসাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে করচা-প্রণেতা গোবিন্দদাস বর্ত্তমান সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের চরিতাখ্যান-লেখকদিগের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার কবিত্ব-শক্তির প্রশংসা আজকাল অনেক সমালোচকের মুখে শুনা যায়। গোবিন্দদাসের চিত্রগুলি শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের ধারাবাহিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছে। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের ইতিহাস এই কবি এমন সুন্দরভাবে বর্ণন করিয়াছেন যে, তাহার তুলনা হয় না। শ্রীচৈতন্যের দেবচরিত্র কবির লেখনীমুখে এমন স্বাভাবিক বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, তাহা পাঠ করিলে চৈতন্যচরিত দুর্জ্ঞেয় বলিয়া মনে হয় না। প্রেমোন্মত্ত শ্রীচৈতন্যের চিত্র গোবিন্দদাস অনেক স্থানে উপযোগী ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন। কবির সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রেমোন্মাদের যতগুলি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে, সকলগুলিই স্বাভাবিক; প্রেমভক্তির আবেগে শ্রীচৈতন্যদেব যে কতবার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন, ধূলায় গড়াগড়ি দিয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না।

"ভোলেশ্বর দেখি প্রভুর প্রেম উপজিল।
জোড়হস্তে স্তব স্তুতি বহুত করিল॥
অজ্ঞান হইয়া গোরা পড়িয়া ধরায়।
উলটি পালটি কত গড়াগড়ি যায়॥
ভোলেশ্বর দরশন করি গোরা রায়।
নিকটে দেবলেশ্বর দেখিবারে ধায়॥
দেখিয়া দেবলেশ্বর প্রভু গুণমণি।
প্রণাম করিয়া তবে লুটায় ধরণি॥
প্রেমে গদগদ হয়ে বহু স্তব করে।
প্রভুরে দেখিতে লোক আসে ভক্তিভরে॥"

ভাব-লীলার চিত্রগুলিতে গোবিন্দদাস শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেম ও ভক্তির রহস্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। গোবিন্দদাসের করচায় শ্রীচৈতন্যদেবের উচ্ছ্বসিত হৃদয় কাব্যাকারে অভিব্যক্ত। গোবিন্দদাস সরল

ভাষার কবি। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের অকৃত্রিম প্রেম-ভক্তির বিকাশ কষ্টসাধ্য ভাষায় বর্ণন করেন নাই। কবির বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে পাঠককে থামিয়া যাইতে হয় না, ভাবিয়া চিন্তিয়া ভাব সংগ্রহ করিতে হয় না। শিশুর ন্যায় সরলপ্রকৃতি শ্রীচৈতন্যের দেবচরিত্র গোবিন্দদাস যে ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই ঠিক। গোবিন্দদাসের সরল ভাষা হৃদয়গ্রাহী আর সেই জন্য শ্রীচৈতন্য-দেবের ভাব-লীলা বুঝিতে কাহারও দেরি হয় না। মহাপ্রভুর প্রেম ও ভক্তি-ভাবের মর্ম্ম কবির ভাষার সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের অন্তঃপুরে পৌঁছায়। গোবিন্দদাস শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত সমুদয় দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ ভ্রমণের বিবরণ করচায় লিপিবদ্ধ করিয়া কবি একখানি সুবৃহৎ চিত্র-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

গোবিন্দদাসের বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে মনে হয় যেন তিনি পাঠকের সহিত কথা কহিতেছেন। শ্রীচৈতন্যদেব কোন্ তীর্থ দর্শন করিলেন, কোন্ বিগ্রহের পূজা করিলেন, ভাবাবেশে কখন কি বলিলেন, এই সকল ব্যাপার কবি এমন সরলভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহার কথার উপর সহজেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে ইচ্ছা হয়। গোবিন্দদাসের করচায় যে একখানিও কবি-কল্পিত চিত্র নাই, ইহা চরিতাখ্যান-লেখকের পক্ষে কম প্রশংসার কথা নয়। কবি যে সকল কিম্বদন্তী ও ঐতিহাসিক ঘটনামূলক তথ্য তাঁহার করচার মধ্যে স্থান দিয়াছেন, সেগুলিও যেমন শিক্ষাপ্রদ তেমনি মনোরম। এইরূপ বিস্তর তথ্যের ভিতর হইতে নিম্নে একটি নমুনা উদ্ধৃত হইল :—

"তিন সন্ধ্যা স্নান করি তাপতীর জলে।
বামন দেবের মূর্ত্তি দেখিবারে চলে॥
একই প্রান্তরভূমে তাপতীর কাছে।
বামন দেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে॥
বলিরাজা এই মূর্ত্তি করিলা স্থাপন।
তাপতী হইল তীর্থ ইহার কারণ॥
বামন করিলা স্নান তাপতীর জলে।
সেই লাগি তাপতীরে মহাতীর্থ বলে॥
বামনদেবের পদে নমস্কার করি।
যজ্ঞকুণ্ড দেখিবারে যায় গৌরহরি॥

ভঁরোচ নগরে যজ্ঞকুণ্ড দেখিবারে।
তাপতী ছাড়িয়া যায় নর্ম্মদার ধারে॥
ভঁরোচেতে যজ্ঞকুণ্ড বলিরাজা করে।
কুণ্ড দেখিবারে যায় প্রফুল্ল অন্তরে॥
প্রকাণ্ড কুণ্ডের খাত দেখিয়া নয়নে।
অপার আনন্দ হইল চৈতন্যের মনে॥
মহাতীর্থ নর্ম্মদায় সিনান করিয়া।
বরোদা নগরে যায় গোরা বিনোদিয়া॥
বরোদার পূর্ব্বভাগে ডাঁকোরজী ঠাকুর।
ডাঁকোরজী দেখিতে ইচ্ছা হইল প্রভুর॥
ডাঁকোরজীর আঙ্গিনায় প্রকাণ্ড তমাল।
তার নিম্নে দাণ্ডাইলা শচীর দুলাল॥
ডাঁকোরজী দেখিয়া প্রভু নতি স্তুতি করি।
ফিরিয়া আইলা পুনঃ বরোদা নগরী॥"

গোবিন্দদাসের করচা হইতে জানা যায় যে, দক্ষিণ ভারতে ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন অবতারের অনেকগুলি মূর্ত্তি আছে। দাক্ষিণাত্যবাসী হিন্দুরা এই সকল মূর্ত্তি পূজা করে। বরাহ নৃসিংহ বামনদেবের মূর্ত্তির ন্যায় কূর্ম্মতীর্থে কূর্ম্মদেবের মূর্ত্তি আছে।

"কূর্ম্মদেবে দেখি প্রভু প্রেমে মাতোয়ারা।
ঝর ঝর দুনয়নে বহে অশ্রুধারা॥
জোড়হস্তে বহু স্তব কূর্ম্মদেবে করে।
আছাড়িয়া পড়ে প্রভু ভূমির উপরে॥

করচায় মৎস্যতীর্থের উল্লেখ আছে, কিন্তু কোনও দেবমূর্ত্তির কথা লেখা নাই। দক্ষিণ ভারতে ভগবান রামচন্দ্রের নামে প্রসিদ্ধ অনেক প্রাচীন হিন্দু তীর্থের উল্লেখ গোবিন্দদাসের করচায় দেখা যায়। গিরীশ্বর লিঙ্গ নামে শিব দর্শন করিয়া তাঁহারা ত্রিপদীনগরে আসিলেন। সেখানে শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব ভাবাবেশে ধূলায় লুণ্ঠিতদেহ হইলেন।

"তার পরে ত্রিপদী নগরে প্রভু যায়।
শ্রীরামের মূর্ত্তি দেখি পড়িলা ধরায়॥

বহুতর রামাত বৈষ্ণব তথা থাকে।
বিচার করিতে তারা ফেরে কত পাকে॥
মথুরা নামেতে এক রামাত পণ্ডিত।
বড়ই তার্কিক বলি নগরে বিদিত॥
প্রভুর সম্মুখে আসি বিচার মাগয়ে।
জোড়হাতে প্রভু কন জড়সড় হয়ে॥
মথুরা ঠাকুর মুহি বিচার না জানি।
তোমার নিকটে শতবার হারি মানি॥
শ্রীরামের ভক্ত তুমি বৈষ্ণব গোঁসাই।
তোমারে ভজিলে কত তত্ত্বকথা পাই॥"

শ্রীচৈতন্যদেব মথুরা পণ্ডিতের সহিত বিচার করিতে চাহিলেন না। তাহাকে তত্ত্বকথা শুনাইতে অনুরোধ করিলেন।

"নাহি প্রয়োজন বহু বাদবিতণ্ডায়।
দয়া করি সূক্ষ্মতত্ত্ব বলহ আমায়॥
বলিতে বলিতে প্রভু হরিবোল বলি।
মাতিয়া উঠিল নামে হয়ে কুতূহলী॥
কোথায় বসন কোথা উত্তরীয় বাস।
লোমাঞ্চিত কলেবর ঘন বহে শ্বাস॥
আছাড় খাইয়া তবে পড়িলা ধরায়।
অচেতন হৈলা প্রভু যেন জড়প্রায়॥
যতেক রামাতগণ ভাব নিরখিয়া।
নাচিতে লাগিল এবে প্রভুরে বেড়িয়া॥"

দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধ ও শৈবগণের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে শ্রীচৈতন্যদেবকে কতকটা আয়াস পাইতে হইয়াছিল; কিন্তু রামাত বৈষ্ণবগণকে কৃষ্ণপ্রেমে দীক্ষিত করিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। রামাত বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমভাবে কৃষ্ণপ্রেমের গতি সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

"নাগর নগরে আছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সেইখানে গিয়া প্রভু করিলা বন্দন॥
নাগরেতে বহুতর লোক করে বাস।
সেইখানে হরিনাম করিলা প্রকাশ॥

প্রভুর প্রেমের গতি হেরি পুরবাসী।
আবাল বনিতা সবে হইলা উদাসী॥
তিনদিন নৃত্যগীত সেইখানে করে।
এই কথা প্রচারিল নগরে নগরে॥
দশ ক্রোশ হ'তে লোক আসিয়া জুটিল।
একে একে সবে প্রভু হরিনাম দিল॥"

রামনাথনগরে শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম দর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব কিরূপ ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন গোবিন্দদাস তাহাও লিখিয়াছেন।

"রামনাথ নগরেতে রামের চরণ।
হেরিয়া করিলা প্রভু অশ্রুবরষণ॥
পুলকে পূরিল দেহ কাঁপিতে লাগিল।
অজ্ঞান হইয়া প্রভু ভূমেতে পড়িল॥
পাদপদ্ম পরশিয়া মোর দয়াময়।
শিহরি শিহরি উঠে ঘন শ্বাস বয়॥
পাদপদ্ম নিরখিয়া শচীর নন্দন।
আর আর তীর্থে চলে করিতে দর্শন॥"

মূর্ত্তি-দর্শনে ভক্তি, যেখানে মূর্ত্তি নাই কেবল চরণ-চিহ্ন-দর্শনে ভক্তি, প্রসাদে ভক্তি, নির্ম্মাল্যে ভক্তি, এইরূপে গোবিন্দদাস তাঁহার করচার সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্য-দেবের ভক্তির চন্দনধারা বর্ষণ করিয়াছেন। রামগিরি তীর্থে ভক্তির আকর্ষণী শক্তির এক নূতন অভিব্যক্তি। পর্ব্বতবেষ্টিত ত্রিবঙ্কুদেশে এই তীর্থের আবাস-ভূমি।

"রামগিরি নামে গিরি আছে সেইখানে।
আশ্চর্য্য মহিমা তার সকলে বাখানে॥
সবে বলে রামচন্দ্র ইহার উপরে।
সীতাসহ তিন দিন আসি বাস করে॥
লঙ্কার সমর জিনি রাম গুণধাম।
এই গিরিকুটে উঠি করেন বিশ্রাম॥
সীতাসহ রামচন্দ্র ঠাকুর লক্ষ্মণ।
এইখানে বিরাম করেন তিন জন॥

শুনিয়া প্রভুর মনে লালসা বাড়িল।
সেই স্থান দেখিবারে পর্ব্বতে উঠিল॥
যেই স্থানে রাম সীতা বিশ্রাম করিলা।
সেইখানে মোর গোরা গিয়া প্রণমিলা॥
ভক্তিসহ সেই রামগিরি নিরখিতে।
কত শত লোক উঠে প্রভুর সহিতে॥
আড়ে দীর্ঘে এই দেশ বড়ই বিস্তর।
এক পক্ষ কাল গেল তাহার ভিতর॥"

এই সকল কষ্টসাধ্য তীর্থে আজ পর্য্যন্ত আর কোনও বাঙ্গালী গিয়াছেন কি না আমরা জানি না। গোবিন্দদাস শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের লীলাক্ষেত্র দক্ষিণ ভারতের আরও কয়েকটি তীর্থে পর্য্যটন করিয়াছেন। এই সকল তীর্থের বিবরণ পাঠ করিতে করিতে রামায়ণে লিখিত শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস-কাহিনী পাঠকের স্মৃতিতে জাগিয়া উঠে। নাসিকনগর লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সূর্পনখার নাসিকা-ছেদনের জন্য সুপ্রসিদ্ধ।

"প্রভাতে উঠিয়া প্রভু নাসিক নগরে।
চলিলা করিতে তীর্থ বিশুদ্ধ অন্তরে॥
সূর্পনখা রাক্ষসীর নাসিকা-ছেদন।
এই স্থানে করেছিলা ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
ইহার উত্তরভাগে ত্রিমুকের কাছে।
রামের কুটীরক্ষেত্র বিগ্যমান আছে॥
এইখানে মহাপ্রভু করিয়া গমন।
স্তব স্তুতি করি শেষে করিলা কীর্ত্তন॥
রামের চরণ-চিহ্ন আছে এইখানে।
ইহা শুনি ধাইয়া চলিল বন-পানে॥
নিবিড় বনের মধ্যে ঝরণার ধারে।
চরণ দুখানি শোভে প্রস্তর উপরে॥
চরণের চিহ্ন প্রভু করিয়া পরশ।
গাঢ়তর প্রেমভরে হইলা অবশ॥
পুলকে মাথার জটা নাচিয়া উঠিল।
সেই ক্ষীণ দেহ যেন ফুলিতে লাগিল॥

প্রভু বলে কোথা রাম প্রাণের ঈশ্বর।
হৃদয়ে দেখা দিয়া জুড়াহ অন্তর॥
অবশেষে মোর কণ্ঠ আঁকড়ি ধরিয়া।
কোথা মোর রাম বলি উঠিল কান্দিয়া॥"

এখান হইতে তাঁহারা পঞ্চবটীতে গমন করেন। "তার পর পঞ্চবটী করিয়া প্রবেশ। লক্ষ্মণের প্রতিষ্ঠিত দেখিলা গণেশ॥" এই তীর্থ দর্শন করিয়া তাঁহারা সোমনাথ প্রভাস দ্বারকা প্রভৃতি তীর্থে গমন করেন। বোম্বাই প্রদেশের এই সকল শেষোক্ত তীর্থ দর্শন করিয়া তাঁহারা পুরীতে প্রত্যাগমন করিবার সময় বিন্ধ্যগিরির নিকটবর্ত্তী আমঝোরা নগরের প্রান্তে লক্ষ্মণের কুণ্ড নামক তীর্থে গমন করেন।

"নগরের প্রান্তে কুণ্ড অতি মনোহর।
পর্ব্বতে বেষ্টিত কুণ্ড অল্পপরিসর॥
পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ জানকী হইলা।
বাণ মারি এই কুণ্ড লক্ষ্মণ কাটিলা॥
লক্ষ্মণের কুণ্ড বলি প্রসিদ্ধ হইল।
এই কুণ্ড মহাতীর্থ জানকী বলিল॥
অতি রমণীয় কুণ্ড অত্যন্ত গভীর।
স্নান করি সুশীতল হইল শরীর॥
এই তীর্থে স্নান করি গোরা দয়াময়।
হরিধ্বনি করে শুনি চিত্ত দ্রব হয়॥"

রামচন্দ্র ও চৈতন্যের লীলাময় জীবনে প্রেমের অভিব্যক্তিসম্বন্ধে অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সাহায্যে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিয়া আর্য্য-সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। ভ্রাতৃপ্রেমের আশ্চর্য্য শক্তি ও অতুলনীয় আদর্শ ভারতবাসীকে দেখাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যও গোবিন্দদাস কর্ম্মকারের সহিত নীলাচল হইতে যাত্রা করিয়া দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেই উপলক্ষে তিনি যে শুধু বাঙ্গালীর প্রেমিকতা প্রকটিত করিয়াছিলেন তাহা নহে, জাতিবিচ্ছেদের ব্যবধান ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ভ্রাতৃপ্রেমের নূতন আদর্শ ভারত-বাসীর সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন। সাম্য ও দাস্যভাব হৃদয়ের মধ্যে অনুভূত না হইলে প্রেমের অধিকার প্রসারিত হয় না,—শ্রীচৈতন্যদেব এই শিক্ষা দিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়-রাজপুত্র রামচন্দ্র চণ্ডালকে

আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণ হইয়াও মুসলমানকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের অসাম্প্রদায়িক প্রেমের আকর্ষণে কত মুসলমান বৈষ্ণব কবি যে কাব্য-মন্দিরে গীতি-কবিতার পুষ্পাঞ্জলি লইয়া বঙ্গভাষার পূজা করিয়াছেন তাহা বলা যায় না।"

শ্রীপ্রিয়লাল দাস।

আমাদের গৃহস্থালী।

গৃহস্থালী বড়ই "বে-সিজিল" হইয়া পড়িয়াছে। গৃহস্থালী পুনর্ব্বার পূর্ব্বের মত করিয়া পাতাইতে হইবে। নহিলে নিশ্চয়ই দুর্গতি ঘুচিবে না। দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনা ঘটিবে; দুর্য্যোগের পর দুর্য্যোগ উপস্থিত হইবে। সংসার শুকাইয়া উঠিয়াছে, আরও শুকাইয়া উঠিবে; সত্য সত্যই শেষে সংসার শ্মশানে পরিণত হইবে।

আধা-আধি কাজে কুলাইবে না। পূর্ণমাত্রায় পঙ্কোদ্ধার করা চাই। সংশোধন ষোল আনা রকম চাই। গৃহস্থালী আমূল মেরামত করিতে হইবে। হাফ হিন্দু, হাফ ম্লেচ্ছ হইলে চলিবে না; আধা ব্রাহ্মণ, আধা বাবু হইলে চলিবে না। দশ আনা সাধু, ছয় আনা শঠ হইলে হইবে না। বিষ্ণুপূজা কর বলিয়া বিলাতী বিস্কুটের নৈবেদ্য চালাইতে পারিবে না। "প্রায়শ্চিত্ত করিব বলিয়া পূর্ণজ্ঞানে পাপ করিতে পাইবে না। হয় "এস পার" নয় "ওস পার।" হয় একেবারে অভ্যন্তরে আইস, নয় বরাবর বাহিরে যাও; মধ্যপথে দাঁড়াইয়া "মাতব্বরী" করিতে পাইবে না। জাতিধর্ম্মরক্ষায় শালিশ নিষ্পত্তি চলে না; ধর্ম্মকর্ম্মে "কম্প্রমিস" নাই। পরলোকের ব্যাপার পঞ্চায়তী করিয়া "রফা" হয় না। দুই পন্থার যে পন্থা ইচ্ছা অচিরাৎ নির্ব্বাচন কর। হিন্দু থাকিবার জন্য ও হিন্দু হইবার জন্য কাহারও প্রতি অনুরোধ নাই। অনুগ্রহ

করিয়া কাহারও হিন্দু হইতে হইবে না—অনুকম্পা করিয়াও যেন কেহ হিন্দু না হয়েন। ইহাতে উপরোধ, অনুরোধ, অনুনয়, বিনয়, স্নেহ, মমতা, বন্ধুত্ব, পূর্ব্বস্মৃতির খাতির কিছুই নাই। মনকে চোখঠারা হিন্দুয়ানি হিন্দুসমাজ চাহে না। মনকে চোখঠারা হিন্দুয়ানি এখনই চূর্ণ হউক। ডুব দিয়া জল খাইলে আর চলিতেছে না। "সিধা শড়ক" পড়িয়া আছে; সটান চলিয়া আইস, না হয় সটান চলিয়া যাও। মাঝ রাস্তায় দাঁড়াইয়া "আমতা আমতা" কর কেন? দুই পদ অগ্রসর হইয়া আবার এক পদ পশ্চাৎ ভাগিয়া আইস কেন? এরূপ লুকাচুরীর প্রয়োজন কি? পরের চক্ষে ধূলি দিবার প্রয়োজন কি? নিজ আত্মা কলুষিত করার আবশ্যকতা কি? স্বধর্ম্মে আর্থিক ও সামাজিক স্বার্থ আছে, কাজেই যোল আনা রকম ছাড়িতে পার নাই; কিন্তু বিধর্ম্মে ও ব্যভিচারে বাসনা রহিয়াছে, তোমার বার আনা রকম। বলবতী বাসনা-স্রোতে কেবলমাত্র অকিঞ্চিৎকর স্বার্থমূলক স্বধর্ম্ম কতক্ষণ টিকিবে? তাই বলি কেন আর এ কর্ম্মভোগ; কেন এ কপটতা, কেন এ কাপুরুষোচিত ভীরুতা? ইহাকেই না ইংরাজেরা Cowardice বলেন? কেন আর এ কাউয়ার্ডিস?". বরাবর বাহিরে চলিয়া যাও, বিমুক্তদ্বারে ব্যভিচার-বাসনা পূর্ণ কর, বাজার অঞ্চলে ব্রাহ্মেরা আছেন, বর্ণবিহীন বাবুও বিস্তর আছেন, প্রকাশ্যভাবে যাইয়া তাঁহাদের দল পুষ্ট কর, তাঁহাদের অনুকরণে গৃহস্থালী পাতাও, তাঁহাদের আদর্শে জীবন যাপন কর; কথাটী কহিব না। কিন্তু হিন্দুসমাজের মধ্যে থাকিয়া যে, হিন্দুসমাজদ্রোহী, হিন্দুশাস্ত্রদ্রোহী হইবে, আধা ম্লেচ্ছ, আধা হিন্দু গৃহস্থালীতে তামসিক অর্চ্চনায় দেব-দেবীর অবমাননা করিবে, শাস্ত্রের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া কালাপানি যাওয়ার কের্দ্দানি করিবে—গুরু, পুরোহিত কেবল পর্দ্দার জন্য নিযুক্ত করিয়া ঠাকুর-প্রসাদের পুরিয়ার মধ্যে উইলসন-হোটেল পরিপাক করিবে, ইহা সহিতে পারিব না। হিন্দু-সমাজ হইতে এমনতর "শাঁকের করাত" সমূলে উৎপাটন করিতে হইবে। আবর্জ্জনা ঝাঁটাইয়া শাফ কর; তুঁষ কুড়া ও কুশস্য কুলার বাতাসে উড়াও; ইহাতে হিন্দু সমাজ বাঁচে বাঁচুক, মরে মরুক। পরমায়ু ফুরাইলে কে রক্ষা করিতে পারে? কিন্তু সনাতন সমাজের পরমায়ু কখনও ফুরায় নাই; কোনও কালে ফুরাইবে না; কত বাত্যা, কত বিপ্লব, কত বিপর্য্যয়, বিঘ্ন যুগে যুগে উপস্থিত হইয়াছে; হিন্দুসমাজ ফুৎকারে উড়াইয়াছে। সমুদ্র হইতে দুই দশ কলস দূষিত বারি বাহির করিয়া দিলে সমুদ্র শুকায় না।

(৩)

অপ্রবৃত্তিসত্ত্বে এবং যুগপ্রবাহে যে সকল হিন্দু গৃহস্থের গৃহস্থালীতে "গলদ" উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের সম্বন্ধেই আমাদিগের কথা। যাঁহারা ব্যসনার্থে ব্যসনানলে পুড়িয়া মরিতেছেন, তাঁহাদিগের সহিত সংস্কারের কথা আমরা কহিব না; তাঁহারা অবিলম্বে বাহিরে গেলেই মঙ্গল। তাঁহাদের জন্য হিন্দু-সমাজের সীমান্ত-প্রদেশ প্রকৃতি এবং তাঁহাদের প্রবৃত্তিকর্ত্তৃক চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে।

যুগবিপ্লবের দৌরাত্ম্যে সাধু গৃহস্থ শত সাবধানতা সত্ত্বেও অনাচারের একটানা স্রোতে অজ্ঞাতে যাইয়া পতিত হয়েন। তাই আজ তাঁহার গৃহলীস্থা শত ছিদ্রময়,—অসুখের এবং অশান্তির নিকেতন; উদ্বেগের, অলক্ষণের এবং অলক্ষ্মীর ক্রীড়া-ভূমি; তাই আজ তথায় মনোমালিন্য, মতভেদ, অবাধ্যতা ও অশাসন; তাই আজ তথায় বিশুদ্ধ আচারের ভগ্নাবশেষের সঙ্গে বিলাসিতার বিসম্বাদ,—তাই আজ তথায় সাত্ত্বিক আহারের অব্যবহিত পার্শ্বেই নিষিদ্ধ খাদ্য কদাহারের ব্যবস্থা। এক রন্ধনশালাতেই দেখ কি বীভৎস ব্যাপার ঘটিয়াছে। ঠাকুরভোগ রন্ধনের "উনুনে"র অব্যবহিত উপরের ফুলুঙ্গিতে মেজ-বধূমাতার পলাণ্ডু রাঁধিবার "ডেকৃচি;" কারণ মেজ বাবু পলাণ্ডু-রস-সংযোগ ব্যতীত মাংস ভক্ষণ করিতে পারেন না এবং সেই মাংস নিত্য রাত্রে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। ছোট-বধূমাতার শরীর অসুখ, তাঁহার পথ্যের জন্য একটু "চীকেন-ব্রথ" চাই,—ডাক্তারের ব্যবস্থা—কাজেই পাকশালার প্রান্তভাগে দেখ ঐ কুক্কুট-রস নিষ্কাসনের বন্দোবস্ত! মধ্যভাগে বৃদ্ধা বিধবাদিগের নিরামিষ-পাকের গোময়-রঞ্জিত চুল্লী!

দুর্গা-দালানের পার্শ্বস্থ কক্ষ—পূজার সময় দুর্গাদেবীর "ভোগের ঘর।" আশ্বিনের কয়েক দিন ব্যতীত সম্বৎসরের সব কয় মাস তথায় মিসনরী মহাশয়ার আবির্ভাব; কারণ ন্যায়ালঙ্কারের নাতনী কয়টী তাঁহার নিকট উলের কাজ শিখে, আর একটু ইংরেজী বাঙ্গালা পড়ে। ঠাকুরাণীটী অনেক দিন হইতে যাতায়াত করিতেছেন, মেয়েরা তাঁহাকে ভালবাসে, তিনিও তাহাদিগকে আন্তরিক স্নেহ করেন; কাজেই কোন কথা কহা হয় না।

ন্যায়ালঙ্কারের মাতা "ত্রিতলে"র সর্ব্বপ্রান্তস্থ কক্ষে "বানপ্রস্থ"-অবলম্বিনী। কিন্তু হায়! তাঁহার কুঁড়াজালির মধ্যে কে আজ একখানা পাঁওরুটীর খোসা রাখিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধা আর্ত্তনাদ করিয়া নাতি-নাতিনীদিগের পিণ্ডপ্রদানের প্রস্তাব করিতেছেন; বধূরা বৃদ্ধাকে সদ্য বৈতরণী-পারের ব্যবস্থার জন্য উদ্যোগিনী হইতেছেন!

ন্যায়ালঙ্কার নিরীহ লোক। তাঁহার অজ্ঞাতে অলক্ষ্যে শনৈঃ শনৈঃ তাঁহার গৃহস্থালীতে এই সকল দুর্বিপাক আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতের আলয়ে যে দিন প্রথম বিলাতি কেতার বাতাস বহিল, সে দিন কেহ তাহা গ্রাহ্য করিল না; কারণ "কালের গতি ত অমন হইয়াই থাকে; উহাতে আর বিশেষ দোষ কি!" ক্রমে সে বাতাস ঈষৎ মাত্রায় বাড়িল, আস্তে আস্তে আর একটু বাড়িল; ক্রমে বাতাস আরও তেজে বহিল; এক একটু করিয়া ন্যায়ালঙ্কার ঠাকুরের গৃহস্থালীর পুরাতন "কিস্তি" বাহির গাঙ্গের বহুদূরে এমন স্থানে গিয়া পড়িল যে, এখন আর "হালে পানি পায় না।" সংসারতরী শীঘ্রই বুঝি বানচাল হয়!

রোগ কঠিন; সুতরাং চিকিৎসাও চাই কঠিন। উপরোধ, অনুরোধ, স্নেহ মমতা ও চক্ষুলজ্জার অনেক প্রতিবন্ধক আসিয়া জুটিবে; কিন্তু সে সকল মানিলে চলিবে না। সুদৃঢ় পণ করিয়া সুদৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সংশোধন-কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। আমূল সংশোধন। সংশোধন রাখিয়া ঢাকিয়া করিলে চলিবে না; অশুদ্ধাচারের সংস্পর্শমাত্র গৃহস্থালী হইতে দূর করিতে হইবে। সংশোধন প্রথমতঃ পাকশালায় আরম্ভ করিয়া বহির্ব্বাটীর দিকে আইস। ইতস্ততঃ করিলে চলিবে না। স্নেহের বন্ধন, প্রাণের বন্ধন ছিন্ন হয়, তাহাও স্বীকার, তাহাও পণ করিলে, তবে একার্য্য করিতে পারিবে; নহিলে পারিবে না। না পারিলেও মঙ্গল নাই। কালবিলম্বে রোগ কঠিন হইতে কঠিনতর হইতেছে; অতএব তৎপর হও।

৺ ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস।

[জন্ম—৪ঠা মাঘ, ১২৬১ সাল, জয়দেবপুর

মৃত্যু—১৩ই আশ্বিন, সোমবার, ১৩২৫, ঢাকা]

বাঙ্গালার কবি—খাঁটী বাঙ্গালার খাঁটী বাঙ্গালী কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস স্বর্গারোহণ করিয়াছেন! চিরদরিদ্র কবি—দারিদ্র্যেই তাঁহার কবিত্বের বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। মাথার উপর দিয়া সংসারের দুঃখ-কষ্টের শত ঝঞ্ঝা বহিয়া যাইতেছে,—সাধারণ মানুষ পাগল হইয়া যায় এমন অবস্থা—তাহারই ভিতরে সমাধি-মগ্ন যোগীর মত তিনি বাণীর ধ্যান করিতেন, কাব্য-রচনায় নিমগ্ন থাকিতেন। তাই তাঁহার কবিতায় আগুণের ঝাঁজও আছে, চোখের জলও আছে। তাঁহার কবিতায় দারিদ্র্যের স্পর্দ্ধা এবং চরিত্রের মর্য্যাদা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালার কবি গোবিন্দদাসের স্থান কোথায়, তাহা নির্ণয় করিবার ইহা সময় নহে। তথাপি বলিব,—বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে গোবিন্দদাস বহু উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার দেশাত্মবোধের কবিতাগুলি যেন এক একটী হীরার টুক্‌রা। তাহার ক্ষুরধারে কত বিভীষণের কাচ-বুদ্ধি কাটিয়া খান্ খান্ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার রচিত এই শ্রেণীর কবিতায় যে তেজের অভিব্যক্তি এবং খাঁটি 'দেশোয়ালি' সুর আছে, তাহা সাহিত্য-রসিক কখনও ভুলিতে পারিবে না।

চিরদিন দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে গোবিন্দচন্দ্রের দিন কাটিয়াছে—দিন কেন জীবনের শেষ হইয়াছে! মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দারুণ অভাবের বৃশ্চিক-দংশনে জ্বলিয়া পুড়িয়া গিয়াছেন। কবিকে জীবিতকালে দেশবাসী সাহায্য করিতে পারেন নাই, আজ তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার 'চিতায় মঠ' দিবার পূর্ব্বে তাঁহার নিরাশ্রয় পুত্র-পরিজনের ভরণ-পোষণের কোনও ব্যবস্থা যদি দেশের জনসাধারণ করিয়া দেন, তাহা হইলে আমরা কৃতকৃতার্থ হইব।

ঢাকা সহরে কবির বসবাসের জন্য একটী বাটী করিয়া দিবার জন্য বাঙ্গালার জননায়কগণের স্বাক্ষরিত আবেদনের কথা আমাদের মনে আছে। সে আবেদনপত্র ভাওয়ালের রাণীমাতার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। মন্দভাগ্য কবির পক্ষ হইতে জননায়কগণের সে প্রার্থনা তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু

আবেদনপত্র উপেক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া কেহ বেদনা বোধ করিয়াছিলেন কি না জানি না, তবে তাঁহাদের আত্মসম্মান যে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিব। বাঙ্গালার জননায়কগণ আত্মসম্মানে আঘাত লাগিবার সে জ্বালা নিঃশব্দে পরিপাক করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের অপমানের আগুনের দাহিকাশক্তি ছিল না; থাকিলে তাহা উগ্র তেজে জ্বলিয়া উঠিয়া দেশবাসীর সহানুভূতিকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিতে পারিত। কিন্তু তাহা ত হয় নাই! যাহা হয় নাই তাহা লইয়া আজ আর আলোচনার ফল কি।

গোবিন্দচন্দ্রের কাব্য-সমালোচনার স্থান ইহা নহে। এখন আমরা চাই—কবির নিরাশ্রয় পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা দেশবাসী করুন। 'নব্য-ভারতে'র সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, কবি-তিলক শ্রীযুত অক্ষয়কুমার বড়াল প্রভৃতি উদ্যোগী হউন। আমাদের মনে হয়, তাঁহারা মুখপাত্র হইয়া দাঁড়াইলে গোবিন্দচন্দ্রের পরিবারবর্গের জীবন-ধারণের কোনও না কোনও উপায় হইতে পারিবে!

কবির 'মগের মুলুক' এখন পাওয়া যায় কি না জানি না। আমরা উহা প্রায় ১৭।১৮ বৎসর পূর্ব্বে এক বন্ধুর হস্তলিখিত খাতায় পড়িয়াছিলাম। সে অবধি তাহার দুই চারি ছত্র আমাদের মুখস্থ হইয়া রহিয়াছে। 'মগের মুলুক' লইয়া যে মানহানির মামলা হইয়াছিল, তাহা এখনকার লোকে ভুলিয়াছে। কবি গোবিন্দচন্দ্রের জীবন-চরিতকার ইহা অবশ্য লিপিবদ্ধ করিবেন। 'নব্য ভারত'-সম্পাদক এই কবিতাটীর কিয়দংশ 'নব্যভারতে' পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন; আমরা তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিলাম :—

মগের মুলুক।

"বঙ্গদেশে আছে একটী স্বর্গপুর গ্রাম
গাছ গাছলায় ভরা তাহা নবীন ঘনশ্যাম!
রাঙ্গা মাটী পলাকাটী খাঁটি সোনার মত,
টিলায় টিলায় ভুল হয়ে যায় মৈনাক শত শত।
উত্তরে তার রূপার রেখা ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী,
মন্দাকিনীর মত তাহার মন্দ মন্দ গতি!
দেবপুর-নিবাসী কত দেবের দেহ ছাই,
মাখি বুকে মনের সুখে যখন দেখা পাই।

পূবের ধারে গাঙের পাঁরে শ্যামল তপোবন।
চাঁপা বনে চাতক ডাকে চমকে উঠে মন!
কলসী কাখে আঁচল মুখে মেয়েগুলি আসে,
পাতা ঢাকা ফুলের মত ফাঁকর হয়ে হাসে।
কেউ বা পড়ে কেউ বা ধরে উঠে ভিজা পায়,
পিছ্‌লা ঘাটে আছাড় খেয়ে কলসী ভেঙ্গে যায়।
পূবের দিকে পদ্মভরা বিলের সীমা নাই,
পিপী ডাকে কোড়া ডাকে কালেম কড গাই!
উত্তরে তার হাজার হাজার বিশাল গজার বন,
বাঘ ভালুকে বেড়ায় সুখে খেলায় হরিণগণ।
গাছে গাছে ময়ুর নাচে পেকম ধরে কত,
পুচ্ছে তার তুচ্ছ করে ইন্দ্রধনু শত।
বার মাসই ফুলের হাসি, হয় না বাসি তায়,
ছায়া-ঢাকা স্নেহ-মাখা মায়ের মত প্রায়!
নানান্ ছন্দে নানান গন্ধ শীতল বায়ু বয়,
নন্দনে চন্দন বনে মলয় মনে লয়।
টিলার পাশে ঝরণা বহে, ঢাল গড়ানে ভুঁই,
দুধ খাইতে মায়ের বুকে কাপড় ঠেলে থুই।
ফাগুন মাসে আগুন হাসে সারা কানন ভরা,
ধুঁয়ায় ধুঁয়ায় দিক ছেয়ে যায় আকাশ আঁধার করা!
চৈত্র মাসে জোর বাতাসে উড়ে তুলা রাশি,
পোড়া বনের পোড়া মনের শুষ্ক শ্বেত হাসি।

* * *

পশ্চিমেতে বিশাল দীঘী নীল আরসির মত,
কাল জলে আকাশ ডোবা, মরাল ভাসে কত।
তীরে তীরে খেজুর গাছের কাঁটাল গাছের সারি,
মানের বাঁধা খাট্‌লা শোভে পূবে রাজার বাড়ী।
অন্দরেতে ফুলের বাগান বন্দরের প্রায়
গন্ধ মধুর ব্যবসা করে ভ্রমর-বণিক তায়।

কাল জলে ঝরে তাহার কেলি কদম ফুল
বৃন্দাবনের নিন্দা করে কালিন্দীর কূল।
দিবানিশি খেলে জলে লহর শত শত,
ঠিক যেন যে বরুণ রাণীর নীল আঁচলের মত।
রাজার বাড়ীর মেয়ে ছেলে বাঁধা ঘাটে নায়,
সদ্য ফোটা ভাদ্র মাসের পদ্মবনের প্রায়।
অন্য তীরে গৃহস্থ বউ ঘোমটা মাথায় দিয়ে
ভিজা বাসে বাড়ী যায় কলসী কাঁখে নিয়ে,
কিবা তাহার রূপের বাহার মরি মরি হায়,
লণ্ঠনের ভিতরে যেন আলোক দেখা যায়।
কোণা ঘাটে সোণা বউ, কলসী ভাসে জলে
মন ভাসে আরেক ঘাটে নিম গাছের তলে!
বামের দিকে দামের উপর বক রয়েছে খাড়া,
সন্ধ্যা করে বামনঠাকুর কোমর জলে দাঁড়া,
দুজনেই চুপ করিয়ে মিটি মিটি চায়,
দুজনারি ধর্ম্ম সমান কর্ম্ম সমান প্রায়।
পশ্চিমের পারে রাজার মেনেজারের বাসা,
বেল বনে বকুল বনে কলা বনে ঠাসা!
বেড়ার উপর বেড়া তাতে দৃষ্টি নাহি চলে,
আছে একটী গুপ্ত পথ যে গভীর বনের তলে,
সুন্দরের সুড়ঙ্গের মত আরেক মাথা তার,
মেনেজারের মাথা মুণ্ড বল্‌ব কিবা আর,—
পশ্চিমের গৃহস্থ বাড়ী লাগিয়াছে গিয়া,
পুবের দিকের পুকুর পারের কাঁটাল তলা দিয়া,
সে বাড়ীর বিধবা নারী সেই বিদ্যাবতী,
মৎস্য মাংসে একাদশী নিত্য করেন সতী।
কোমরে তার চাবির শিকল গলায় সোণার হার,
অঙ্গুরীটী "মনে রেখো" স্মরণ-চিহ্ন কাঁর!
মিশি-মাখা বাঁকা দাঁতে হাসে যখন তায়,
পাতিলের তলাতে যেন আগুন লেগে যায়!
মেনেজারের চাকর একটী গয়লা ঘোষের পো,
খবরদারি কর্ত্তে গিয়ে নিজেও মারেন ছোঁ!"

একটী প্রশ্ন।

অনেক ভদ্রলোক আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন :—

"অনেকে বলিয়া থাকেন, সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা ভাষায় কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন,—কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ছাত্র শ্রীরামতারক ভট্টাচার্য্য। ইহা কি সত্য ?"

উত্তর।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ই অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের প্রথম বঙ্গানুবাদক কি না, তাহা বলিতে পারি না। তবে ইনি যে অভিজ্ঞান শকুন্তলের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন তাহা ঠিক। ১২৫৫ সালের ১৬ই আষাঢ় তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে সাহিত্যগুরু স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলেন,—

"গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য গৃহের স্মাত্র ছাত্র শ্রীযুত রামতারক ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক গৌড়ীয় গদ্যে পদ্যে শ্রীমন্মহাকবি কালিদাস বিরচিত অভিজ্ঞান শকুন্তলা নামক সুবিখ্যাত নাটক গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে, তদীয় ভূমিকা ও মঙ্গলাচার প্রভৃতি কিয়দংশ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম উৎকৃষ্টতর হইয়াছে, অপর উক্ত পুস্তক উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে জ্ঞানদর্পণ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, অতএব আমরা বিদ্যানুরাগি মহোদয়গণ সন্নিধানে প্রার্থনা করি, তাঁহারা অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রস্তুত হইলে উচিত মত আনুকূল্য প্রদান করেন।

'গৌড়ীয় ভাষার পুনরুন্নতি হওন কালাবধি প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ব্যতীত আর কোন নটরঙ্গাশ্রিত গ্রন্থের গৌড়ীয় অনুবাদ হয় নাই, বিশেষতঃ এতদ্দেশে পুরাকালের নাটকের ন্যায় অধুনা নাট্যক্রিয়াদি সম্পন্ন হয় না। কালীয়দমন, বিদ্যাসুন্দর, নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রার আমোদ আছে, কিন্তু তত্তাবৎ অত্যন্ত ঘৃণিত নিয়মে সম্পাদন হইয়া থাকে, তাহাতে আমোদপ্রমত্ত ইতর লোক ব্যতীত ভদ্র সমাজের কদাপি সন্তোষবিধান হয় না, অতএব এই সময়ে প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যরস যাহাতে এতদ্দেশীয় মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণে সন্দীপন হয়, তাহাতে সম্যগ্‌রূপ প্রযত্ন প্রকাশ করা বিধেয়।"